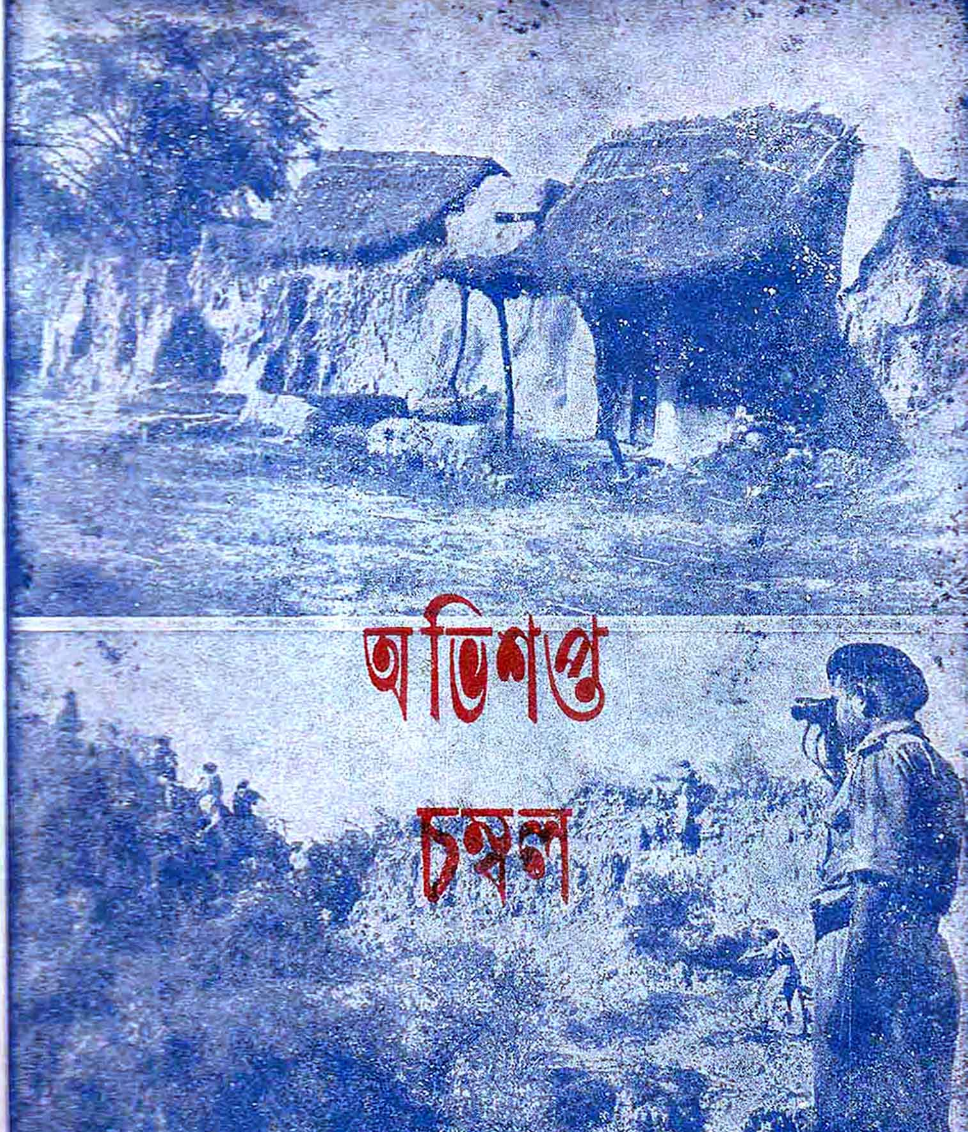


অভিশপ্ত চম্বল

তরুণকুমার ভাদুড়ী

অভিশপ্ত চম্বল

তরুণকুমার ভাদুড়ী

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭
ডিসেম্বর, ১৯৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৮
অক্টোবর, ১৯৬১
তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১
মে, ১৯৬৪
চতুর্থ সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৭৩
মার্চ, ১৯৬৭

প্রকাশক :
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট :
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক :
মন্মথ সিংহ রায়
রূপ-লেখা
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে—

বৌদি,

জীবনের চলার পথে পেয়েছি অনেক, হারিয়েছি তার চেয়েও বেশী। চলতে চলতে একদিন দেখলাম পথের ঝুলির এককোণে পড়ে আছে শুধু তোমার দেওয়া স্নেহ আর ভালবাসা। ভয় হোলো হয়তো কোনোদিন তাও হারিয়ে ফেলব। "অভিশপ্ত চম্বল" তোমাকেই দিলাম—ঋণ শোধ দিতে না—এই বিশ্বাসে যে ঝুলি আমার একদিন ভরে উপচে পড়বেই।

—তরুণ

ABHISHAPTA CHAMBAL

By

Taroon Coomar Bhaduri

Price Rs.30·50 p. only

"অভিশপ্ত চম্বল" আর তার কাহিনী হয়তো কোনদিনই লেখা হতো না, যদি বন্ধুবর তপন সিংহ ক্রমাগত আমায় খোঁচা না দিত। গ্র্যাণ্ড হোটেলের কামরায় আমায় প্রায় বন্দী করে রেখে সে প্রথম কয়েকটা পরিচ্ছেদ আমাকে দিয়ে লিখিয়েছে। Perspirationটাই শুধু আমার, Inspiration তপনেরই—আমার পরিশ্রম তার প্রেরণা।

জানা, অজানা, চেনা, অচেনা অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছি সাহায্য। ধন্যবাদ দিয়ে তাদের ছোটো করব না।

আত্মসমর্পণের কয়েকটি ছবির জন্যে সাংবাদিক-বন্ধু শ্রীবিশন্ কপূরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৪, মালভিয়া নগর
ভূপাল
বিজয়াদশমী, ১৩৬৭
৩০-৯-৬০

তরুণকুমার ভাদুড়ী

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা

মরুপ্রান্তর ৪.৫০

হিজ হাইনেস ৩.০০

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"অভিশপ্ত চম্বল" প্রকাশিত হবার পর যে রাশি রাশি চিঠি পেয়েছি ও আজও পাচ্ছি তার উত্তর দেওয়া সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সব প্রশ্নের উত্তরও বোধহয় আমার কাছে নেই। "অভিশপ্ত চম্বল"-এর অভিশাপ এখনও মুছে যায় নি। হয়তো যুগ-যুগান্তর থাকবে। কে বলতে পারে।

কোনো পরিবর্তন না করে দ্বিতীয় সংস্করণে শুধু একটা নতুন পরিচ্ছেদ—"ঠাকুর লাখন সিং" জুড়ে দিলাম।

৪, মালভিয়া নগর
ভূপাল
১লা ভাদ্র, ১৩৬৮
১৮-৮-৬১

তরুণকুমার ভাদুড়ী

অভিশপ্ত চম্বল

"উস্‌কে বাদ ?"

'উস্‌কে বাদ বেটা……'

লণ্ঠনের স্তিমিত আলো আরো স্তিমিত হয়ে আসে। বাইরের কালো ঘন অন্ধকার বৃদ্ধা রুক্মিণীর ঘরে এসে জমেছে আর তার মনের মধ্যে ভিড় করেছে ফেলে আসা দিনের অনেক হাসি-কান্না মেশানো কতশত টুকরো টুকরো আবছা ঘটনা। কিছু মনে আছে, আর কিছু হারিয়ে গিয়েছে স্মৃতির অন্তরালে। রুক্মিণী ভাববার চেষ্টা করে। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা। আধো আলো আধো-ছায়ায় শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম সাদা শনের মতো ক'গাছি চুল আর সময় ভারাক্রান্ত অগুনতি নির্মম দাগ-কাটা লোল চর্ম গাল। জ্যোতিহীন চোখ দুটো মনে হচ্ছিল যেন নিশ্চল পাথর—স্থির দৃষ্টি, অনেক দূরে—অনেক দূরে।

আলোর শিখাটা উস্‌কে দিলাম। দেখলাম, রুক্মিণী যেন অনেক দূরের মানুষ। চোখ দুটো এবার ঝাপসা হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে এক ফোঁটা জল থেমে থেমে শুকনো কোঁচকানো গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

'উস্‌কে বাদ বেটা ? উস্‌কে বাদ ক্যায়া। উস্‌কে বাদ সব খতম্।'

সাংবাদিকসুলভ কৌতূহলের উত্তর সেদিন হয়তো রুক্মিণীর কাছ থেকে পাইনি। কিন্তু যখন তার কাছ থেকে দু'ঘণ্টা পরে ফিরে এসেছি মনের কোথায় যেন একটু ব্যাথা অনুভব করেছি। রুক্মিণীর সব কথা বুঝতে পারিনি। হয়তো বুঝতে চেষ্টাও করিনি। তার যুক্তি আর তর্ক হয়তো আমায় সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু যে-ক'টা প্রশ্ন নিয়ে তার কাছে

গিয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি প্রশ্ন নিয়ে ফিরে এসেছি। প্রশ্ন করেছে রুক্মিণী, যার উত্তর তখন আমার কাছে ছিল না, আজো নেই। আর কারো কাছে আছে কিনা জানি না। যদি থাকে তাহলে শুধু এই বলতে পারি যে, মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে উদিতপুরা বলে যে ছোটো গ্রামটা আছে, তারই আরো ছোটো একটা গলির বাড়িতে ৬২ বছরের এক বৃদ্ধা সেই উত্তর শুনতে চায়।

দুর্ধর্ষ ডাকাত 'দস্যুরাজ' মানসিং-এর স্ত্রী রুক্মিণী আজ পনের বছর থেকে—হয়তো তার চেয়েও বেশি—ক্রমাগত সেই প্রশ্ন করে চলেছে সবাইকে। উত্তর সে এখনো পায়নি। খুঁজছে। হয়তো কোনো দিন কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। কে জানে হয়তো সেদিনের জন্যেই বৃদ্ধা রুক্মিণী বেঁচে আছে।

৩রা মার্চ ১৯৩৯। বিকেল বেলা আগ্রা জেলের লৌহকপাট খুলে গেল ঝন্‌ঝনাৎ করে, আর বাইরের খোলা আলো-বাতাসে দীর্ঘ ১১ বছর পরে বেরিয়ে এল স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় সুপুরুষ একটা লোক। কোমরটা একটু ঝুঁকে গিয়েছে। মাথার কয়েকটা চুলও বোধ হয় পেকেছে। ধীর পদক্ষেপে মাথা নিচু করে জেল কম্পাউণ্ড ছেড়ে সোজা সে তার গাঁয়ের পথ ধরল।

পরের দিন বিকেলে মানসিং এসে পৌঁছল তার গাঁ খেড়া-রাঠোরে।

রুক্মিণীর সেই দিনটার কথা ঠিক মনে আছে। কুড়ি বছর আগের ঘটনা তার মনে আজো জ্বলজ্বল করছে। একটুও ম্লান, একটুও আবছা হয়নি। প্রায় একযুগ পরে স্বামীকে নিজের কাছে ফিরে পেয়ে প্রথমে সে আনন্দে অধীরে হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শুধু খানিকক্ষণের জন্যে। তারপরই বুক-ফাটা কান্নায় সে সামনের উঠোনে আছড়ে পড়ে। তার জোয়ান ছেলে যশবন্তসিং···। পুলিশের নির্মম গুলীতে সে প্রাণ দিয়েছে —এই তো বছর দেড়েক হলো। আজ তার বাপ ফিরে এসেছে, কিন্তু বাপের সে 'তুলারা বেটা' কই!

মানসিং-এর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। খাটিয়ায় বসে সে কান্না চাপতে গিয়ে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ওঠে। সে সব জানে। মনকে পাথরের মতো শক্ত করে সে কারাপ্রাচীরের অন্ধকার ঘরে বসে শুনেছে যশবন্তসিং-এর মৃত্যু সংবাদ। রুক্মিণী তো জানে না। কিন্তু জেলখানার জমাদার শুনেছে তার কান্না। সে এও জানে তার ছেলের মৃত্যুর জন্যে কারা দায়ী। কিন্তু গাঁয়ের দুই দলের ঝগড়ার যে এই ভয়ঙ্কর পরিসমাপ্তি হবে তা তো সে জানত না।

'তেরা আউর পাঁচ লেড়কা তো হ্যায়।' বাকী পাঁচ ছেলের কথা রুক্মিণীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মানসিং কান্নায় ভেঙে পড়ে। রুক্মিণী এইবার জ্বলে ওঠে। 'লজ্জা করে না তোমার? যাদের জন্যে তোমার ছেলে পুলিশের গুলীতে মারা গেল। যাদের জন্যে তুমি 'জওয়ানী'র ১১ বছর জেল খেটে এলে তারা গাঁয়ের মধ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর তুমি মেয়েমানুষের মতো বসে বসে নিজের 'জোরু'র আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদবে! লজ্জা করে না? মনে পড়ে তোমার, ৩২ বছরের জোয়ান মর্দ্ তুমি জেলে গিয়েছিলে আর আজ ১১ বছর পরে ৪৩ বছরের একটা 'জিন্দা লাশ্' হয়ে তুমি ফিরে এসেছ আর ছেলের দুঃখে কাঁদছ?'

'কি করব বল্ রুক্মিণী। মেরী কমর টুট গয়ি।'

'যশবন্ত-এর কসম্, তুমি যদি এই রকম মেয়েমানুষের মতো বসে কাঁদো।'

"না না রুক্মিণী কসম্ দিস্ না।" মানসিং ভয়ে কেঁপে ওঠে। রাজপুতের কসম্ বড় ভয়ঙ্কর কসম্।

রুক্মিণী ক্ষেপে উঠেছে। পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে। "নাও। সাহস না থাকে তো মেয়েমানুষের মতো চুড়ি পরে ঘরে বসে কাঁদো।" রাগে, ঘৃণায় আর লজ্জায় রুক্মিণী তার হাতের ক'গাছা চুড়ি খুলে ফেলে দিয়েছিল মানসিং-এর কোলের উপর।

"উস্‌কে বাদ?"

"উস্‌কে বাদ"…। রুক্মিণী একটু থেমে যায়। চুড়িহীন নিজের খালি হাতটার উপর শীর্ণ আঙুল বোলায়।

ধীরে ধীরে খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়ায় মানসিং। "উস্‌কে আঁখো মে খুন থা।" লাল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো রাগে, লজ্জায় আর চোখের জলে। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বন্দুকটা নিয়ে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তিন ছেলে। বলল, "চল্ আমার সঙ্গে। খুন কা বদলা খুন"।

"বেটা, আমার হলো আনন্দ। এতদিন পরে আমার ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কিন্তু আবার ভয় হলো কি করবে বাপ-ছেলেরা মিলে। ডাকাতি করবে না তো? ওকে বললাম, 'যা হয় করো ব্রাহ্মণ হত্যা করো না। ব্রাহ্মণ হত্যা মহাপাপ।'

"আমার কাঁধে হাত দিয়ে ও বলল, 'তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকেও লঙ্কার ব্রাহ্মণ রাজা রাবণকে হত্যা করতে হয়েছিল।' অন্ধকারে আমার সামনে দিয়ে বাপ ছেলে চার ছায়ামূর্তির মতো মিশে গেল দূরে পাহাড়ের দিকে। চম্বলের 'বেহড়' (গিরিবর্ত্ম—Ravines) ওদের হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল।"

ছুঁড়ে-ফেলা চুড়ি ক'গাছা রুক্মিণী তুলে নিয়ে আবেগে বুকে চেপে ধরেছিল সেদিন। বিশ বছর আগের কথা। কিন্তু কই, সে তো আজো ভোলেনি। কি করে ভুলবে। তারপর যা যা হয়েছে, ছবির মতো মনে হয় তার। এসেছে অনাহার, অত্যাচার, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। রুক্মিণীর মনে জেগেছে অনেক প্রশ্ন। ছয় নাতি-নাতনীকে বুকে জড়িয়ে রাতের পর রাত সে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে আর খুঁজেছে তার প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু উত্তর পায়নি। আজো পায়নি। আমাকেও জিজ্ঞাসা করেছিল। আমার কাছ থেকেও পায়নি।

বিশ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু শুরু হয়েছিল তারো আগে। অনেক আগে।

খেড়া-রাঠোরে যেদিন ১৮৯৬ সালের ঘন দুর্যোগের এক রাতে বিহারীসিং-এর দ্বিতীয় পুত্র হলো, গাঁয়ের বৃদ্ধ জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করে গেল, "লড়কা বহোত হোনহার হোগা। বহোত নাম কামায়েগা।" মিথ্যে বলেনি জ্যোতিষী। কাজের (?) ছেলেই হয়েছিল, আর নামও (!) অনেক পেয়েছিল। বাপের দ্বিতীয় আর শেষ ছেলে। শখ করে নাম রাখা হলো মানসিং। বড় ছেলে নবাবসিং যে কোনোদিন আবার মানুষ হবে তার কোনো আশাই ছিল না বিহারীসিং-এর। কিন্তু মানসিং। "বহোত নাম কামায়েগা।" আর 'বাপকা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া কুছ নহী তো থোড়া থোড়া।' ছোটোবেলা থেকেই নবাবসিং পড়ল গাঁয়ের কুসঙ্গে আর এমন কুকাজ ছিল না যা সে করতে পারত না বা করত না। পরে পুলিশের রেকর্ডে লেখা হয়েছিল।—

"Nawab Singh learnt nothing lawful in his life. His life was an unrelieved pattern of criminality."

কিন্তু মানসিং ? সে ছিল আলাদা ধাঁচে গড়া। ছোটোবেলা থেকেই হয়ে উঠল গাঁয়ের ছোটো-খাটো নেতা। নিজের আশে পাশে গড়ে তুলল একটা দল যারা তার কথায় ওঠে বসে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। বাপের আদরের ছেলে মানসিং বড় হতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে একদিন খট্‌কা লাগে। অনেক ভেবে-চিন্তে বাপকে একদিন জিজ্ঞাসা করে, রাতের আঁধারে চুপি চুপি প্রায়ই তোমার কাছে কিছু লোক আসে। তাদের সঙ্গে থাকে ছোট-বড় পুঁটলি—যা তারা লুকিয়ে নিয়ে আসে। ওরা কারা ?"

একটু ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বিহারী জবাব দিয়েছিল—"মেরে দোস্ত্, বেটা"। "দোস্ত"—কথাটা মানসিং-এর মনে দাগ কেটে গেল গভীরভাবে। "দোস্ত"রা প্রায়ই আসে। আরেকটু বড় হয়ে বুঝল এই "দোস্ত"রা কারা। তাহলে তার বাপের "দোস্ত্" সব দাগী চোর আর ডাকাত। তার বাপ চোরাই মালের ব্যবসা করে। মানসিংহ ভাবে চোর ডাকাত মাত্রেই বুঝি "দোস্ত্"। গাঁয়ের নামী লোক বিহারীসিং-এর "দোস্ত্"।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ বোধ হয় অপরাধী পিতার পুত্র হওয়া। মানসিং-এর জীবনে তাই হয়েছিল। বিহারীর কাছে কোনো দোষই দোষ ছিল না। মোটে পাঁচ বিঘে মৌরুসী (করমুক্ত) জমি ছিল। কিন্তু ঠাকুর বিহারীসিং "তোমর" রাজপুত বংশের ছেলে। মান-সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি হিসেবে পাঁচ বিঘে জমি থেকে কী আর আয় হয়। গাঁয়ে চাই মান, প্রতিপত্তি, আর "ইজ্জত"। তার জন্যে চাই প্রচুর অর্থ। গাঁয়ের সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণদের চেয়েও বেশি অর্থ। ধীরে ধীরে বিহারী শুরু করল লেন-দেনের ব্যবসা। হয়ে উঠল অর্থপিশাচ শাইলক। কড়া সুদে দিতে শুরু করল ধার। যারা তার ধার শোধ দিতে পারে না তাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে বিহারী।

এমনি একজনকে নিঃশেষ করতে উদ্যত হলো বিহারী। নাম তার ভোলাসিং। কপর্দকহীন ভোলাসিং ক্ষেপে উঠল যখন বিহারী তার সম্বল ছোটো একটা বাড়িকে গ্রাস করতে চেষ্টা করতে লাগল। গাঁয়ের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোলা তার করুণ কাহিনী আর বিহারীর নিষ্ঠুরতার কথা শোনায়। কিন্তু কার সাহস বিহারীর বিরুদ্ধে আঙুল তোলে? গাঁয়ের ধনী ব্রাহ্মণ পুরোহিত পণ্ডিত তল্‌ফীরামের পায়ে আছড়ে পড়ে ভোলা। বিহারীর দু'চক্ষের বিষ তল্‌ফীরাম। গাঁয়ের শীর্ষস্থান কে পাবে, ঠাকুর বিহারীসিং না পণ্ডিত তল্‌ফীরাম এই নিয়ে চলেছিল কষাকষি। এই সুযোগ, "কুছ পরোয়া নেই। কোর্টে লড় তুই, দিবি না পয়সা।" তল্‌ফীরাম ভোলাকে সান্ত্বনা দিল।

গাঁয়ের লোক কেঁপে ওঠে। লাঠি, বল্লম, নিয়ে দু'দলের লোক তৈরি হলো। গাঁয়ের মাতব্বরেরা মিলে মীমাংসা করে দিলেন। আপোষ হলো কিন্তু আগুন নিবল না। জোয়ান ছেলে মানসিং। বিহারী তাকে বলে, "তোর বাপের ইজ্জত ধুলোয় মিশে যাবে আর তুই ঠাকুর, রাজপুত তাই চুপচাপ দেখবি?" না তা হয় না। বাপকা বেটা মানসিং। বন্ধুত্ব পাতালে পুলিশের সঙ্গে। পেল বন্দুকের লাইসেন্স শুধু নিজের জন্য না, বড় ভাই নবাবসিং-এর জন্যেও। পণ্ডিত তল্‌ফীরাম একটু শঙ্কিত হলো এইবার।

হঠাৎ একদিন পাশের মহুয়া গাঁয়ের ছিদ্দা বঢ়াই-এর বাড়িতে

ডাকাতি হলো। তল্‌ফীরাম ভাবে, এই সুযোগ। পুলিশকে খবর দিল এই ডাকাতিতে মানসিং-এর হাত আছে। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু পুলিশ মানসিং-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেল না। তল্‌ফীরাম দমবার পাত্র নয়। ছিদ্দাকে বলে, মানসিং-এর নামে কোর্টে কেস্ ঠুকে দে। এইবার মানসিং একটু ভয় পেল। ছিদ্দাকে বোঝাল একটা আপোষ করতে। তল্‌ফীরামের অর্থ আর সাহস পেয়ে ছিদ্দা মানসিংকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। "যা কিছু বোঝাপড়া করতে হয় পণ্ডিত তল্‌ফীরামের সঙ্গে কর। সে যা বলবে আমি তাই করব।"

তল্‌ফীরামের সঙ্গে আপোষ? তার বাপের দুষমন? মানসিংএর রক্তে আগুন লেগেছে। আচ্ছা, দেখ লেঙ্গে? তল্‌ফীরাম আর ছিদ্দাকে কোর্টের পথে মানসিং-এর দল আক্রমণ করল। পুলিশ আবার এল, কিন্তু এবারেও মানসিং-এর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।

৩০শে জুলাই, ১৯২৮।

মানসিং তার দলবল নিয়ে আক্রমণ করল ছিদ্দার আত্মীয় শুক্‌বাসীকে। খবর পেয়ে তল্‌ফীরাম ছুটল তার দলবল নিয়ে, শুরু হলো তুমুল লড়াই। ভয়াবহ সে দৃশ্য। বন্দুক, লাঠি, বল্লম, তলোয়ার। মাথা ফাটল, বাড়ি পুড়ল, গমের গোলায় আগুন লাগল। মহুয়া গাঁ রক্তের গঙ্গায় ভেসে গেল। স্ত্রীলোক আর শিশুর ক্রন্দনরোলে গাঁয়ে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল।

মানসিং-এর হাতে হাতকড়া পড়ল সেই প্রথম আর সেই শেষবার। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলো মানসিং-এর আর দলের বাকি লোকদের হলো পাঁচ বছরের জেল। মানসিং-এর ছেলে যশোবন্তসিং, দাদা নবাবসিং আর ভাইপো দর্শনসিংকে কিন্তু পুলিশ ধরতে পারল না। তারা হলো ফেরারী। মানসিংএর দুই বিশ্বস্ত অনুচর খীমসিং আর ভূপসিং ভয়ে যোগ দিল পণ্ডিত তল্‌ফীরামের দলে।

জীবনের প্রথম যুদ্ধে ঠাকুর মানসিং হেরে গেল ব্রাহ্মণ পুরোহিত পণ্ডিত তল্‌ফীরামের কাছে।

এক এক দিনকে মনে হয় এক এক বছর। জেলের জীবন

মানসিং-এর কাছে হলো দুর্বিষহ। বসে জেলের দেয়ালে দাগ কাটে, ভাবে, আর প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে ওঠে। সন্দেহ, প্রতিশোধ আর গ্লানি তার মনে ধরাল ঘুণ। রুক্মিণী আর ছয় ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে স্নেহপ্রবণ বাপ প্রায়ই কেঁদে জেলের ঠাণ্ডা পাথরের মেজে ভিজিয়ে ফেলত। মাঝে মাঝে খবর আসে, যশবন্তসিং, দর্শনসিং আর নবাবসিং পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর ক্ষুধায় অর্থাভাবে করছে চুরি ছোটখাটো ডাকাতি। পুলিশ তাদের পিছনে ঘুরছে, কিন্তু পাচ্ছে না।

কিন্তু একদিন ১৯৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর। বেশি সময়ও লাগল না। সাধারণ এনকাউণ্টার। পুলিশের গুলীতে চম্বল নদীর গিরিবর্ত্মের মুখে মারা গেল যশবন্তসিং আর দর্শনসিং। নবাবসিং ধরা পড়ল, তার হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সবই শোনে মানসিং। জেলের দেয়ালে দাগ কেটে যায়। আরো কত দিন বাকী? এক-এক বছর মনে হয় এক-এক যুগ। জেলের একমাত্র সঙ্গী পণ্ডিত ছাবরাম। ব্রাহ্মণ হয়েও সে মানসিং-এর বন্ধু। তল্‌ফীরামের সঙ্গে যুদ্ধে সে ছিল মানসিং-এর দলে। অসুস্থ, রুগ্ন, শীর্ণকায় ছাবরাম। একমাত্র ছেলে রূপনারায়ণ শর্মা। ডাক নাম 'রূপা'। জেলে প্রায়ই দেখা করতে আসে বাপ আর ঠাকুর মানসিং-এর সঙ্গে। খবর নিয়ে যায় আর পৌঁছে দিয়ে আসে ঠাকুর সাহেবের বাকি ফেরার ছেলেদের কাছে।

কঠিন কারাপ্রাচীরের অন্ধকার ঘরে একদিন পণ্ডিত ছাবরাম করল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। যাবার আগে আবেগে বন্ধু মানসিং-এর হাত জড়িয়ে ধরে বলে—"মেরে বাচ্চা রূপাকো দেখনা, সমঝনা, রূপ তেরা ছ'ঠা বেটা হ্যায়। রূপাকে সঁপে দিয়ে যায় মানসিং-এর হাতে। যশবন্তসিং-এর বদলে তুই রূপাকে তোর ছেলে বলে কোলে তুলে নে।

"জরুর দোস্ত।" মানসিং প্রতিজ্ঞা করে।

"খাও কসম্।"

"কসম্!"

"যশবন্ত কা কসম্।" মানসিং ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেলল।

অনেক ধরাধরি আর কাঠ-খড় পুড়িয়ে বিহারীসিং ছেলে

মানসিংকে কারাবাস শেষ হবার আগেই খালাস করিয়ে আনল। ৩রা মার্চ, ১৯৩৯ মানসিং জেল থেকে বেরিয়ে এল। পরদিন পৌঁছেছিল তার গাঁ খেড়া-রাঠোরে।

'খুন কা বদ্‌লা খুন' বলে বন্দুক নিয়ে সে বেরিয়ে গিয়েছিল।

ছুঁড়ে-ফেলা চুড়ি ক'গাছা রুক্মিণী বুকে চেপে ধরেছিল।

কুড়ি বছর আগেকার কথা।

'উস্‌কে বাদ।'

'উস্‌কে বাদ বেটা……।'

লণ্ঠনের স্তিমিত আলো আরো স্তিমিত হয়ে এসেছিল। রুক্মিণী আর কিছু বলতে পারেনি। হয়তো মনে ছিল না। হয়তো বলতে চায়নি।

তারপর? তারপরের ইতিহাস তো অজানা নয়। মানসিং হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্কর অভিশাপ। রক্তের লাল কালি দিয়ে লেখা পনের বছরের সেই ইতিহাস। সবাই জানে। আমিও জানি। রুক্মিণী জানে। সে এ-ও জানে, সে কাহিনী আমি জানি। তাই হয়তো সে আমায় বলেনি।

হঠাৎ রুক্মিণী প্রশ্ন করে বসেছে আমায়। উত্তর দিতে পারিনি তার প্রশ্নের। তার উত্তর আমার কাছে তো নেই। সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। মাথা নিচু করে রুক্মিণীর ছোট্টো ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আর চলে গিয়েছিলাম মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড জেলার ছোটো গাঁ উদিতপুরা ছেড়ে। আর কোনোদিন যাইনি উদিতপুরায়। হয়তো আর কখনো যাবোও না। গেলেই হয়তো রুক্মিণী তার সেই প্রশ্ন করবে। আমি তো তার উত্তর দিতে পারবো না। উত্তর তো আমার কাছে নেই।

দুই

"খুন কা বদলা খুন।" কিছুদিন পরেই গাঁয়ের গমের ক্ষেতের মধ্যে পাওয়া গেল তল্‌ফীরামের দুই আত্মীয় রতিরাম আর সোনাপালের রক্তাক্ত মৃতদেহ। এরাই নাকি যশবন্তসিং আর

নবাবসিং-এর গুপ্ত আস্তানার খবর দিয়েছিল পুলিশকে। মানসিং ছিল আগ্রায়। অনেক চেষ্টা করেও তল্‌ফীরাম মানসিংকে এই খুনের ব্যাপারে জড়াতে পারল না। পুলিশ বললে—"Mansingh has a cast-iron alibi."

এই তো সবে শুরু। একের পর এক তল্‌ফীরামের দলের লোক ধীরে ধীরে মানসিং-এর প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে মরল। জুন ১৯৪১ সালের এক সকালে খেড়া-রাঠোরের লোকেরা সভয়ে জানলো পণ্ডিত তল্‌ফীরামের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে গাঁয়ের অদূরে নালার কাছে। তল্‌ফীরামের ছেলে নেতরাম গেল পুলিশে আর মানসিং আর তাঁর ছেলেরা হলো ফেরার শেষবারের মতো।

তারপর!

তারপর মূর্তিমান বিভীষিকার মতো মানসিং ঝাঁপিয়ে পড়ল তল্‌ফীরামের পরিবারের বাকী লোকদের ওপর। একটা অপরাধ থেকে আরেকটা অপরাধ। বারবার করেছে তল্‌ফীরামের ছেলে নেতরামের বাড়ি আক্রমণ, ধূলিসাৎ করেছে ঘর-দালান, পুড়িয়ে ছারখার করেছে ক্ষেত-খামার। মানসিং-এর রক্তে তখন দানব নাচছে। ধীরে ধীরে নিচে আরো নিচে নামল মানসিং। তার আক্রোশ গিয়ে পড়ল সব ধনীদের ওপর। সারা আগ্রা জেলা তখন মানসিং-এর আতঙ্কে কাঁপছে। কারো সাহস নেই তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করে বা খবর দেয়। তু-একজন চেষ্টা করেছে, কিন্তু তু'দিন পরেই তাদের আর কোনো খোঁজ পায়নি গাঁয়ের লোকেরা।

উত্তরপ্রদেশের বড়কর্তাদের এবার টনক নড়ল। মানসিং-এর বিরুদ্ধে শুরু হলো অভিযান—অপারেশন মানসিং। খেড়া-রাঠোরের কাছেই গিরিবর্ত্মে হলো প্রথম সংঘর্ষ। কিছু গোলাগুলী বারুদ নষ্ট হলো, কিন্তু মানসিং আর তার দলবলের লোকেরা পালাল।

১৯৪৩ সালে আগস্ট মাসে সরহাইগ্রামের নবাবসিং গুজরকে মানসিং একদিন নির্মমভাবে হত্যা করল। মানসিং-এর সন্দেহ নবাব গুজর পুলিশের গুপ্তচর। এরপর, পর পর কয়েকটা হত্যা করল মানসিং। পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে নেতারামের ভাইপো মেওয়ারাম আর তার কিছুদিন পরে আরেক ভাইপো জেঠারামও

মানসিং-এর প্রতিশোধের আগুনে নিজেদের আহুতি দিল। মানসিং-এর দলের কিছু লোক ধরা পড়ল বটে, কিন্তু সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাবে তারা বেকসুর ছাড়া পেল। পুলিশের কর্তারা এবার সত্যিই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। মানসিং আর তার দলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে কেউ রাজী না।

এল ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭। ভারতবর্ষ হলো স্বাধীন। অনেকের সঙ্গে জেল থেকে ছাড়া পেল বড় ভাই নবাবসিং। ছাড়া পেয়েই নবাবসিং আবার শুরু করলে লুঠতরাজ আর ডাকাতি। একদিকে মানসিং আর অন্যদিকে নবাবসিং। স্বাধীনতার আনন্দোৎসব তখনও শেষ হয়নি। একদিন বিজয়গর্বে মানসিং তার গাঁয়ে ফিরে এল। খেড়া-রাঠোরের অনেকেই এগিয়ে এসে গলায় তার মালা পরাল। বিহারীসিং মৃত আর নবাবসিং ফেরার। মানসিং হলো পরিবারের কর্তা। ডাকাতি আর লুঠতরাজের অগাধ পয়সা দিয়ে তৈরি হলো বিরাট এক বাড়ি। লোকে বলত "গড়হী" (গড় মানে দুর্গ)। গাঁয়ে তার সম্মান আর প্রতিপত্তি বাড়ল। লোকে ডাকে "দাউ" (গাঁয়ের নেতা)। কেউ কেউ বলে "রাজা মানসিং"। সবাইকার বিপদ-আপদে সে এগিয়ে আসে, ঝগড়ার মীমাংসা করে। যে সম্মান পাবার জন্যে বাপ বিহারীসিং চিরজীবন চেষ্টা করল, সেই সম্মান আজ তার ছেলে পেয়েছে চেয়ে-চিন্তে নয় "আপনি তাকত্‌সে"। নিজের বাহুবলে।

গাঁয়ের ঘরে ঘরে চুপি চুপি কানাঘুষা হয়। "দাউ" গরিবদের সাহায্য করে। ধনীদের কাছ থেকে অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে গরিবদের বিলোয়। তল্‌ফীরামের বংশ ছাড়া কোনো ব্রাহ্মণের গায়ে সে হাত দেয় না। তারা তাকে আশীর্বাদ করে দু'হাত তুলে। পুলিশ আর পুলিশের চরদের সে ঘৃণা করে, কিন্তু প্রয়োজন না হলে তাদেরও সে মারে না। ছোট সরকারী অফিসাররা তার কাছে নির্ভয়ে আসে। কেউ নজরানা দিয়ে যায় আবার কেউ নিয়ে যায়। বিয়ে শাদিতে মানসিং না গেলে সে পরিবারের মান থাকে না।

দুষ্টু ছেলেদের বুকে জড়িয়ে রাতে মায়েরা "লোরী" গায়ঃ

"আজারে নিন্দিয়া আজা
দোয়ার খাড়া মানসিং রাজা।"

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করে বাপরা ছেলেদের জিজ্ঞাসা করে "বড়া ভইকে ক্যায়া বনেগা বেটা ?"

"রাজা মানসিং।" ছেলেরা জবাব দেয়।

গাঁয়ের কবি "আল্‌হা" গাইল—

"য়হাঁ কি বাতে য়হাঁ পর রহগই আগে
আউর বদল গই যায়।
'আল্‌হা' গাওো মানসিং মানসিং কি মিত্রউ
শুনলো কান লাগায়।"

ধর্মভীরু লোক মানসিং। সকালে উঠে এক ঘণ্টা পুজো করে। ভগবানের কাছে ছাড়া আর কারো সামনে সে মাথা নিচু করবে না। কারণ মানসিং-এর বিশ্বাস ভগবান সবাইকার। তিনি ডাকাতদেরও ভগবান। গাঁয়ের কবি আবার লিখল।

…সব্‌ পৈহর দুর্গা কি পূজা করতা,
আউর রামায়ণ কা করতা পাঠ।
গউ ব্রাহ্মণ কি রক্ষা করতা ত্রিয়া
বুঢ়ে পৈ নহী ডারতা হাথ।"…

বিংশ শতাব্দীর নতুন রবিনহুড হলো রাজা মানসিং।

যশবন্তসিং-এর অকালমৃত্যু মানসিং তখনও ভুলতে পারেনি, তাই যখন যশবন্তের ছেলে ভরতসিং-এর বিয়ে ঠিক হলো সে এমন জঁাক-জমক করে বিয়ে দিল যে, লোকদের তাক লেগে গেল। হাজার হাজার টাকা খরচ হলো। নাচ, গান, হৈ-হল্লা বিরাট ব্যাপার। পুলিশের রেকর্ডে লেখা হলো পরে :—

"The people were spellbound by the fine spectacle of five grand cars and three majestic elephants gorgeously caparisoned for the marriage procession. It was attended by the gentry from far and near......

It appears fantastic but it is perfectly true that Mansingh celebrated in his village home and in great style the marriage of his grandson. Elephants and several cars were in attendance. The big dinner and dancing party that followed was attended by the Tahsildar, the local medical officer and the officer in charge of the Police Station. Without any exception

the big zamindars and the local Mahajans were either present or were represented".

কিন্তু মানসিং এই শান্তি বেশিদিন সহ্য করতে পারল না বা তার সইল না। রক্তে যে রয়েছে নিষেধ। রেকর্ডে আবার লেখা হলো :

> "But his perversity came to the surface once again. The fame that he enjoyed went to his head and he failed to realise the limits of prudence. He became arrogant and tyrannical. He behaved like a despot and harassed people on the merest suspicion.
>
> His malevolence towards Netram's family was such that he did not hesitate to take drastic action against any one whom he suspected and soon it appeared as if he wanted to hit out freely at everyone. There was no knowing when and where or whom he would strike next".

খুন, জখম, লুঠতরাজ, অপহরণ। রোজ খবর আসছে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে। মানসিং-এর সঙ্গে এবার যোগ দিয়েছে বড়ভাই নবাবসিং। লক্ষ্ণৌতে বড়কর্তাদের বড় বড় কনফারেন্স বসলো। ঠিক হলো গাঁয়ের ব্যালেন্স অব পাওয়ার বজায় রাখতে হলে নেতরামকে গাঁয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিহারীসিং আর মানসিং-এর দুষমন পণ্ডিত তল্‌ফীরামের ছেলে নেতরাম পুলিশের ভরসায় আর সংরক্ষণে ফিরে এল আবার খেড়া-রাঠোরে। মানসিং-এর "গড়হী"র কাছে বসল পুলিশ গার্ড। কিন্তু কিছুই হলো না। বার বার মানসিং আক্রমণ করল নেতরামকে। এইবার পুলিশের একটা পুরো প্ল্যাটুন রাখা হলো চম্বল নদীর ধারে যাতে মানসিং পালাতে না পারে।

কিন্তু মানসিং পালাল। উত্তরপ্রদেশ ছেড়ে এবার সে ঢুকল মধ্যপ্রদেশে (তখন মধ্যভারত)। খবর পাওয়া গেল মানসিং গোয়ালিয়রের কাছেই কোথাও। ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালের ভীষণ শীতে আগ্রার অ্যাডিশন্যাল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্পিয়ার্স সায়েব "গরিলা" পার্টি নিয়ে চললেন মানসিং-এর

খোঁজে। ভিণ্ড জেলার পুলিশ সুপার মিঃ পাটিল এলেন মধ্যভারত থেকে। প্রথম সংঘর্ষ হলো ভিণ্ড জেলার "মঘেরা" পুলিশ থানার এলাকার কাছে—২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮। কিন্তু বৃথা। মানসিংকে পাওয়া গেল না। গোয়ালিয়র থেকে তখন কর্নেল কমলসিং-এর নেতৃত্বে পাঠানো হলো মিলিটারি ডিটাচমেণ্ট। পর পর, দিন নেই রাত নেই ক্রমাগত সংঘর্ষের পর সংঘর্ষে মানসিং একটু কাবু হলো। তারপর ছয় মাস আর কোনো খোঁজ-খবর নেই। কর্তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মোটে ছয় মাস। তারই মধ্যে মানসিং তার নিজের দলকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলল, করল আরো নিষ্ঠুর। যোগাড় করল অনেক বন্দুক, রাইফেল, গোলাগুলী। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো মানসিং আবার ফিরে এল উত্তরপ্রদেশে।

কিছুদিন পরেই নেতরামের চার আত্মীয়ের নৃশংস হত্যার খবর পাওয়া গেল। এক সপ্তাহও শেষ হলো না। রাতের আঁধারে মানসিং তার শেষ শত্রু তল্ফীরামের শেষ বংশধর নেতরামকে নির্মমভাবে হত্যা করল। মানসিং নিজে হাতে রাইফেল উঠিয়ে গুলি করল নেতরামকে। জীবনে তার শেষ ব্রাহ্মণহত্যা। তার দস্যু-জীবনের এক অধ্যায় শেষ হলো।

নেতরামকে হত্যা করে মানসিং যখন বিজয়গর্বে ফিরে আসছে—অতর্কিতে গিয়ে পড়ল পুলিশের সামনে। সেই ভীষণ লড়াইয়ে মানসিং-এর দলের চারজন লোক মারা পড়ল পুলিশের গুলীতে। সমস্ত রাগ, বিদ্বেষ আর ঘৃণা এবার গিয়ে পড়ল পুলিশের ওপর, আর তাদের উপর যারা পুলিশকে সাহায্য করে বা যাদের সে পুলিশের লোক বলে সন্দেহ করে; তা সে সন্দেহ সত্যি বা মিথ্যে যাই হোক না কেন। মারা পড়ল বহু পুলিশের লোক। তাদের মধ্যে ছিল দুইজন সাহসী সাব-ইন্সপেক্টর।

ঘাটিগাঁও গ্রামের কয়েকজন লোক সেদিন মানসিং-এর দলকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করল। মানসিং সমস্ত গাঁটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল।

উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থান চার

প্রদেশের পুলিশ নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ল। মানসিং করে চলে অত্যাচার আর তার পেছনে চলে পুলিশ। এক জেলা থেকে অন্য জেলা। একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। নদী, পাহাড়, বনজঙ্গল, গিরিপথের মধ্যে দিয়ে চলে তুই দলের অভিযান। মানসিং যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তার তাণ্ডবনৃত্য আর নৃশংসতার খেলা চলে ৮০০ বর্গমাইল এলাকায়। খবর আসে মানসিংকে দেখা গিয়েছে ঐ সে গাঁয়ের কাছে। ছোটে পুলিশ। কিন্তু কোথায় মানসিং, খবর আসে মানসিংকে দেখা গিয়েছে—প্রায় ২০ মাইল দূরে অন্য একটা গাঁয়ের কাছে গিরিবর্ত্মের মুখে। কাউণ্টার-এস্পাওনেজ্ করে মানসিং পুলিশের সব চেষ্টা বিফল করে দেয় ক্রমাগত।

সুবর্ণ সুযোগ এল ১৫ই নভেম্বর ১৯৫২ সাল। খবর পাওয়া গেল মানসিং তার দলবল নিয়ে ঘাঁটিগাও গ্রামের দিকে রওনা হয়েছে। পর পর সমস্ত গ্রাম পুলিশ তোলপাড় করে খোঁজে কোথায় মানসিং, কেউ বলতে পারে না বা বলতে চায় না।

নিরাশ হয়ে ফিরে আসছে পুলিশ বাহিনী। ছোটো একটা ছেলে যাচ্ছিল গাঁয়ের দিকে। প্লাটুন কমাণ্ডার অভ্যাসমতো জিজ্ঞাসা করে "কিধর গয়ে ডাকু লোগ?"

ফ্যাল ফ্যাল করে একবার চেয়ে ছেলেটা দূরে একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে পালাল।

মোটে পঞ্চাশ গজ দূরে গাছের নিচে তার দলবল নিয়ে বিশ্রাম করছিল মানসিং। পুলিশের উৎসাহ বেড়ে গেল। মানসিংকে ধরতে বা মারতে পারলে তখন ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার। এত ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ গুলী চালাল।

অকস্মাৎ আক্রমণে মানসিং হকচকিয়ে গিয়েছে। বড় বেকায়দায় সে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই সে সামলে দ্বিগুণ গুলী চালাল। মানসিং খোলা জায়গায়, সে জানে সম্মুখ যুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যু। চোখের সামনেই পাঁচজন অনুচরের একের পর এক মৃতদেহ সামনে লুটিয়ে পড়ল। মানসিং পালাল পুলিশ বাহিনীর মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে। জিনিসপত্র সবই ফেলে গেল শুধু সঙ্গে নিল পাঁচ অনুচরের রক্তাক্ত মৃতদেহ।

পরে জিনিষপত্রের মধ্যে পুলিশ পেল একটা দামী ঘড়ি।

ঘড়িটা ছিল রূপার। মানসিং-এর অভিন্নহৃদয় বন্ধু পণ্ডিত ছাবরামের ছেলে রূপা। তাকে মানুষ করে তুলবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কসম্ খেয়েছিল মানসিং জেলে ছাবরামের মৃত্যুর সময়। মানসিং তার কথা রেখেছিল। রূপাকে মানুষ তৈরি করে তুলেছিল। তার ডান হাত হলো রূপা।

না আর না। মানসিং ভাবে এইবার ক্ষান্ত হবে সে। বয়স বাড়ছে। সে ক্ষমতা আর নেই। মাঝে মাঝে আবার বুকে কি রকম যেন একটা ব্যথা ওঠে। অনেক তো হলো। "খুন কা বদলা খুন" তো হয়েছে। আর কি দরকার। পুজো আর্চায় মন দেয় মানসিং। রূপাকে ডেকে বলে এবার যা করার তোরাই কর। আমার জীবনের সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। কেন আর খুন জখম করি। অনেক রক্ত তো হাতে লাগল। "খুন কা হোলি" আর কত খেলব? তোদের "দাউ"কে তোরা এবার বিশ্রাম দে।

রাতে ঘুমের মধ্যে "দাউ" মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে ওঠে। রক্তাক্ত দেহ সব তার চারদিকে ঘোরে—তল্‌ফীরাম, নেতরাম, যশবন্তসিং আরো কত! ঘুম থেকে উঠে পাশে রাখা রাইফেলটা সরিয়ে ফেলে। রূপাকে ডেকে বলে ওটা আমার সামনে থেকে নিয়ে যা। আমায় একটা ভালো লাঠি এনে দে।

জীবনের শেষ অধ্যায় শুরু হলো দস্যুরাজ মানসিং-এর। কিন্তু শেষ পাতা ওলটাবার আগেই তার জীবনের দ্বিতীয় আঘাত পেল মানসিং ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে।

ডুনডান-কা-পুরার কাছে ছোটো একটা সংঘর্ষে তার সব চেয়ে প্রিয়পুত্র, তার চোখের মণি তহসীলদারসিং হলো আহত। দলের লোকেরা আহত তহসীলদারকে একটা খাটে শুইয়ে কাঁধে করে দিনের পর দিন পালাতে লাগল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তহসীলদার! কতদিন পালাবে। চারদিন পরেই উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়ার কাছে আবার পড়ল তারা পুলিশের সামনে। আধ ঘণ্টা তুমুল লড়াইয়ের পর আহত তহসীলদারসিংকে ফেলে রেখে দলের লোক পালাল। যাবার আগে তাকে দিয়ে গেল রাইফেল আর গুলী, শেষ চেষ্টা করার জন্যে।

পুলিশ এল তহসীলদারকে ধরতে। খাট থেকে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তহসীলদার অর্ধেক উঠল। বন্দুক উঁচু করে তাক করে। শেষ চেষ্টা। কিন্তু এ কি! ফায়ার তো হয় না। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! তাড়াতাড়িতে দলের লোকেরা তাকে ভুল এমিনিউশন দিয়ে গিয়েছে! মানসিং-এর প্রিয় পুত্র চোখের মণি তহসীলদার ধরা পড়ল।

তহসীলদার এখন জেলে। দিন গুনছে কবে তার ফাঁসি হবে। সুপ্রীম কোর্টে তার শেষ আপীল নামঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। শেষ চেষ্টা সে করেছিল বাঁচতে। কোর্টে গিয়ে বলল, "আমি মানসিং-এর ছেলে তহসীলদার না। আমি অন্য কেউ।" কেউ মানেনি সে যুক্তি।*

মানসিং-এর পক্ষে এ আঘাত সহ্য করা কঠিন হলো। কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। যশবন্তসিং তারপর তহসীলদারসিং। আর কতো সে সহ্য করবে; একবার রাইফেল আর একবার লাঠিটার দিকে চায় ৫৮ বছরের বৃদ্ধ মানসিং। কোনটা নেবে? লাঠি না রাইফেল? রাইফেল না লাঠি?

রক্তে আবার আগুন নেচে উঠল। অর্থ চাই কোর্টে তহসীলদারের মোকদ্দমার জন্যে। সাক্ষীদের সাবাড় করতে হবে। রূপার দিকে একবার কাতর নয়নে চাইল দাউ। শুরু হলো আবার হত্যালীলা। হত্যা, লুঠতরাজ। পর পর ১৪ জন সাক্ষী মারা গেল! মানসিং তবুও ক্ষান্ত হলো না।

প্রতিশোধ, আরো প্রতিশোধ! "খুন কা বদলা খুন!"

তিন

মধ্যভারতের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনরসিং রাও দীক্ষিত-এর (এখন মধ্যপ্রদেশের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) প্রেস কন্‌ফারেন্স। জোর গলায় বললেন যদি এক বছরের মধ্যে মানসিংকে শেষ না করতে পারি আমি পদত্যাগ করব। মুচকি হেসেছিল অনেক সাংবাদিকই সেদিন যুবক মন্ত্রীর এই দাম্ভিক আস্ফালনে। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসের

*সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির হুকুমে তহসীলদারের ফাঁসির শাস্তি আজীবন কারাবাসে পরিবর্তিত হয়েছে।—লেখক।

গোড়ার কথা। তৈরি হলো থার্ড স্পেশাল আর্মড ফোর্সেস প্ল্যাটুন —ক্র্যাক কোম্পানি। বাছা বাছা পাহাড়ী আর গোরখা সিপাই। শুরু হলো তাদের ট্রেনিং।

এদিকে খবর আসছে আজ মানসিং এখানে, কাল ওখানে। খবর আসে আর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে পুলিশের অবিরাম অনুসরণ। চম্বল নদীর চারিদিকের পালানোর পথ 'সীল' করা হলো। চানপুরা, বিউওয়াড়ী, বেগুলারী অনেক জায়গাতেই হলো এন্‌কাউন্টার, কিন্তু প্রতিবারই মানসিং পালায়। ক্রমাগত চল্ল পনেরো দিন ধরে মানসিং আর পুলিশের মধ্যে লুকোচুরির খেলা।

২৪শে আগস্ট, ১৯৫৫। খবর পাওয়া গেল মানসিং তার দলবল নিয়ে লাওয়ান গাঁয়ের দিকে যাচ্ছে। ছুটল ক্র্যাক কম্পানী। ভিণ্ড্ থেকে সাড়ে চার মাইল দূরে লাওয়ান। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন্ চাফ্‌লের নেতৃত্বে প্ল্যাটুন পৌঁছল গাঁয়ে। হতাশা। আবার খবর এল মানসিং গিয়েছে পুবদিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্যাপ্টেন্ চাফ্‌লে নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। চার ভাগে ভাগ করলেন প্ল্যাটুনকে। একদল গেল পুবদিকে আর বাকী তিন দিকে অন্য তিন দল।

তখন তুপুর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রথম দল এগুচ্ছে আস্তে আস্তে লাওয়ান থেকে তিন মাইল আগে বিচপুরী-কাকারন-কাপুরার দিকে। আগের দিন রাতে হয়েছে বৃষ্টি। ভেজা নরম মাটির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ক্র্যাক কম্পানীর 'টুকরী'র (ডিটাচমেণ্ট) ভারী বুট চলেছে ধপ-ধপ-ধপ। গাঁয়ের নাপিত আরো পুবদিকে আঙুল তুলে দেখাল!

আস্তে আস্তে আরো আস্তে। কিন্তু কোথায়? কেউ তো নেই। আরো পুবদিকে প্রায় হাজার গজ দূরে মস্ত বড় বটগাছের কাছে এসেই তো রাস্তা শেষ। পাশে গরুর গাড়ির সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণে ভাঙা-ভাঙা জমি, তারপরই তো গিরিপথ। গরুর গাড়ির পথের তু'পাশে জোয়ার-ক্ষেত। তবে কি এত সতর্কতা, এত পরিশ্রম সব বৃথা?

ঐ তো কারা যেন গাছের নিচে শুয়ে আছে। বোধহয় গাঁয়েরই

লোক, তবুও দেখা যাক। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে "টুকরী"। তখনও গাছটা প্রায় ২০০ গজ দূরে।

জমাদার ভাঁনওয়ারী সিং চুপি চুপি ফিস্-ফিস্ করে বলে, "শুয়ে পড়ো। বুকে ভর দিয়ে চলো। ছাখো ওরা কারা।"

বুকে ভর দিয়ে চলে সিপাইরা। সবাইর আগে দলের স্কাউট সিপাই গোবিন্দ বাহাদুর থাপা।

বটগাছটা ১০০ গজ দূরে। এইবার ৫০ গজ দূরে……

গোবিন্দ বাহাদুর থাপা গাছ থেকে মোটে ২০ গজ দূরে কাছে—আরো কাছে…।

দুপুরের নিস্তব্ধতায় থাপার নিশ্বাস শোনা যায়। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা চিরে গাছের তলা থেকে কে যেন চীৎকার করে ওঠে "পুলিশ কে কুত্তে। ভাগো ভাগো।"

মোটে এক লহমার জন্যে থাপা দেখল একজোড়া সাদা ধবধবে গোঁফ।

"ডাকু মানসিং"—থাপার চীৎকার শোনা যায়।

"ফায়ার"—জমাদার ভাঁনওয়ারী সিং-এর গলা কেঁপে ওঠে।

আগুনের ঝল্‌কানি। রাইফেল গর্জে ওঠে এস. এ. এফ. থার্ড ব্যাটেলিয়নের ক্র্যাক কম্পানীর। গাছের ওপাশ থেকে ফিরে আসে রাইফেলের একঝাঁক গুলী। চম্বলের গিরিপথের চারদিক প্রতিধ্বনিত হয় গুলীর আওয়াজে।

বিপদ, ভীষণ বিপদ। প্ল্যাটুন কম্যাণ্ডারের কপালে ঘাম দেখা যায়।

ডাকাতরা গাছের আড়াল থেকে ফায়ার করছে আর তার প্ল্যাটুন রয়েছে খোলা জায়গায়। সবাই যে মারা যাবে। তাছাড়া পালাবার পথ বন্ধ না করতে পারলে যে চম্বলের গিরিপথের মধ্যে ডাকাতরা অদৃশ্য হয়ে যাবে। আরো ছোটো একটা দলকে ঘুরে পাঠাল গিরিবর্ত্মের মুখে দাঁড়াতে।

মানসিং দেখল সব শেষ। সামনে পুলিশ, পিছনে পুলিশ। এই শেষ সুযোগ। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল, হাতে লাঠি।

পাশে দাঁড়িয়ে তৃতীয় ছেলে সুবেদারসিং। আরেক পাশে রূপা। ছাবরামের ছেলে রূপা।

মুহূর্তের মধ্যে সুবেদারসিং-এর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধ মানসিং বুক ফুলিয়ে। এতক্ষণে দেখা গেল পুরোপুরি মানসিংকে। মুখে তার মৃদু হাসি। যে-মানসিং-এর কথা তারা আজ এত বছর থেকে শুনে আসছে সে আজ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো। প্ল্যাটুনের সেপাইরা থমকে দাঁড়ায়। তাদের আঙুলগুলো ট্রিগার-এর ওপর বোধহয় একটু কেঁপে ওঠে।

"মারো। ফায়ার। উস বুঢ্ঢেকো মারো। সফেদ মুছওয়ালে বুঢ্ঢেকে মারো। ফায়ার। মারো"—থাপা পাগলের মতো চীৎকার করে ওঠে।

দৌড়ে যায় থাপা। দুটো আগুনের ঝলকানি। আকাশের বুক চিরে দুটো আওয়াজ শোনা যায়—সুঁই—সুঁই। একটা থাপার বন্দুক থেকে আরেকটা মানসিং-এর বন্দুক থেকে।

মানসিং চোখে অন্ধকার দেখছে। পাশে হাত বাড়ায়, রূপা একদিকে, অন্যদিকে সুবেদার। কোথায় তারা? চম্বলের গিরিপথটা যেন কেমন দুলছে। ঘুরছে ক্রমাগত। নদীটাও যেন ঘুরপাক খাচ্ছে।

"দুর্গা মাঈ"…দস্যু মানসিং লুটিয়ে পড়ে। বুকের রক্তে বটগাছের নিচের শুকনো মাটি লাল হয়ে ওঠে।

সুবেদার আর রূপার হাতের রাইফেল আবার গর্জে ওঠে। স্কাউট গোবিন্দ বাহাদুর থাপার রক্তাক্ত দেহ গড়িয়ে পড়ে তার নিজেরই রাইফেলের ওপর।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সুবেদার আর রূপা ডুকরে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল 'দাউ'-এর মৃতদেহের ওপর। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই আবার উঠে দাঁড়াল। চোখে তাদের আগুন। এইবার শেষ চেষ্টা।

তারপরের ৫০ মিনিট যা হলো তার বিবরণ দেওয়া অসাধ্য। মানসিং-এর মৃতদেহ নিয়ে কী সে কাড়াকাড়ি। 'দাউ'-এর মৃতদেহ ডাকাতরা পুলিশের হাতে পড়তে দেবে না। আর এদিকে পুলিশ জানে, মানসিং-এর মৃতদেহ যদি তারা না নিয়ে যেতে পারে, তার

মৃত্যুসংবাদ কেউ-ই যে বিশ্বাস করবে না। মরিয়া হয়ে উঠল দুই দল। এক-এক গজ, এক-এক ফুট করে মানসিং-এর মৃতদেহ ডাকাতরা পেছনে টানবার চেষ্টা করে আর পুলিশের গুলীর ঝাঁকে এক-এক গজ আর এক-এক ফুট পিছিয়ে পড়ে।

আলো কমে আসছে। বেশি দূর দেখা যায় না। অন্ধকার নেমে আসবার আগেই যা হয় কিছু করতে হবে। বাপের মৃতদেহ জাপ্টে ধরল সুবেদার এক হাতে। অন্য হাতে রাইফেল। চোখে জল।

জমাদার ভাঁনওয়ারীসিং-এর রাইফেল গর্জে ওঠে। বাপের মৃতদেহ জড়িয়ে নিয়ে মাটিতে লুটিতে পড়ল সুবেদার, আর উঠল না। তখন রাত ন'টা।

কিছু দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার হয়ে এসেছে। গুরুকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে রূপা মিশে গেল চম্বলের গিরিপথে। চম্বলের হাতছানিকে সে উপেক্ষা করতে পারল না। তার যে এখনো অনেক কাজ বাকি। 'খুন কা বদলা খুন।'

পালাবার পথে কোন এক গাঁয়ের লোককে রূপা বলল, 'দাউকে হঠাৎ পেয়ে পুলিশের কুত্তারা তাকে মেরেছে। যাক, আমি এর প্রতিশোধ নেবো। খুন কা বদলা খুন।' মানসিং-এর অভিন্নহৃদয় বন্ধু পণ্ডিত ছাবরামের ছেলে রূপা। ছেলেকে সঁপে দিয়েছিল মৃত্যুর সময় মানসিং-এর হাতে। শেষ সময়েও মানসিং অন্ধকারে পাশে হাতড়ে খুঁজেছে রূপাকে। কসম্ খেয়েছিল যে সে। তা তো রাখতে পারল না।

এইবার কসম্ খেল রূপা। সে বদলা নেবে। নিয়েছিলও। সে অন্য ইতিহাস। তার কথা পরে।

পণ্ডিত ছাবরামের আদরের ছেলে রূপা ডাকাত হলে কি হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে তো। কিছুদিন জ্যোতিষচর্চা করেছে। সেদিন যখন দাউ লাওয়ান গাঁয়ের দিকে রওনা হচ্ছে—রূপা গণনা করে বলেছিল—"দাউ, আজকা দিন বড়া খরাব হ্যায়। আজ মৎ জানা উস্ দিশামে।"

হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল মানসিং রূপার ছেলেমানুষী। তার বিশ্বাস আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নেই। তার কাছে কাছেই তো থাকত

বৃদ্ধ এক জ্যোতিষী পণ্ডিত। সে তো বলেছিল, তহসীলদার অনেক দিন বাঁচবে। কিন্তু তহসীলদার কেন তাহলে ধরা পড়ল? ভেবেছিল, জিজ্ঞাসা করবে বৃদ্ধ জ্যোতিষীকে। কিন্তু তহসীলদার গ্রেপ্তার হবার পর বৃদ্ধ জ্যোতিষী যেন কর্পূরের মতো উবে গেল। তার তো আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কিন্তু তহসীলদারকে যে গ্রেপ্তার করেছিল, সেই ইন্সপেক্টর রামগোপাল উপাধ্যায়কে দাউ ক্ষমা করেনি। মথুরার ভাদোরা পুলিশ-স্টেশন থেকে দিনদুপুরে সে তাকে অপহরণ করে আনে।

সন্ধ্যেবেলা চেলা লাখনসিং নিজের হাতে গুলী করে মারে রামগোপালকে।

রাত দশটার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দীক্ষিত আবার করলেন প্রেস্ কন্‌ফারেন্স। এক বছর না, এক মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। মানসিং শেষ।

কিন্তু ছোট্ট একটা সমস্যা দাঁড়াল। কে বিশ্বাস করবে, মানসিং মারা গিয়েছে। মধ্যভারতের অনেক লোকে বলত, "মানসিং কো মারনেওয়ালী গোলী অব তক্ নহী বনী।" মানসিংকে মারবার মতো গুলী আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। কে সনাক্ত করবে মানসিং-এর মৃতদেহ আর জোরগলায় বলবে—"এই সেই মানসিং।"

জীপে করে দৌড়ল কিছু লোক উদিতপুরা গ্রামে। নিয়ে এল মানসিং-এর স্ত্রী রুক্মিণীকে।

মুখের ওপরের সাদা কাপড়টা সরাল রুক্মিণী। কয়েক সেকেণ্ড। তারপর কান্নায় সে লুটিয়ে পড়ল স্বামীর মৃতদেহের ওপর। কপালে ঠুকে ঠুকে হাতের চুড়ি ক'গাছা সে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল।

একদিন এই চুড়িই সে মানসিংকে পরতে বলেছিল। তারপর এই চুড়িই তো মাটির থেকে উঠিয়ে নিয়ে আনন্দে সে বুকে চেপে ধরেছিল। আজ সেই চুড়িই ভেঙে সে শুধু মানসিংকে সনাক্তই করল না, নিজের বৈধব্যেরও ঘোষণা করল।

পুলিশ এইবার নিঃসন্দেহ। খবর রটে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

হাজার হাজার লোকের ভিড় হলো মানসিংকে দেখতে। অনেকের চোখে জল।

অফিসারদের পায়ে লুটিয়ে পড়ল রুক্মিণী। "ওর মৃতদেহটা আমায় দাও। ওর নাতিরা বেঁচে আছে, তারা মুখে আগুন দেবে।" কেউ শুনল না। মানসিং-এর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হলো গোয়ালিয়র।

পরদিন সকালে গোয়ালিয়রের কম্পু ময়দানে মানসিং-এর মৃতদেহ রাখা হলো জনতার কৌতূহল নিবারণ আর 'দর্শন'-এর জন্যে। 'রাজা মানসিং' সাধারণ খাটিয়ার ওপর দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মুখে তার মৃদু হাসি। পাশে তার ছেলে সুবেদারসিং-এর মৃতদেহ। সামনে একটা বোর্ড, তাতে লেখা—

Killed by Special armed police at Kakran-ka-Pura, Bhind : 25-8-55 : Dacoits Mansingh and Subedarsingh.

মধ্যভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাঁর সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন জানালেন পণ্ডিত নেহরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

দুটো গুলী বুকের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে। ডাক্তার পোস্ট মর্টমের পর রিপোর্ট দিলেন আর তাতে এ-ও জানিয়ে দিলেন, মানসিং-এর হার্টও খারাপ ছিল : অনেক Fat deposit। পরনে ফিকে সবুজ চেক শার্ট আর লুঙ্গী। গলায় তুলসীর মালা। মুখে তিন-চারদিনের না-কামানো দাড়ি। হাঁটুর কাছে আরেকটা পুরোনো গুলীর দাগ। পকেটে ডায়েরী। তাতে অনেক সব নাম ঠিকানা। পরে পুলিশের কাজে এসেছিল ডায়েরীটা। পাশে পড়েছিল একটা লাঠি।

"লাঠি কেন ?" পুলিশের এক বড়কর্তাকে জিজ্ঞাসা করি।

"শেষ জীবনে মানসিং আর বন্দুক চালাত না। সঙ্গের লোকেরাই যা কিছু করবার করত। একবার শেষ সময়ে বন্দুক তুলে ধরেছিল আর তার আগে শেষবার বন্দুক নিয়ে মেরেছিল নিজের হাতে নেতরামকে—তার বাপের দুশমন তল্‌ফীরামের ছেলে।

পুলিশের রেকর্ডে উঠল—"End of the Scarlet Pimpernel of the Under-world।" রেকর্ডের ওজন হলো

এক টন। মানসিং-এর বিরুদ্ধে অভিযানে সরকারী খরচের হিসেব হলো মোট এক কোটি টাকা। প্রায় কুড়ি বছরের দস্যুজীবনে মানসিং ১৮৫টি হত্যা, আর ১১১২টা ডাকাতি করেছে। অপহরণ করে টাকা (র‍্যান্‌সম্) পেয়েছে পাঁচ লাখের ওপর। লুঠতরাজে পেয়েছে আরো অনেক অনেক লক্ষ টাকা। ১৯৫৪'র পর তার সঙ্গে পুলিশের হয় ৮০ বার সঙ্ঘর্ষ, তাতে পুলিশের প্রায় ৩২ জন লোক মারা যায় আর মানসিং-এর দলের গোটা পনেরো।

তহসীলদার সিং-এর গ্রেপ্তারীর খবর যখন মানসিং পায়, তখন রূপাকে বলে—"বেটা মেরী কমর টুট গই। অব ব্যস্ জ্যাদা দিন নহী। ওয়ক্ত করীব আগয়া।" জানত না বোধহয় এত তাড়াতাড়ি তার 'ওয়ক্ত' এসে পড়বে।

কিছুদিন পরেই গোয়ালিয়রে জয়বিলাস প্রাসাদে হলো ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান। মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়াল ক্র্যাক কম্পানীর স্কাউট সিপাই গোবিন্দ বাহাদুর থাপার বিধবা স্ত্রী আর ফুটফুটে মেয়েটা। সাইটেশন (Citation) পড়া হচ্ছে —থাপার বীরত্বের কাহিনী। পদক দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন, তাঁর চোখে জল। থাপার ছোট মেয়েটা ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে চারদিকের জাঁকজমক দেখছে। যখন বড় হবে, যখন দস্যুরাজ মানসিং-এর নাম সে শুনবে, তার সঙ্গে তখন তার বাবার নামটাও শুনবে।

"উস্‌কে বাদ।"

"উস্‌কে বাদ বেটা? উস্‌কে বাদ ক্যায়া? উস্‌কে বাদ সব খতম্!"

রুক্মিণীর কথা শুনতে পাই যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। শীর্ণ হাতটা তুলে ধরে আঙুলের কর গোনে বিড়বিড় করে, যশবন্ত সিং, সুবেদার সিং, ধম্মন সিং, ধনবন্ত সিং, হনুত সিং আউর উন্‌কে বাপ। পাঁচ ছেলে আর তাদের বাপ। একজন বাকি, তহসীলদার সিং, সে-ও তো ফাঁসি-কাঠে ঝুলবার অপেক্ষায়। আজ নয় কাল। তারপর? তারপর তো সব খতম্।

ভবিষ্যতের কথা কিন্তু এখনো ভাবে রুক্মিণী। তার নিজের ভবিষ্যৎ না। ছোটো ছোটো নাতি-নাতনীদের ভবিষ্যৎ। অনেক অর্থ, যশ, মান আর প্রতিপত্তি সে দেখেছে। আজ তার দিন চলা ভার। তার নিজের কথা ছেড়ে দিলেও এই যে ছোটো ছোটো নাতি-নাতনী ? তারা কি করবে ? মানসিং-এর জমি-বাড়ি সব হয়েছে বাজেয়াপ্ত। আইনের কাছে ৬২ বছরের এক বৃদ্ধা আর তার নাতি-নাতনীর চোখের জলের কোনো দামই নেই। 'গড়হী'তে বসেছে আজ পুলিশের ঘাঁটি। অনেক চেষ্টা সে করেছে সরকারের কাছ থেকে জমিজমা আর 'গড়হী' ফেরত পেতে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সে চেষ্টা।

"ইন্ বাচ্চোঁকা ক্যায়া কসুর।" রুক্মিণী হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করে বসেছিল। এই ছোটো ছোটো নাতি-নাতনী। তারা কি দোষ করল ? তাদের কি বাঁচার অধিকার নেই ? এদের দাদু, এদের বাপ ডাকাত ছিল বলে কি এরাও সমাজের কাছে, দেশের কাছে, সরকারের কাছে চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকবে ? বাঁচবার অধিকার পাবে না ? দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবে না ?

প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে ছিল না, তাই আমি দিতে পারিনি। অনেকেই পারেনি। অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছে রুক্মিণী। এখনও করছে। কিন্তু না পেয়েছে তার প্রশ্নের উত্তর, না হয়েছে তার সমস্যার সমাধান।

চুপচাপ বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন উদিতপুরা গাঁ থেকে। গাঁয়ের লাল ধূলো উড়িয়ে যখন জীপটা ঘড়ঘড় শব্দ করে রুক্মিণীর বাড়ির সামনে দিয়ে চলে আসে, দেখি, হাত দুটো দরজায় ভর দিয়ে রুক্মিণী দাঁড়িয়ে আছে।

কানের কাছে মাঝে মাঝে আজও রুক্মিণীর ব্যথাতুর কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে, "ইন্ বাচ্চোঁকা ক্যায়া কসুর।"

কেউ যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহলে বলে রাখি রুক্মিণী উদিতপুরা গাঁয়ে সেই উত্তর শুনবার জন্যে বসে আছে। আজ পনেরো বছর থেকে বসে আছে। আমি তো আর উদিতপুরা যাব না, কারণ আবার সেই প্রশ্নই রুক্মিণী

আমায় করবে, আর আমাকে আবার চুপিচুপি পালিয়ে আসতে হবে গাঁ থেকে।

আজ থেকে অনেকদিন পরে, যেদিন হয়তো রুক্মিণী থাকবে না, আমিও থাকব না, যদি কেউ কোন দিন কখনো উদিতপুরা বা তার আশেপাশে যায়, চম্বল পাহাড়, গিরিপথ আর সর্বনাশা সে নদীর বুক থেকে হয়তো বা তখনও প্রতিধ্বনিত হবে রুক্মিণীর সেই প্রশ্ন, "ইন্ বাচ্চোঁকা ক্যায়া কসুর।" হয়তো বা কান পেতে শুনলে শোনাও যাবে একটা দীর্ঘশ্বাস। অভিশপ্ত চম্বলের দীর্ঘশ্বাস।

চার

অভিশপ্ত চম্বল।

অতীতের চর্মবতী, আজ হয়েছে চম্বল। যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে তার নিজস্ব গতিতে, উত্তর থেকে দক্ষিণে নয়, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমে 'মাউ'। সেখান থেকে উঠেছে চম্বল তারপর ৩০০ মাইল ধরে ছুটেছে আলগা-আলগাভাবে উত্তরপ্রদেশ আর রাজস্থানকে ছুঁয়ে। যাত্রা শেষ হয়েছে উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়ার একটু দূরেই। মিশে গিয়েছে নীল যমুনার জলে।

সর্বনাশা চম্বল।

তৃষ্ণা তার এখনো মেটেনি। আগে নাকি জল ছিল লাল। অনেক যুদ্ধ হয়েছে এর তীরে। রক্তের ধারায় লাল হয়েছে চম্বলের নীল জল! শাণিত তলোয়ারের আঘাতে অনেক ছিন্ন শির জলে ছিটকে পড়েছে, জল হয়েছে আরও লাল। তবু শান্ত হয়নি চম্বল। চাই রক্ত, আরো রক্ত। রাগে আক্রোশে আর রক্তের নেশায় চম্বল পাগলের মতো ছুটে চলেছে মাইলের পর মাইল আর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সব কিছু। আশেপাশের তীরের গ্রাম ক্ষেত-খামার ভেঙে ডুবিয়ে তোলপাড় করেছে বছরের পর বছর। মর্মান্তিক তার সে ভাঙনের কাহিনী। যেখানে ছিল হাসিখুশিতে ভরা গাঁ আর সবুজ ক্ষেত, সেখানে আজ বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার দুর্গম গিরিপথ। মাইলের পর মাইল, এ পার থেকে

ওপার শুধু ছোটো-বড়ো গিরিসঙ্কট আর গিরিপথ। যুগ যুগ ধরে নিস্তব্ধ, নিঝুম; যখন বৈশাখী ঝড় বয়ে যায় গিরিপথের বুকে মনে হয় শত শত অশরীরী প্রেতাত্মারা বুঝিবা গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে। প্রতিধ্বনিকে মনে হয় লক্ষ লক্ষ দানবের অট্টহাসি। রাতের আঁধারে এদের মনে হয় নাম-না-জানা শত শত প্রহরী। অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে এরা ডাকে চম্বলকে 'আয়, এগিয়ে আয়। ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ, আরো ভাঙ।' অভিশপ্ত চম্বল সে ডাক শুনতে পায়। এগিয়ে যায় ভাঙনের গান গেয়ে।

ভিণ্ড, মোরেনা, শিবপুরী, গোয়ালিয়র আর দতিয়া। মধ্য-প্রদেশের এই পাঁচ জেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে অভিশপ্ত চম্বল। তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কালীসিন্ধ আর কুঁয়ারী। চম্বলে ভাঙনের নেশা ছোটো নদী কালীসিন্ধ আর কুঁয়ারীকেও পাগল করেছে। অনেকদূর চম্বল আর কুঁয়ারী চলেছে পাশাপাশি, হঠাৎ এক মোড়ের বাঁকে হয়েছে এরা আলাদা। লোকে বলে চম্বল ছিল কুঁয়ারীর প্রেমে আকুল। একদিন কুঁয়ারীর হলো অভিমান। মান ভাঙাতে অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে চলল চম্বল, কিন্তু কুঁয়ারী কথাটি কইল না। মোড়ের বাঁকে দু'জনে ধরল আলাদা আলাদা পথ। চম্বল হলো সর্বনাশা অভিশপ্ত চম্বল আর কুঁয়ারী ধীর শান্তগতিতে চলে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল। সেই থেকেই নাম হলো 'কুঁয়ারী'—কুমারী—কোনোদিন সে বিয়ে করেনি। আর কালীসিন্ধ যে কবে কোথায় কোন্ ভিড়ে মিশে গেল কেউ জানতেও পারল না। রয়ে গেল শুধু অভিশপ্ত চম্বল। আর রয়ে গেল চম্বলের অভিশাপ—আটশো বছরের পুরোনো মধ্যপ্রদেশের ডাকাতি সমস্যা, পুলিশী আর সরকারী ভাষায় যাকে বলা হয় 'Dacoity menace' সে সমস্যার সমাধান আজো হয়নি। কবে হবে বা আদৌ হবে কিনা কে জানে।

ভিণ্ড-মোরেনার লোকেরা বলে যতদিনের পুরোনো ঐ সব 'বেহড়' তার চেয়েও পুরোনো এখানকার ডাকাতির সমস্যা। সত্যি মিথ্যে কে জানে? তবুও ফিরে যেতে হবে অনেক দিন আগে। বোধহয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। দিল্লীর গদীতে তখন পৃথ্বীরাজ চৌহান। রাজপুতদের নিজেদের মধ্যেই শুরু হলো

গৃহবিবাদ আর কলহ। 'তোমর' বংশীয় রাজপুতদের পৃথ্বীরাজ তাড়িয়ে দিলেন বাহুবলে দিল্লী থেকে। পালিয়ে এল 'তোমর'রা এখনকার ভিণ্ড-মোরেনা এলাকায়। কিন্তু রাজপুতের ধমনীতে এই অপমান সইল না। পৃথ্বীরাজ নিজেও রাজপুত কিন্তু 'তোমর' রাজপুতরাও কিছু কম যায় না। শুরু হলো তাদের দিল্লী ফিরে যাবার ব্যর্থ অভিযান। বছরের পর বছর তারা আক্রমণ করেছে পৃথ্বীরাজের সৈন্য সামন্তদের। চম্বলের নীল জল তাদের রক্তে হয়েছে লাল। ফিরে এসেছে প্রতিবার পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে, আবার আক্রমণ করেছে দ্বিগুণ উৎসাহে। বছরের পর বছর চলেছে। তারপর একদিন পৃথ্বীরাজ চৌহানের রাজত্বও উঠে গেল আর 'তোমর' রাজপুতরাও শেষ হলো। কিন্তু তাদের বংশধররা তো রইল; "খুন কা বদলা খুন'। দিল্লীর বাদশা যেই থাক না কেন, দিল্লী যেতেই হবে বাদশার সৈন্যদের হারিয়ে। এক বাদশার পর অন্য বাদশা এসেছে, কিন্তু 'তোমর'দের ক্রোধ শান্ত হয়নি। তারপর একদিন ধীরে ধীরে দিল্লী অভিযান পরিণত হলো ডাকাতি আর দস্যু-বৃত্তিতে। বাঁচতে হবে 'তোমর' রাজপুতদের আর বাঁচার জন্যে চাই অর্থ। অর্থ পাবার সোজা উপায় লুঠতরাজ আর ডাকাতি। শুরু হলো ছোটখাট লড়াই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাজপুতদের, ঠাকুরদের সঙ্গে জাঠদের, গুর্জরদের সঙ্গে আহিরদের। কালক্রমে সবাই শুরু করল ডাকাতি।

দিল্লীর বাদশা শেরশাহ সুরী তখন ঠগ, পিণ্ডারীদের দমনে ব্যস্ত। এদিকে ভিণ্ড, মোরেনা, গোয়ালিয়র, শিবপুরা থেকেও ডাকাতদের উৎপাতের আর নৃশংসতার খবর ক্রমাগত আসতে লাগল। দু'হাজার ঘোড়সওয়ার পাঠালেন তিনি। কিছুই তারা করতে পারল না।

গোয়ালিয়রের মহারাজ মাধোরাও সিন্ধিয়াও একদিন চিন্তিত হয়ে পড়লেন ডাকাতি সমস্যা নিয়ে। পুরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন করলেন আর জমিদার ও জায়গিরদারদের ওপর 'ফার্মান' জারী হলো যদি তাদের এলাকায় কোনো ডাকাতি হয়, তাদের জমিদারী আর জায়গিরদারী বাজেয়াপ্ত হবে। ফল হলো, কিন্তু

সামান্য। ডাকাতদের অত্যাচারে লোকে জর্জরিত। ধন, মান, প্রাণ কারোরই আর সুরক্ষিত রইল না।

ডোঙর-বটরী, সুলতানা, ছল্লা, বলবতা, ঘুরগোলা, পঞ্চমসিং, চরজামল্লাহ, সুলতানসিং—দস্যু-সর্দারদের নামে আতঙ্ক ছেয়ে গেল। তারপর এল মানসিং—দস্যু-সম্রাট মানসিং।

বছরের পর বছর কি করে এই সব ডাকাতদের দল রাজা-বাদশার সুসজ্জিত সৈন্যদলের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে পেরেছে? এর উত্তর,—সর্বনাশা চম্বল চিরকাল আশ্রয় দিয়েছে, পালাবার পথ তৈরি করে দিয়েছে আর দিয়েছে এদের অসীম সাহস। প্রবাদ আছে চম্বলের জল যে খেয়েছে সে হয়েছে অমর। অমর এরা হয়নি, কিন্তু যতদিন এরা বেঁচেছে, এদের বাধা দিতে কেউ পারেনি। মরার পরও এদের নাম অমর হয়ে রয়েছে। এখনও গাঁয়ে গাঁয়ে সুলতানা, মানসিং, সুলতানসিং আর পুতলীর বীরত্বের কাহিনীর গান গায় লোকেরা।

উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থান এই তিন প্রদেশের কোল দিয়ে চলে গিয়েছে চম্বল আর তার আশেপাশে তৈরি হয়েছে গিরিপথ, যাকে এখানকার লোকেরা বলে 'বেহড়'। এই বেহড়ই হলো এদের আস্তানা। কেউ ডাকাত হলে এখানকার লোকেরা বলবে না যে অমুক লোক ডাকাত হয়েছে। বলবে 'উস্‌নে বেহড় পকড় লিয়া।' না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না কি বিভীষিকা এই 'বেহড়'। ভিণ্ড মোরেনা গোয়ালিয়র শিবপুরী আর দতিয়া জেলার ৬০০০ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে শুধু 'বেহড়'ই হলো ১৬০০ বর্গমাইল। যাঁরা আমেরিকার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেখেছেন তাঁরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন এই 'বেহড়' কাকে বলে। মাইলের পর মাইল শুধু 'বেহড়'—কোনোটা পাঁচ ফুট, কোনোটা দশ-পনের, একশো, আর কোনোটা পাঁচশ' ফুট উঁচু। নিচে খরস্রোতা চম্বল। কোনো কোনো 'বেহড়'-এ আবার ছোটো গ্রামও আছে। দীর্ঘ এক-একটা 'বেহড়'-এ পুরো এক ব্যাটালিয়ন পুলিশ হারিয়ে গেলেও টের পাওয়া দুষ্কর। ডাকাতদের কাছে এই সব 'বেহড়'-এর রাস্তা হাতের রেখায় মতো। এর অলিগলি সব মুখস্থ। কিন্তু পুলিশদের কাছে এই 'বেহড়' দুর্ভেদ্য, অজানা, বিভীষিকা।

ডাকাতি করে এরা ছুটে পালিয়ে মিশে যায় 'বেহড়'-এর অন্ধকারে, কিন্তু পুলিশের জীপ আর গাড়ি থেকে যায় অনেক দূরে। তাই তো বলা হয়—"Yet another Grand Canyon in the heart of India."

একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে কি সমস্যা এই 'বেহড়' নিয়ে। প্রতি বছর চম্বল তৈরি করে চলেছে 'বেহড়'। ধীরে ধীরে চাষের জন্যে জমি কমে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে বন্ধ হচ্ছে লোকেদের উপার্জনের পথ। সার্ভে করে জানা গিয়েছে চম্বলের 'বেহড়' চার লাখ একর ভূমি আত্মসাৎ করেছে। এই চার লাখের মধ্যে অন্তত আড়াই লাখ একর ভূমি চাষের যোগ্য। কিন্তু এই আড়াই লাখ একর জমির 'বেহড়' ভেঙে চাষের জন্যে তৈরি করতে হলে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত মোটে ৮৯৪ একর 'বেহড়' ভাঙা হয়েছে, আর তার জন্যে খরচ হয়েছে পাঁচ লাখ টাকা। সরকারী অনুমান হিসেবে এক একর জমির 'বেহড়' ভেঙে চাষের উপযোগী করতে হলে খরচ হবে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা।

কোনো দিনই হয়তো সব 'বেহড়' ভেঙে আবার চাষ শুরু হবে না, আর প্রতি বছরই চম্বল আবার তৈরি করে চলবে নূতন নূতন 'বেহড়' আর নূতন দস্যু-সর্দার আর দস্যু-দল।

অনেকবার ঘুরেছি এই এলাকায়। প্রাণ হাতে নিয়ে হেঁটে, সাইকেলে, ঘোড়ায়, জীপে মাইলের পর মাইল ঘুরেছি। জানতে চেষ্টা করেছি—কেন এরা ডাকাত হয়? কি করে হয়? কিছু উত্তর পেয়েছি, কিছু পাইনি। চম্বলের জলে কি আছে জানি না, কিন্তু এখানকার লোকদের বীরত্ব—সেন্স অব ব্রেভারী—আমায় অবাক করেছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মানদণ্ড দিয়ে এদের বীরত্ব যাচাই করা যায় না। এদের বীরত্ব এদেরই। তার মূলে রয়েছে সেই সনাতন প্রতিশোধের প্রণালী 'খুন কা বদলা খুন'—রক্তের বদলে রক্ত। প্রতিশোধের জন্যে হত্যা এদের সমাজের বীরত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ছোট দুধের ছেলেকে মা ঘুম পাড়াচ্ছে আর কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'মেরে বেটা, মেরা

লাল, তু বড়া হো যা, তু বহোত বড়া হো যা, জলদী বড়া হো যা। খুব উঁচা, খুব লম্বা, খুব তাকত্‌বর্‌। জলদি বড়া হোকে বেটা, তেরে বাপ্‌কা খুন কা বদলা লেনা'।

ছেলের বাপকে কে খুন করেছে। তার মা তাকে বলছে: তুই তাড়াতাড়ি বড় হ, খুব বড় হ, আরো আরো বড় হ, খুব উঁচু, খুব লম্বা, খুব শক্তিশালী হ। তুই বড় হয়ে তোর বাপের খুনের প্রতিশোধ নে। রোজ শুনছে, দিন-রাত তার মা'র কান্না আর অনুরোধ। ছেলে বড় হলো একদিন। সোজা গিয়ে বাপের হত্যাকারীকে খুন করে এল আর তার মা সেই রক্তের ফোঁটা তার নিজের কপালে লাগিয়ে, হাতের চুড়ি ভেঙে নিজেকে প্রথম বিধবা বলে ঘোষণা করল। যতদিন তার স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি সে নিজেকে বিধবা বলে কাউকে ডাকতে দেয়নি, কারুর ডাকবার সাহসও হয়নি। তারপর যে খুন হলো তার ছেলে তার বাপের হত্যার প্রতিশোধ নিল। তারপর তার ছেলে, তারপর তার ছেলে। বংশানুক্রমে সর্বনাশা চম্বলের অভিশপ্ত ছায়া এদের অনুসরণ করছে। খুন মানে অপরাধ, ধরা পড়া, জেল, ফাঁসি। তার চেয়ে ভালো ফেরারী হওয়া। কিছু দিন ফেরারী তারপর ডাকাতের দলে যোগ। এই তো নিত্য ঘটছে ভিণ্ড, মোরেনা, দাতিয়া, শিবপুরী আর গোয়ালিয়র জেলায়।

পুলিশের হাতে ধরা পড়া আর জেলে যাওয়ার চেয়ে ঘৃণিত অপমান এদের কাছে জীবনে আর কিছুই নেই। সাধারণ ঝগড়া মারামারি হলো দু'জনে। একজন আরেকজনকে মারল লাঠি। পুলিশে হলো রিপোর্ট। যে মেরেছে সে ভাবল যদি ধরা পড়ি জীবনের সবচেয়ে বড় অপমান সহ্য করতে হবে। তার চেয়ে ভালো, পালাও। কিন্তু কোথায়? কেন, ঐ যে 'বেহড়'। ব্যস সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। গাঁয়ের লোকে পুলিশকে বলল, 'উস্‌নে বেহড় পকড় লিয়া'। কিন্তু কতদিন থাকা যায় এমনিভাবে। গেল কোনো ডাকাত-সর্দারের কাছে, 'আমায় তোমার দলে ভর্তি করে নাও'।

'কেন, কি হয়েছে?' সর্দার জিজ্ঞাসা করে।

'—র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

'যা এই বন্দুক নিয়ে যা, ওকে মেরে আয় তারপর আমার কাছে আসিস্।'

রাতের আঁধারে বন্দুক দিয়ে খুন করে এল! শুধু তাই না, লোককে বলে এল, আমি ওকে খুন করেছি আর আমি এখন —র দলে যোগ দিতে চল্লাম।'

ডাকাত-সর্দার জানে এরপর তার দলের নতুন সভ্য সভ্য-সমাজে ফিরতে পারবে না। কারণ এখন সে খুনী। ধরা পড়লেই ফাঁসি। সে হবে তার অনুগত চেলা আর চেলা জানল যখন একটা খুন করলেও একবার ফাঁসি আর একশটা খুন করলেও একবার ফাঁসি, তখন করে যাও খুন, লুঠতরাজ। কী যায় আসে।

গাঁয়ের লোক থাকে চুপ। তাদের কাছে সাধারণ ঘটনা। এতদিন সে 'বেহড়' চলে গিয়েছিল শুধু, এখন তার সম্মান আরো বেড়ে গেল, সে এখন 'বাগী (বিদ্রোহী) হোগয়া'। গাঁয়ের লোকেরাই তাকে করে সাহায্য। তারাই তাকে খবর দেয় পুলিশের গতিবিধি কোথায় কোনদিকে। আর যারা তাকে সাহায্য করে না বা তার বিরুদ্ধে কাজ করার চেষ্টা করে তাদের বেঁচে থাকার দিন হাতের আঙুলে গুণতে হয়।

ভিণ্ডের জগন্নাথসিং ছিল এমনি একজন লোক। মানসিং-এর সন্দেহ হয়, সে-ই পুলিশকে তার গতিবিধি সম্বন্ধে খবর দেয় যার ফলে তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়পুত্র তহসীলদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে উঠতে পারে। মানসিং-এর চোখ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠল। পর পর প্রায় ৪০টা লোককে হত্যা করল মানসিং, যাতে কেউ তহসীলদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে না পারে। কিন্তু জগন্নাথসিং! সে থাকে পুলিশের কড়া পাহারায়, থানায় নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে। কিন্তু একদিন সে ছোট্ট একটা ভুল করল। এক আত্মীয়ের বিয়েতে যাবার জন্যে গাঁয়ের দিকে সবে পা বাড়িয়েছে আর ঝড়ের মতো মানসিং আর তার দল জগন্নাথসিং-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর যে নির্মম অত্যাচার তার ওপর দু'দিন ধরে চলল তা বর্ণনা করা যায় না। প্রথমে জগন্নাথের চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হলো। দুটো হাত কাটা হলো। ছুরী দিয়ে টুকরো টুকরো করে শরীরের মাংস কাটা হলো। সারা রাত তার

আর্ত-চিৎকারে গাঁয়ের লোক নাকি ঘুমুতে পারেনি। থানায় বসে পুলিশের সেপাইরা ঠক্ ঠক্ করে কেঁপেছে ভয়ে আর মাঝে মাঝে 'বেহড়'-এর মধ্যে থেকে ভেসে এসেছে জগন্নাথসিং-এর বুক ফাটা আর্তনাদ।

পাঁচ

"The case of Mansingh is representative of the peculiar problems of this area. He is reported to be a man with no private vices. Stories are told of him in hushed voices of admiration of how he helps good causes, kills informers and policemen only when pursued, just lifts few men who have money to spare, respects Brahmins who give him blessings and occasionally coerces zamindars to contribute to desirable objects like School Buildings. His admirers often remark that he represents the high-water mark of dacoity nobly practised. Officer of Revenue, Customs and Education Department could run into him without fear. He could join marriage-celebration attended by hundreds of people. Now however he is on the run. His case illustrates how the natural revulsion against heinous offences can be mellowed by adopting ingenious methods......"

কোনো রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা বা আমার কোনো থিসির-এর অংশ নয় এ উদ্ধৃতি। তখনকার মধ্যভারত (এখন মধ্যপ্রদেশ) গভর্নমেণ্টের "ক্রাইম সিচুয়েশন এনকোয়ারী" কমিটির রিপোর্টের অংশ। তখনও মানসিং বেঁচে। চারদিক থেকে ক্রমাগত তার আর ছোটো ছোটো অন্য ডাকাত দলের অত্যাচারের খবরে গভর্নমেণ্ট শঙ্কিত। খবরের কাগজে, জনসভায়, রাস্তাঘাটে, হোটেল, রেস্তোরাঁয় গভর্নমেণ্টের কর্মহীনতার কটু মন্তব্য শুরু হয়েছে। গভর্নমেণ্ট কমিটি বসালেন ১৯৫২ সালে আর প্রায় এক বছর পরে কমিটির ৪৫ পাতার রিপোর্ট প্রকাশিত হলো।

গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দেখেছি কিন্তু কাউকে বলতে শুনিনি মানসিং খারাপ লোক ছিল। এখনও মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গায় আর উত্তরপ্রদেশের খেড়া-রাঠোর গাঁয়ের লোকেরা "রাজা" মানসিং-এর খ্যাতি আর বীরত্ব নিয়ে গান রচনা করে গায়। আগ্রা থেকে কিছু দূরে গেলেই গাঁয়ের লোকেরা দেখাবে বটেশ্বরনাথের মন্দির। তারা বলে মন্দির তৈরি হয়েছে মানসিং-এর অর্থ দিয়ে। অন্য গাঁয়ে শোনা যাবে পাঠশালা তৈরি করবার অর্থ এসেছে তার কাছ থেকে। আরো এক গাঁয়ে গেলে হয়তো এমন গৃহস্থও খুঁজে পাওয়া যাবে যার মেয়ের জন্যে "রাজা" মানসিং শুধু অর্থই নয় পাত্রও যোগাড় করে দিয়েছে। পুলিশের সতর্ক পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে বছরের পর বছর কার্তিক পূর্ণিমার রাতে মানসিং বটেশ্বরনাথের মন্দিরে বিরাট ঘণ্টা টানিয়েছে। তার মৃত্যুর পর ঘণ্টা টানিয়েছে তার বিশ্বস্ত অনুচর রূপা। গায়ের প্রতিটি লোক জানে কবে কেমন করে মানসিং আর রূপা ঘণ্টা বেঁধে গিয়েছে কিন্তু কেউ বলবে না। যাতে "দাউ"-এর অনিষ্ট হয় এমন কথা কি বলতে পারে!

শুধু মানসিং নয়, অনেক ডাকাতদের পক্ষেই এই কথা খাটে। গাঁয়ের লোক তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছুই বলবে না। ডাকাতরা গাঁয়ে আসে, থাকে, খায়দায় কিন্তু পুলিশ কোনো সাহায্যই পায় না গ্রামবাসীদের কাছে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত। যা সভ্য-সমাজ বা পুলিশের কাছে অপরাধ এদের কাছে তা বীরত্বের নিদর্শন। ধীরে ধীরে, এরা হয়তো বুঝতে পারবে লুঠতরাজ আর খুন জখম বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আওতায় পড়ে না। কানুন নিজে হাতে নেওয়া যায় না। অনেক সময় লাগবে। কিছু কিছু গাঁয়ের লোকে বুঝতে পেরেছে আর তাই গভর্নমেণ্টের পক্ষে প্রায় ৮০০ গ্রামরক্ষা সমিতির (সভ্যসংখ্যা মোট ২৬০০০) স্থাপনা সম্ভব হয়েছে।

গায়ের মোড়ল, এখানে যাদের বলে প্যাটেল, তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। "সাহাব, কেয়া বতায় হামারী মুসীবত। বতায়েঁ তো ডাকু মারতে হ্যাঁয় আউর নহী বতাতে তো পুলিশ-ওয়ালে মারতে হ্যাঁয়।" যদি এরা ডাকাতদের কথা

পুলিশদের বলে দেয় তাহলে ডাকাতরা প্রতিশোধ নেয় ভীষণভাবে আর যদি না বলে পুলিশের অত্যাচারে গাঁয়ে টেকা দায় হয়ে পড়ে। তাছাড়া জাতপাত নিয়ে তো গাঁয়ে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে, তাই গ্রামের "ঠাকুর" অধিবাসীরা নিজেদের সুরক্ষিত ভাবে যখন এলাকার ডাকাত হয় ঠাকুর। তখন ব্রাহ্মণরা ভয়ে মাথা তুলতে পারে না। ব্রাহ্মণ ডাকাত হলে ব্যাপারটা হয় উল্টো। 'গুজর' ডাকাতরা হরিজনদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। এমনও দৃষ্টান্ত আছে যেখানে গাঁ গাঁ থেকে হরিজনরা মাসের পর মাস ডাকাতদের 'চাঁদা' দিয়েছে প্রাণভিক্ষার বদলে।

তাই যখন মানসিং মারা গেল অনেকেই বিশ্বাস করল না পুলিশ তাকে মেরেছে। এখনও অনেক লোক আছে যারা বিশ্বাস করে না। তারা কোনোকালেই করবে না, কারণ মানসিং তাদের কাছে এ যুগের রবিনহুড, 'গরিবোঁকা মাই বাপ' তার 'জালিম সরকারকা দুষমন'। মানসিং-এর মৃত্যুর পর অনেক কাগজে খবর বেরিয়েছিল মানসিং নিজেই আত্মহত্যা করেছে কারণ সে ছিল 'বাগী' (বিদ্রোহী)। আবার কেউ বললে মানসিংকে বিষ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে 'কনফিডেন্স ট্রিক' করে।

মধ্যভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরসিংরাও দীক্ষিত যখন ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে জোর গলায় ঘোষণা করেন যে, তিনি যদি এক বছরের মধ্যে মানসিংকে শেষ করতে না পারেন তাহলে পদত্যাগ করবেন, তখন তিনিও হয়তো একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন হঠাৎ কি মনে হলো সুদূর কাশ্মীরে গেলেন, বেড়াতে না, অমরনাথে তীর্থযাত্রা করতে। শিবলিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'ভগবান মুঝে কুছ নহী চাহিয়ে। মানসিং কো খতম্ কর্ দে। মুঝে সফলতা দে, মুঝে কাময়াবী দে'। লোকের কাছে না, দীক্ষিতজীর নিজের মুখে শোনা। ভগবান দীক্ষিতজীর কাতর প্রার্থনা শুনেছিলেন। এক বছরের আগেই মানসিং 'খতম্' হলো।

আবার একটু ফিরে যাই উদিতপুরা গ্রামে মানসিং-এর স্ত্রী রুক্মিণীর কাছে। ১৯৫৪ সালের ঘটনা। ভারতের তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু (এখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী), মধ্যভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনোহরসিং মেহতার

সঙ্গে গিয়েছেন উদিতপুরা গাঁয়ে। নিজের বাড়ির সামনের উঠোনে খাটিয়ার উপর বসে আছে রুক্মিণী নাতি-নাতনীদের নিয়ে। বাড়ির সামনে হঠাৎ এত ভিড় দেখে হকচকিয়ে গেল। আবার বুঝি কোনো বিপদ এল। বড় নাতিকে নিজের অজান্তেই রুক্মিণী বুকে জড়িয়ে ধরে। শুধু খানিকক্ষণের জন্যে, তারপরই রুক্মিণী সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যখন জানতে পারে কারা তার বাড়িতে এসেছে। ঘৃণায় রুক্মিণী একবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবু কি মনে হলো, ঘরের ভিতর ছুটে চলে গিয়ে বের করে আনল বহুদিনের লেখা একটা দরখাস্ত। লিখেছিল সরকারকে পাঠাবার জন্যে। অনেক কাকুতি-মিনতি ভরা সে দরখাস্তে রুক্মিণী সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল তার স্বামী মানসিংকে যেন সরকার ক্ষমা করে দেন। তাহলেই মানসিং আবার ফিরে আসবে সভ্যজগতে আর নিজের ঘরদোর নিয়ে বাকী জীবনটা শান্তিতে কাটাবে। আজ তো 'সরকার' তার দরজায় এসেছে তাই তাড়াতাড়ি দরখাস্তটা ডাঃ কাটজুর হাতে দিয়ে নিজে জোড়হাত করে দাঁড়াল রুক্মিণী।

দরখাস্তটা খানিকক্ষণ পড়ে ডাঃ কাটজু রুক্মিণীকে বললেন, সে যেন মানসিংকে আত্মসমর্পণ করতে বলে।

"কুঁ্য ?" রুক্মিণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'কুঁ্য কী, কানুন কী নজরোঁ মে বোহ ডাকু আউর খুনী হ্যায়।'

ডাঃ কাটজু বোঝান, আইনের চোখে মানসিং ডাকাত এবং খুনী।

"আচ্ছি বাত হ্যায়। তুম সব গাঁওকে লোগোঁকো পুছো। আগর এক ভী আদমী কহদে বহ্ খারাব আদমী হ্যায়, ম্যায় উস্‌সে কহুঙ্গী বহ্ পুলিশকে হাবালে হো যায় গা।"

রুক্মিণী অকাট্য যুক্তি দেখায়। যদি আশেপাশের গাঁয়ের একজন লোকেও বলে মানসিং খারাপ মানুষ তাহলে রুক্মিণী নিজে তাকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলবে।

কথাটা হেসে উড়িয়ে দেন ডাঃ কাটজু। কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বললেন, ওসব চলবে না। যদি মানসিং আত্মসমর্পণ না করে তাহলে ভালো হবে না বলছি।

আগুন হয়ে ওঠে রুক্মিণী। কি এত সাহস! 'রাজা' মানসিং-এর স্ত্রীকে চোখ-রাঙানি! "যাও যাও, তুম সে যো কুছ বনে কর্ লে না।" তোমার যা ইচ্ছে তাই করোগে। দড়াম্ করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল রুক্মিণী।

মধ্যভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনোহরসিং মেহতা বোঝালেন ডাঃ কাটজুকে মানসিং-এর জনপ্রিয়তার কথা। ধর্মভীরু মানসিংকে সবাই ভক্তি করে। সাধারণ অপরাধীর মতো সে তো নয়। মদ মেয়েমানুষ থেকে মানসিং অনেক দূরে। শুধু তাই নয়, আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি কোনো ডাকাতিতে গিয়ে মানসিং মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে। অনেকদিন আগেকার কথা। এক গাঁয়ে ডাকাতি করে মানসিং তার দলবল নিয়ে ফিরছে। গাঁয়ের শেষদিকে কুয়োর কাছে দাঁড়াল সবাই জল খাবার জন্যে। মেয়েদের ভিড় সরে গেল একদিকে। জল খেয়ে সবাই চলল এগিয়ে। খানিকক্ষণ চলার পর মানসিং-এর হঠাৎ খেয়াল হলো একজন লোক কম। কোথায় সে? রূপা দেখিয়ে দিল কুয়োর দিকে। একটা গাঁয়ের মেয়ের শাড়ি আঁচল ধরে টানাটানি করছে লোকটা। দু'পা এগিয়ে গেল মানসিং। রাইফেল তুলে তাক্ করে মারল মোটে একটা গুলী।

মানসিং-এর নিজের বোনের ছেলের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল কুয়োর পাড়ে। স্ত্রীলোকের সঙ্গে অসভ্য ব্যবহারের চরম শাস্তি সে পেল।

মানসিং ফিরেও তাকাল না। "আগে বঢ়ো", দলের বাকী লোকদের হুকুম দিল।

অনেক ছোট বড় কবিতা আর গল্পের বই আছে মানসিং-এর বীরত্ব নিয়ে। গাঁয়ে গাঁয়ে এখনও লোকেরা সেই বই পড়ে আর শোনায় তাদের ছেলেমেয়েদের। 'মানসিং কা জোহর', 'চম্বলকা শের সর্দার মানসিং', 'বাহাদুর মানসিং' আর কত না জানি তাদের সব নাম। মানসিং-এর জন্মের কথা লিখতে গিয়ে একটা বইয়ে লেখা হয়েছে—"সন্ধ্যে পাঁচটা বেজে ছত্রিশ মিনিটে, বুধবার, সাতই মাঘ, বিক্রমী ১৮৮৯ সালের কৃষ্ণপক্ষে, গঢ়ী-ফট্টি, খেড়া-রাঠোর গাঁয়ে মানসিং-এর জন্ম হয়।"

গাঁয়ের কবি 'আল্হা' গাইল—

"রস্তা চলতা কোই নহী লুটা,
মিত্রৌ স্থনলো কান লাগায়।
আপনা দুশমন জীয়ত ন ছোড়া,
বায় গোলী সে দিয় উড়ায় ॥
জাইগ্রাম মে মানসিং পৌঁহচে,
খাতির উস্‌কী করে বনায়।
বারহ বর্ষ কো এক যুগ বীতৌ,
অব আগে কা স্থনো হবাল ॥"

অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ মানসিং-এর কাহিনী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেদিন পুলিশ রেকর্ড ঘাঁটতে ঘাঁটতে ২৫ আগস্ট ১৯৫৫ সালের সেই ভয়ানক এনকাউণ্টারের একটা বিবরণ চোখে পড়ল। জমাদার ভাওয়ারী সিং, যার অধীনে ক্র্যাক কোম্পানীর গোবিন্দ বাহাদুর থাপা, দস্যুরাজ মানসিং-এর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল কাকরান-কা-পুরা গাঁয়ে তার চাক্ষুষ বিবরণীতে লিখেছে—

"As I and my men reached some distance from Kakren-ka-pura, we noticed some persons sitting in the open drinking milk and eating something. When we reached a distance of about 60 yards, we were greeted with a shower of bullets suddenly from that spot. Immediately, I ordered my men to take positions and fire.

"The terrain was plain and I noticed a man in white whiskers firing a tommy gun from behind a peepul tree. From the description given to us, I was sure that, this was Mansingh. So I directed all my men to shoot him down......

"Thapa aimed his tommy gun, stood up and fired at the old man in white whiskers. Mansingh returned the fire with his tommy gun, but he was the first to fall and next was Thapa. Then Mansingh's son Subedar Singh and his lieutenant, Roopa tried to drag their

leader's body.........Subedar and Roopa abused us saying "you dogs of the Police go back otherwise we will kill all of you."

গোবিন্দবাহাদুর থাপা আজ বেঁচে নেই। থাকলে হয়তো মানসিং-এর শেষ মুহূর্তের আরো কিছু বিবরণ পাওয়া যেত। কিন্তু সে বেঁচে আছে তার বীরত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ নিয়ে তাদের কাছে, যারা আজও নিজেদের প্রাণের বাজী লাগিয়ে মধ্যপ্রদেশের অভিশাপ মুছে দেবার জন্যে অভিশপ্ত চম্বলের 'বেহড়ে' মাসের পর মাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানসিং শেষ হয়েছে কিন্তু শেষ হয়নি ডাকাতি সমস্যা। আরো যে অনেক আছে। চম্বলের রক্তের তৃষ্ণা যে এখনও মেটেনি।

খুশির লহরে ছেয়ে গেল সারা মধ্যভারত। অনেক ফুলের মালা পরলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরসিংরাও দীক্ষিত। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী নেহরু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থ সবাই অভিনন্দন জানালেন তাঁকে, মধ্যভারতের গভর্নমেণ্ট আর পুলিশকে। খবরের কাগজে কলামের পর কলাম লেখা হলো মানসিংকে নিয়ে কিছু সত্যি কিছু মিথ্যে। বিলাতী আর আমেরিকান কাগজে বিংশ শতাব্দীর ইণ্ডিয়ান রবিনহুডকে নিয়ে হলো হৈ-চৈ। কয়েকজন হোমরা-চোমরা করেসপণ্ডেণ্ট তো হাওয়াই-জাহাজে করে ছুটে এলেন ভারতবর্ষে। এই বিরাট অভিশাপ আর সমস্যা যা শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছিল হঠাৎ তা আজ সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সাফল্যের গর্বে ফুলে উঠলেন মধ্যভারতের বড় কর্তারা। ভাবলেন বুঝি মানসিং-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি সমস্যাও শেষ হয়ে গেল। তাঁরা ভাবলেন বুঝি অভিশপ্ত চম্বলে শান্তি ফিরে এল। কি ভুল যে তাঁরা করলেন তা তখন বুঝতে পারেননি। কিছুদিন পরেই রূঢ় সত্যের মতোই বুঝতে পারলেন অভিশপ্ত চম্বলে যে শান্তি এসেছিল তা শুধু ক্ষণিকের জন্যে। সে শান্তি ছিল শ্মশানের শান্তি। আগুন জ্বলছিল ধিকিধিকি। হঠাৎ একদিন আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল।

সেদিন ১লা নভেম্বর ১৯৫৬ সাল। রাত বারোটা এক মিনিটে ২১বার তোপধ্বনি হলো। পুলিশ ব্যাণ্ডে বাজাল "জন গন মন"। নতুন মধ্যপ্রদেশের জন্ম হলো নতুন রাজধানী ভূপালের "মিণ্টো হলে।" অনেক দিন আগে নবাব শাহজাহান বেগম, লর্ড মিণ্টোর অভ্যর্থনায় শুধু একটিমাত্র নৈশ-ভোজের জন্যে তিন লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরি করেছিলেন মার্বেল-খচিত "মিণ্টো হল"। সেই হলে শপথ গ্রহণ করলেন নতুন মন্ত্রিমণ্ডল। নতুন প্রদেশ, নতুন রাজধানী। চারদিকে উৎসাহ আর ধুমধাম।

কিন্তু বেশিদিন রইল না এই নতুন উদ্দীপনা আর আনন্দ। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন নতুন গভর্নমেণ্ট ডাকাতদের উৎপাতে। খবরের পর খবর আসে নতুন নতুন ডাকাত দলের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের। মানসিং-এর মৃত্যুর পর কিছুদিন শান্তি এসেছিল চম্বলের উপত্যকায়। তারপরই মানসিং-এর "রাজত্ব" ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। মানসিং-এর জীবন-কালেও অন্য কয়েকটা দল ছিল ছোটখাট কিন্তু এখন তৈরি হলো ১৬টা দল। প্রায় ২০০ দুর্ধর্ষ ডাকাত। এদের ধরা বা মারার জন্য পুরস্কার ২ লাখ টাকা। নতুন সরকারের সমস্ত মান-সম্মান প্রতিষ্ঠা আর খ্যাতি ধুলোতে মিশিয়ে দিয়ে এরা সারা প্রদেশে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করল। মানসিং-এর দল আবার তৈরি করল রূপা। খবর আসতে লাগল এখান ওখান থেকে খুন রাহাজানি, ডাকাতি অপহরণ। লাখন সিং গাঁয়ে গাঁয়ে আগুন লাগিয়ে আর অত্যাচার করে লাখ লাখ টাকা লুঠ করল। দুর্ধর্ষ দস্যু গব্বর সিং কিন্তু এক অভিনব নৃশংস অভিযানে নামল। হঠাৎ একদিন প্রতিজ্ঞা করে বসল সে, ১০২টা নাক কাটবে। ভয়ানক সে দৃশ্য গোয়ালিয়র হাসপাতালে। লোকের পর লোক আসছে, প্রত্যেকের নাক কাটা। চল্লিশজন নাক-কাটা লোককে আমি নিজে দেখলাম গোয়ালিয়র হাসপাতালে। কল্লা-পুতলীর দল দু'জন পুলিশ অফিসারকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করল। ডাকাত বারেলাল অবিরাম করে চলল হত্যা আর লুঠ। গভর্নমেণ্টের টেকা দায় হলো।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু রওনা হলেন ডাকাতি-অধ্যুষিত এলাকা নিরীক্ষণ করতে। পৌঁছলেন সুদূর গুড়া গ্রামে, যার আশেপাশে নির্বিরোধভাবে ডাকাতি চালিয়ে যাচ্ছিল দুর্ধর্ষ দস্যুদল আর খবর আসছিল তাদের নৃশংস অত্যাচারের। ভোরবেলায় পৌঁছবার কথা ডাঃ কাটজুর। রাতের আঁধারে ডাকাতদল এল গুড়া গ্রামে। ন'জন ব্রাহ্মণকে ঘর থেকে বার করে তাদের নিয়ে গেল পেছনের "বেহড়ে"। হাত-পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে একের পর এক ন'জনকে গুলী করে হত্যা করল। যাবার আগে বলে গেল—"কিছু না, ডাঃ কাটজুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গেলাম।" পরের দিন সকালে যখন মুখ্যমন্ত্রী গাঁয়ে এলেন, ন'জন ব্রাহ্মণের চিতার আগুন জ্বলছিল দাউ দাউ করে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। চুপ করে মাথা নিচু করে গাঁ থেকে বেরিয়ে এলেন কাটজু। আবার দতিয়া জেলা থেকে খবর এল সেই রাতেই গব্বর সিং সেখানে এক সঙ্গে চৌদ্দজন লোককে হত্যা করেছে।

অনেক হয়েছে, আর না। কনফারেন্স ডাকা হলো। হিসাব হলো। এক বছরের হিসাব। ৩৬৩ ডাকাতি, ১৫৮ হত্যা, ৫৮ জন লোক অপহরণ আর প্রায় ২ লাখ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন। তৈরি হলো প্ল্যান চম্বলের অভিশাপ চিরতরে শেষ করার জন্যে। প্রায় ৪০০০ বাছা বাছা সিপাই আর অফিসার মোতায়েন করা হলো উত্তর মধ্য-প্রদেশের অভিশপ্ত পাঁচ জেলায়। বিশেষ অভিযান—"Special anti-Dacoity operation"। ২১শে মে, ১৯৫৭। হাজার হাজার জীপ, ওয়্যারলেস্ স্টেশন, নতুন নতুন অস্ত্র। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ফল আসতে লাগল। অনেক ডাকাত মারা পড়ল। যদিও ডাকাতি সমস্যার সমাধান হলো হলো না, তবুও অনেক ছোটখাট ডাকাত-দল শেষ হলো। দু'বছরে খরচ হলো প্রায় তিন কোটি টাকা। দু'বছরে ডাকাতি হলো প্রায় ৭০০, হত্যা ২৬০, অপহরণ প্রায় ১০০, সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রায় ৪ লাখ টাকার। ডাকাত মারা গেল ৯৪, গ্রেপ্তার হলো প্রায় ৬৫০ আর হাজার হাজার গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র পুলিশের হাতে এল।

অভিযান এখনো চলছে। হয়তো বছরের পর বছর চলবে। ডাকাত মরছে আবার নূতন ডাকাত-দল তৈরি হচ্ছে। কবে যে

এর শেষ কেউ বলতে পারে না। কিন্তু একথাও সত্যি যে, বড় বড় ডাকাত-দলের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এরা শেষ হলে ডাকাতি সমস্যা হয়তো শেষ হবে না, কিন্তু হাজার হাজার বছরের এই অভিশাপ কিছু হয়তো কম হবে। মানসিং, রূপা, অমৃতলাল, গব্বর, পুতলী, হজুরী হয়তো আর হবে না। কে জানে! এখনও লাখন সিং বাকী আছে। সে কথা পরে।

ঝাঁসীর কাছে আর্মি ক্যাম্প "বাবিনা"! এখানেই আর্মারিতে হাবিলদার ছিল লালসিং। ম্যাট্রিক পাশ, সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। হঠাৎ ধরা পড়ল লুকিয়ে ডাকাতদের কাছে রাইফেল বিক্রি করার অপরাধে। কোর্ট মার্শাল হলো। একদিন সকালে খবর পাওয়া গেল, লালসিং কোর্ট মার্শালের গরাদ ভেঙে পালিয়েছে। তারপর আর লালসিং-এর কোন খবর নেই। দু'মাস পরে চম্বলের উপত্যকায় আবির্ভাব হলো এক দুর্ধর্ষ নতুন ডাকাত। নাম তার লালসিং।

লালসিং-এর কথা পরে বলব। আর লালসিং কি করে মারা গেল সেকথাও বলব। সুন্দর সুপুরুষ যুবক ক্ষিদেয় তেষ্টায় দিনের পর দিন পালিয়ে বেরিয়েছে চম্বলের "বেহড়ে"। এক মুঠো ভাত, একটা রুটী, এক গ্লাস জলের জন্যে দিতে চেয়েছে একটা রাইফেল, অনেক কার্তুজ। পুলিশের গুলীতে যখন লালসিং মারা গেল, পোস্ট মর্টমের পরে তার পেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল শুধু কয়েকটা জঙ্গলী ফল। সে কথা পরে। লালসিং-এর কথা এখানে বলার উদ্দেশ্য শুধু ডাকাতদের অস্ত্রশস্ত্র পাবার সূত্র নিয়ে কিছু আলোচনা। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছে কোথা থেকে পায় এরা অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ?

পুলিশের বা মিলিটারীর খাকী ইউনিফর্ম পরেই বেশির ভাগ ডাকাতরা থাকে। কোথা থেকে যোগাড় হয় সে কথা আলোচনা করে লাভ নেই, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট, যোগাড় করে নেয়। দেশব্যাপী চলেছে অস্ত্রের অবৈধ ব্যবসা, তার বেশির ভাগ পৌঁছয় এদের হাতে। হায়দরাবাদ "পুলিশ অ্যাক্শন" হবার পরও অনেক অস্ত্রশস্ত্র চলে যায় এদিক-ওদিক আর তার এক বিরাট অংশ এরা

পায়। তাছাড়া, পুরোনো মধ্যভারতে ছোটো বড়ো দেশীয় রাজ্যে অস্ত্রের ছিল ছড়াছড়ি। ভাবলে অবাক হতে হয়, কিছু কিছু ডাকাতদের কাছে আধুনিক অস্ত্রও আছে: টি. এম. সি. লাইট মেশিনগান, টেলিস্কোপিক রাইফেল, হ্যাণ্ড গ্রিনেড এবং আরো অনেক। যেদিন ডাকাতদের অস্ত্রশস্ত্র পাবার পথগুলো বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন হয়তো ডাকাতি সমস্যার শেষ অধ্যায় শুরু হবে।

সুদূর পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুর থেকে ডাকাত অমৃতলালকে রাইফেল বিক্রি করতে এসেছিল একজন। হঠাৎ পুলিশের চাপ পড়ে অমৃতলালের দলের উপর। লোকটা পালাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে দলেই ভর্তি হয়ে গেল। শুধু অস্ত্রই বিক্রি করল না, দলে ভর্তিও হলো আর দলের লোকদের অস্ত্র চালানো শিক্ষা দিতে লাগল। অনেক উদাহরণ আছে এরকম। ডাকাতদের কাছে অস্ত্রই সবকিছু। ডাকাতি করে যা অর্থ যোগাড় হয় তার বেশির ভাগই খরচ হয় অস্ত্র কিনতে। তারা তো শহরে এসে হৈ হল্লা করে ডাকাতির অর্থ খরচ করতে পারে না।

লাখনসিং-এর কথাই বলি। যে রাইফেলের দাম খুব বেশী করে হয়তো ৭০০৲।৮০০৲ টাকা, লাখনসিং তার দাম দেয় কম করে ২০০০৲ টাকা। একবার একটা টেলিস্কোপিক রাইফেলের জন্যে লাখন দিয়েছিল ৭০০০৲ টাকা। এই তো সেদিনই গোয়ালিয়রে এক সম্ভ্রান্ত জমিদারকে পুলিশ ধরল ডাকাতদের কাছে অস্ত্র চালানীর অপরাধে। কাছেই এক কুয়ো থেকে বেরোল অনেক বন্দুক, রাইফেল।

শুধু অস্ত্রই না। সবচেয়ে দামী জিনিস হলো কার্তুজ। ভাবতেও অবাক লাগে যে, প্রায় প্রত্যেক ডাকাতই অস্ত্র-চালনায় নিপুণ। তাদের কাছে কার্তুজের দাম অনেক তাই তারা বুঝে সুঝে গুলী চালায়। যেখানে পুলিশ রাউণ্ডের পর রাউণ্ড ফায়ার করে ডাকাতরা হয়তো করে তার এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু যখন তারা ফায়ার করে তাদের নিশানা হয়েছে অব্যর্থ। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। লাখনসিং-এর কাছে কেউ যদি রাইফেলের গুলী বিক্রি করতে যায় লাখন হাতের উপর গুলীটা রেখে জিজ্ঞাসা

করে, "কিত্না ওজন ইস্কা। দলের আরেকটা লোক পরীক্ষা করে বলবে "দো তোলা"। হু'তোলা। "আচ্ছী বাত্ হ্যায় দো তোলা সোনেকা দাম দে দেও।" হু'তোলা সোনার দাম দিয়ে সে কিনবে একটা গুলী, তার কাছে পয়সার কোনো দাম নেই কিন্তু একটি রাইফেলের গুলী অমূল্য বস্তু।

একটা জিনিস এখনও বুঝতে পারি না, কেন বেশির ভাগ বড় বড় ডাকাতরা ডায়েরী রাখে। কোনো বড় ডাকাত মারা পড়লে পুলিশ প্রথমেই খোঁজে তার ডায়েরী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পায়ও আর সে ডায়েরী থেকে জানতে পারে অনেক কিছু মূল্যবান তথ্য। যখন পুতলীবাঈ মারা যায় তার ডায়েরী থেকে যা সব গোপনীয় খবর পুলিশ জেনেছে তা তারা নিজেরা শত চেষ্টা করলেও জানতে পারত না। কিছু ওষুধের দোকানের নাম, কয়েকটা ক্যাশ মেমো, একজন ডাক্তার আর হু'-একটা জহুরীর ঠিকানাও পাওয়া যায় পুতলীর ডায়েরীর ভিতরে।

ফার্স্ট এইড বক্স, মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেটস, পাঁউরুটি, ব্রাণ্ডি, টিনড্ ফুড, অ্যান্টি টিটেনাস ইঞ্জেকশন, পেনিসিলিন—বেশির ভাগ বড় ডাকাতদের হ্যাভারস্যাকেই পাওয়া যাবে। তুলসীর মালা, গীতা, রামায়ণ, ভগবানের মূর্তিও থাকে অনেকের সঙ্গে। রূপার পকেটে পাওয়া গিয়েছিল ছোট একটা ভগবানের মূর্তি। পিতলের মূর্তিটা নাড়া দিলেই ঘুরত আর দুলত। একবার ঘুরিয়ে দিয়ে যেদিকে মুখ করে মূর্তিটা নিশ্চল হয়ে যেতো রূপার বিশ্বাস ছিল সেদিকই নিরাপদ।

ডাকাতি সমস্যার আরেকটা দিক আছে যেটা শুনতে বা লিখতে খুব ভালো লাগে না। সেটা হলো এই সমস্যার সঙ্গে রাজনৈতিক দলাদলি। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই অন্য বিপক্ষ দলকে ডাকাতদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক নিয়ে অভিযুক্ত করে। শুধু তাই না, মধ্যপ্রদেশের বিধান সভায় তো প্রকাশ্যভাবে কয়েকজন বড় বড় নেতাকে ডাকাতদের বন্ধু বলে অভিহিত করা হয়েছে। সত্যি মিথ্যা বলা কঠিন কিন্তু কিছু কিছু ডাকাতদের ইলেকশনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রমাণ আছে।

যদি কোনো প্রার্থী ডাকাতদের বিরাগভাজন হয় তার পক্ষে ইলেকশন জেতা একটু মুশকিলের ব্যাপার হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। মুখরোচক হলেও খুব রুচিসঙ্গত হয়তো হবে না। আবার প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়, পুলিশের কিছু লোক ডাকাতদের সঙ্গে জড়িত। এরও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। কিছুদিন আগে শিবপুরী জেলার পুলিশের এক বড়কর্তার লেখা একটা চিঠি ধরা পড়ে। চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন এক সাব-ইন্সপেক্টরকে অনুরোধ করে, তিনি যেন পুতইসিংকে জামিনে খালাস করে দেন কারণ সে তাঁর আত্মীয়। চিঠিটা এরকম ঃ

শ্রী

শিবপুরী

Private and confidential

২০।৭।৫৭

শ্রীরামশরণসিংজী

নমস্তে,

আপকে পাস ইহ্ পত্র লেকর শ্রীকোকসিং সাঃ পুত্র সুলতানসিং আরহে হঁয়। আপকে ইহাঁ কি ডকৈতীকে মামলে মে আপনে পুতিইসিং পুত্র নারায়ণসিং কা গ্রিফতার কর রখা হ্যায়, ইয়ে আপনে রিস্তেদার হঁয়। আপ ইস বারে মে······কোকসিংজী সে বাতচীত করকে মালুমাত্ করকে বহ জ্যায়সা বাতাবে কারবাই করনেকা কষ্ট করে। বৈসে তো ম্যায় স্বয়ং ভিণ্ড তক্ ইস বারেমে আতা ব আপসে কহতা মগর operation মে busy হোনে কে কারণ নহী আসকতা হু ইসলিয়ে পত্র ভেজ রহা হু, আপ ইস লড়কে কি জৈসে ভী হো সকে জমানত করাদে। ইহ্ আপনা নিজী কাম সমঝানা।

আপকা শুভচিন্তক
Balbir Singh
20/7/57

বাংলায় এর অর্থ অনেকটা এরকম দাঁড়ায় :—

"আপনার কাছে এ চিঠি নিয়ে শ্রীকোকসিং যাচ্ছেন। আপনার ওখানে ডাকাতি মামলায় আপনি যে পুতইসিংকে গ্রেফতার করেছেন, সে আমার আত্মীয়। এ সম্বন্ধে আপনি

কোকসিং-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব জেনে, তিনি যেমন বলেন সেরকম করবেন। আমি নিজেই ভিণ্ড এসে আপনাকে বলতাম কিন্তু operation-এ busy থাকার দরুন আসতে পারলাম না তাই চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি যেরকমভাবে হয় ছেলেটির জামিন করিয়ে দেবেন। এটা আপনার নিজের কাজ ভাববেন।

মধ্যভারত গভর্নমেণ্টের "ক্রাইম সিচুয়েশন এনকোয়ারী কমিটি"র report-এ (Bhind and Morena Crime Situation Enquiry Committee) ডাকাতি সমস্যা শেষ করা সম্বন্ধে কিছু "রিকমেণ্ডেশন" ছিল। কমিটির মেম্বার শ্রীরাধাচরণ শর্মা কিছু ব্যক্তিগত রিকমেণ্ডেশন আলাদাভাবে করেন। তিনি লিখেছিলেন :—

(1) Police officers and constables who appear to be kith and kin or sympathiser of dacoits should be removed from Bhind-Morena districts as soon as possible......Government should make it a point to send only honest, diligent and intelligent police officers in the Bhind Morena districts.

(2) The general feeling among the public is that the police force is inferior to dacoits in discipline unity and co-operation among themselves. This inferiority should be done away with.

কমিটির কয়েকটি সুপারিশ ছিল :—

(1) Genuine complaints against erring police officials should be speedily and effectively enquired into.

(2) Capable and unimpeachable judicial magistrate be posted to these districts to investigate the cause of failure of each criminal case that fails and to remedy the defects discovered.

(3) The executive should be armed with sufficient powers for preventive detention and externment of ostensibly respectable harbourers of offenders.

(4) The sources of supply of arms and ammunition to the criminals should be unravelled.

(5) Licenses for breech-loading weapons should be progressingly reduced.

অবস্থা এখন অনেক ভালো তবুও ডাকাতি সমস্যার অন্ত হয়নি। কোনোদিন হবে কিনা কে জানে? কি করে শেষ করা যায় অভিশপ্ত চম্বলের এই অভিশাপ! কেউ বলেন, কনস্টিটিউশন সাসপেণ্ড করা হোক আর "প্রেসিডেন্টের রুল" জারী করা হোক। আবার কারোর মত মিলিটারীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। আবার অনেকের মত জেনারেল অ্যামনেস্টি ঘোষণা করা হোক। নানা মুনীর নানা মত। এর কোনোটাতেই কাজ হবে কিনা বলা কঠিন কিন্তু বর্তমান আইনকানুন দিয়ে এই সমস্যার সমাধান কঠিন ব্যাপার। ডাকাত ধরা পড়ে। তাকে কোর্টে দাঁড় করানো হয়, দশ বছরের পুরোনো কোনো হত্যার অপরাধে। কোথায় প্রমাণ? কে সাহস করে সাক্ষী দেবে। ক'টা সাক্ষীই বা বেঁচে আছে। প্রায়ই খালাস পেয়ে যায় কোর্ট থেকে। গোয়ালিয়রের মাধোরাও সিন্ধিয়া নাকি একবার ডাকাতদের উৎপাতে বিব্রত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে এক গ্রামে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, যদি এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের লোকেরা লুকিয়ে রাখা ডাকাতকে তার সামনে হাজির না করে তিনি পুরো গাঁ জ্বালিয়ে দেবেন। একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর তিনি সারা গাঁয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পর পর অনেক গাঁয়েই তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেন। ফল হয়, কিছুদিনের মধ্যে ডাকাতি একেবারে বন্ধ। কিন্তু আজকের প্রজাতন্ত্রের যুগে তো আর এইসব করা যায় না। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশের লোকেরা ডাকাত ধরতে আগ্রহ দেখায় কম। কে ঝঞ্ঝাটে পড়বে সাক্ষ্য আর সাক্ষী যোগাড় করতে। তার চেয়ে ভালো "এনকাউণ্টার", মেরে শেষ করো। কিছুদিন আগেই তো খুব হৈ চৈ হলো মধ্যপ্রদেশে যখন কেউ কেউ অভিযোগ করলেন কিছু ডাকাতকে ধরার পর (অনেকে বলেন তারা আত্মসমর্পণ করেছিল) পুলিশ তাদের গুলী করে মেরে বলেছে তারা এনকাউণ্টারে মারা গিয়েছে।

অবশ্য কিছু কিছু ডাকাত ধরা পড়ার পর কোর্টেও শাস্তি পেয়েছে। তার প্রথম কারণ, পুলিশের অভিযানে গ্রামবাসীদের কিছু কিছু আস্থা আর বিশ্বাস ফিরে আসছে, আর তারা এগিয়ে আসছে সাক্ষী দিতে। এর সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া গেল সেদিন যখন লাখনসিং-এর আত্মীয় দুর্ধর্ষ ডাকাত অভিলাখসিং-এর ৭২ বছরের কারাবাস হলো। অভিলাখ ধরা পড়ার পর লাখন সাক্ষীদের ভয় দেখাবার জন্যে করল অনেক নিষ্ঠুর হত্যালীলা। কিন্তু তবুও কিছু সাক্ষী সাহস করে এগিয়ে এল কোর্টে। এদের মধ্যে ছিল একটি নির্ভীক গাঁয়ের মেয়ে।

নতুন এক হুজুগ শুরু হয়েছে। ডাকাত-হৃদয় পরিবর্তন করতে হবে। ডাকাতদের বলা হচ্ছে তারা আত্মসমর্পণ করুক। গভর্নমেণ্টকে এদের প্রতি একটু সহানুভূতি দেখাতে বলা হচ্ছে। অনেক বড় বড় কর্তা এই নতুন অভিযানে নেমেছেন—ডাঃ সুশীলা নায়ার, রাষ্ট্রপতির ভূতপূর্ব সৈনিক সচিব মেঃ জেনারেল যদুনাথ সিং, আরো অনেকে। আবার আচার্য বিনোবা ভাবেও এসেছিলেন এই হৃদয়-পরিবর্তন অভিযানে চম্বলের উপত্যকায়। হৃদয়হীন ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তন? ডাকাতরাও সবই জানে, সবই বোঝে। আগ্রার এক খবরের কাগজে হঠাৎ একদিন ডাকাত রূপার খোলা চিঠি প্রকাশিত হলো পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আবার এক ডাকাত খোলা চিঠি লিখলে বিনোবা ভাবের নামে।

ইন্দিরা গান্ধী তখন কংগ্রেসের সভাপতি। এলেন ট্যুর করতে মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড-মোরেনা এলাকায়। যখন কংগ্রেসের কর্তারা তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে ১৫০০০৲ টাকার থলি যোগাড়ে ব্যস্ত, খবর পাওয়া গেল কয়েক গাঁয়ের লোকেরা মিলে লাখন সিংকে চাঁদা তুলে দিয়েছে ৩৫০০০৲ টাকা। আবার বৃদ্ধা রুক্মিণী দরখাস্ত নিয়ে দাঁড়াল ইন্দিরা গান্ধীর সামনে! সেই এক প্রশ্ন, "ইন বাচ্চোঁকা ক্যায়া কসুর"। দস্যুরাণী পুতলীর মা বৃদ্ধা আসগরীবাঈও দরখাস্ত নিয়ে পৌঁছল তাঁর কাছে। সঙ্গে পুতলীর মেয়ে তান্নো। তার মুখেও সেই একই কথা,

"ইস বাচ্চীকা ক্যায়া কসুর?" জবাব তারা পায়নি। কে জবার দেবে? এর জবাব তো নেই। রুক্মিণী আমাকেও এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি উত্তর দিতে পারিনি। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিলাম উদিতপুরা গাঁ থেকে।

সাত

"সামথিং হট্ কুকিং হিয়ার" সেদিন ভোরবেলা ফোন এসেছিল ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ রুস্তমজীর কাছ থেকে। "রান ডাউন টু দি হেডকোয়ার্টার্স"। পড়ি কি মরি করে দৌড়েছিলাম পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। জানতাম কোনো বড় ডাকাত হয়তো মারা গিয়েছে। কিন্তু কে? রুস্তমজীর কামরায় ঢুকতেই মৃদু হেসে আমার দিকে চাইলেন। "ফর ওয়ান্স ইউ আর রং মাই ডিয়ার", বলে ওয়্যারলেস মেসেজের এক টুকরো কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ছোটো মেসেজ এসেছে মধ্যপ্রদেশের স্পেশ্যাল আর্মড পুলিশের ফোর্থ ব্যাটালিয়নের কমাণ্ড্যাণ্ট মিঃ কুইন-এর কাছ থেকে।

> "On behalf of the men and officer of the 4th Battalion please accept my hearty congratulations on the liquidation of Roopa, leader of "G" I, nineteen hours twentysixth".

রূপা শেষ! মানসিং-এর অভিন্নহৃদয় বন্ধু পণ্ডিত ছাবরামের ছেলে রূপা। "দাউ"-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে "খুনকা বদলা খুন" বলে কাঁদতে কাঁদতে কাকরান-কা-পুরা গিরিপথের মুখে মানসিং আর সুবেদার সিং-এর রক্তাক্ত দেহ ফেলে রেখে চম্বলের অন্ধকার গিরিবর্ত্মে মিশে গিয়েছিল।

"ওয়েল, ওয়েল, ফর ওয়ান্স ইউ আর রং মাই ডিয়ার" আবার খোঁচা দিলেন রুস্তমজী। আমি তখনও ভাবছিলাম রূপার কথা। হঠাৎ মনে পড়ল একদিন জোরগলায় তর্ক করেছিলাম ইন্সপেক্টর জেনারেলের সঙ্গে। টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে বলেছিলাম রূপাকে এত সহজে পাবেন না আপনারা। "ইউ কাণ্ট গেট ছাট রূপা

ইজিলি মিঃ রুস্তমজী"। রুস্তমজী সাহেব তখন বেশি প্রতিবাদ করেননি আমার কথার। আমার মতো তিনিও জানতেন মানসিং-এর দক্ষিণ হস্ত, রূপাকে পাওয়া তত সোজা নয়। "জি" ওয়ান—গ্যাং নাম্বার ওয়ানের নেতা রূপা। মানসিং-এর মৃত্যুর পর বিনাবাধায় চালিয়ে গিয়েছে তার হত্যালীলা। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করেছে, লাখ লাখ টাকা লুট করেছে, কিন্তু পুলিশ তাকে নাগালের মধ্যে পায়নি কখনও। তার এইরকম অপ্রত্যাশিত মৃত্যু আমার চেয়ে মধ্যপ্রদেশের পুলিশকেই বেশি অবাক করেছে। "ইয়েস ফর ওয়ান্স আই অ্যাম রং", বলে সেদিন রুস্তমজী সাহেবের কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

কাউণ্ট অব মন্টিক্রিস্টো নিজের কাছে রাখতো লম্বা এক নামের তালিকা। এক একজন শত্রু নিপাত হতো আর কাউণ্ট তাঁর তালিকা থেকে সেই নামটা কেটে দিতেন। ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ রুস্তমজীর টেবিলে কাঁচের নিচে ছিল একটা লিস্ট। তাতে ছিল ১৬টা নাম। অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ, ১৬টা দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের নেতার নাম। লাল পেন্সিলের মোটা মোটা দাগ দিয়ে এক একটা নাম কেটেছেন রুস্তমজী সাহেব আর লিস্টটাকে আবার সযত্নে ঢুকিয়ে রেখেছেন কাঁচের তলায়। মৃদু হেসে লিস্টটাকে কাঁচের নিচে থেকে বের করে তিনি লাল পেন্সিলটা নিয়ে নির্মমভাবে "রূপা" নামটা কেটে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"সো রূপা অলসো গোজ"। কিন্তু হঠাৎ বাকী আরো তিন চারটে নামের দিকে তাঁর নজর গেল। "উই উইল গেট দেম টু", বলে মন্টিক্রিস্টোর লিস্টটা সরিয়ে রাখলেন। হজুরীসিং, পুতলী, ব্যারেলাল, লালসিং, শ্রীপালা, অমৃতলাল, গবরসিং, কল্লা, শঙ্করসিং সব নামগুলো কাটা হয়ে গিয়েছে—এবার কাটা হলো রূপার নাম।

ধীরে ধীরে আই-জি'র কামরা থেকে সেদিন বেরিয়ে এসে সোজা দৌড়েছিলাম টেলিগ্রাফ আপিসে। সেদিন সকালে আমার কাগজে যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলাম, তা আজও আমার ফাইলে রাখা আছে।

"Roopa repeat Roopa Comma tallest among

Chambal Valley dacoits is dead etwith his death comes adan end legend of Mansingh stop he was shot……"

পণ্ডিত ছাবরাম জেলে মৃত্যুশয্যায় মানসিং-এর হাত দুটো চেপে ধরেছিল। "মেরা বাচ্চা রূপাকো দেখনা। সমঝনা রূপা তেরা ছটা বেটা হ্যায়।"

"জরুর দোস্ত"। মানসিং প্রতিজ্ঞা করেছিল।

"খাও কসম্"।

"কসম্"।

"যশবন্ত কা কসম্"।

"যশবন্ত কা কসম্"। মানসিং নিজের মৃত ছেলের নামে "কসম্" খেয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল।

মৃত্যুর সময়ও মানসিং অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজেছে রূপাকে। "কসম্" খেয়েছিল বন্ধুর কাছে। রূপাকে দেখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু "কসম্" সে রাখতে পারেনি।

কসম্ খেয়েছিল রূপা। প্রতিশোধ নেবার "কসম্"। গুরুর পায়ে প্রণাম করে "খুন কা বদলা খুন" বলে অন্ধকারে চম্বলের গিরিবর্ত্মে মিশে গিয়েছিল। মানসিং-এর "লিজেণ্ড" সে শেষ হতে দেয়নি। "দাউ"-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নিয়েছে ভয়ঙ্কর আর নির্মমভাবে। "দাউ"-এর বড় ভাই বৃদ্ধ, পঙ্গু, রুগ্ন, নবাবসিংকে কাঁধের ওপর চড়িয়ে দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঘুরেছে। "দাউ"-এর কাছে সে যে বড় ঋণী। কতই বা বয়স ছিল তার, যখন বাপ ছাবরাম কারাপ্রাচীরের অন্তরালে মানসিং-এর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল। তখনও স্কুলে পড়ে রূপা। পণ্ডিত রূপনারায়ণ শর্মা। ফর্সা ধবধবে রং, চোখটা কটা—সুন্দর চেহারা। কতই বয়েস ছিল তখন—দশ কি বারো। সে অনেক দিনের কথা।

সে কথা রূপা কোনদিনই ভুলতে পারেনি। হয়তো ছোট্টো সেই ঘটনাটা না হলে পণ্ডিত ছাবরামের ছেলে, পণ্ডিত রূপনারায়ণ শর্মাই থেকে যেত। চম্বল গিরিবর্ত্মের দুর্ধর্ষ দস্যু-সর্দার "রূপা মহারাজ" আর হতো না। রূপা তখনও গাঁয়ের আর

সবাইকার মতো স্কুলে যায়। বাপের বন্ধু মানসিংকে সে জানে। জেলে তো প্রায়ই মানসিং-এর ফেরারী ছেলেদের খবর মানসিংকে পৌঁছে দিয়েছে, কিন্তু কি বা বুঝতো সে। কিন্তু সেদিন সকালে যা ঘটলো রূপার জীবনে তা কালো একটা দাগ দিয়ে গেল। সবে বাপ মরেছে জেলে। বাড়িতে কান্নার রোল তখনও থামেনি, হঠাৎ পুলিশের কয়েকজন লোক এসে তার কাকা পণ্ডিত মুরারীরামকে বাড়ি থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা রূপার একমাত্র সহায় তার কাকার মৃতদেহ পাওয়া গেল গিরিবর্ত্মের কাছে।

ছুটে গেল রূপা থানায়। দারোগা সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফেরত চাইল তার কাকার মৃতদেহ আর চাইল শাস্তি তাদের যারা তার কাকাকে এই রকম নির্মমভাবে বিনা কারণে হত্যা করল। কিন্তু দারোগা সাহেবের কাছ থেকে রূপা শুধু উত্তরে পেল এক জোড়া ভারী বুটের লাথি। ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপর। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে যেতে যেতে থানার দিকে বার বার ফিরে দেখে আর বিড় বিড় করে, "আচ্ছা দেখ্ লেঙ্গে"।

পরের দিন থেকে রূপা আর স্কুলে গেল না। স্কুলের খাতা থেকে তার নাম কেটে দেওয়া হলো, কিন্তু মানসিং-এর ডায়েরীতে তার নাম উঠল। সেখান থেকে নাম উঠেছিল ইন্সপেক্টর জেনারেল রুস্তমজীর "মন্টিক্রিস্টো" লিস্টে।

রূপা শুধু নিজেই গেল না, সঙ্গে নিয়ে গেল বড় ভাই কানহইকে। আর দু'ভাই, লক্ষ্মীনারায়ণ আর হুল্লা তার ডাককে উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল ভাগ্য-অন্বেষণে। ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্মীনারায়ণ পৌঁছল সুদূর আমেদাবাদে। কাপড়ের মিলে কাজ করেছে বছরের পর বছর, আর লোকের মুখে আর খবরের কাগজে পড়েছে তার ভাই-এর কথা। মাঝে মাঝে ভেবেছে সে দিনের পর দিন খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কতই বা উপার্জন করছে আর তারই ভাই আজ হয়েছে রূপা মহারাজ, লাখ লাখ টাকার মালিক। কিন্তু রূপার ভাই, "ডাকু"র ভাই বলে তাকে শুনতে হয়েছে অনেক গঞ্জনা আর খেতে হয়েছে পুলিশের গালাগালি। সেদিন সকালে মিলে কাজ করছিল লক্ষ্মীনারায়ণ। কে যেন খবর দিয়ে গেল রূপা

পুলিশের গুলীতে মারা গিয়েছে। মেশিনের ঘড়ঘড়ানির মধ্যেও কানে কথাটা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিল—"রূপা ডাকু মারা গয়া"। ময়লা জুটওয়েস্ট দিয়ে কপালের হঠাৎ-দেখা ঘাম মুছতে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ বোধহয় কয়েক ফোটা চোখের জলও মুছে ফেলেছিল। ছুটি নিয়ে ছুটে চলে এসেছিল মোরেনা শহরে। রূপার শেষ সময়ে তাকে একবার দেখবার জন্যে। পুলিশের পাহারায় যখন রূপার মৃতদেহে আগুন লাগানো হচ্ছে—তখন আর লক্ষ্মীনারায়ণ ঠিক থাকতে পারেনি। সুপার সাহেবকে অনুরোধ জানিয়েছিল, শুধু এক মিনিটের জন্যে মুখের কাপড়টা সরাতে। তার সে অনুরোধ সুপার সাহেব রেখেছিলেন। রূপার মৃতদেহ থেকে কাপড়টা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ঐ তো রূপা। ধবধবে ফর্সা রং, কটা চোখ, কোঁকড়ানো মাথার চুল, কড়ে আঙুলবিহীন বাঁ পা'টা। ঠিক সেই রকমই আছে। তফাৎ শুধু এক জোড়া গোঁফ। মানসিং-এর চেলা রূপা। নিজের গুরুর অনুকরণে রেখেছে বিরাট এক জোড়া গোঁফ। লক্ষ্মীনারায়ণ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল সেদিন। কতদিন পরে দেখা রূপার সঙ্গে, কিন্তু কই রূপা কথাটি কইল না তো! লক্ষ্মীনারায়ণের মনে পড়ে বহুদিন আগের কথা, যখন কাকা পণ্ডিত মুরারীরামের মৃতদেহ চাইতে গিয়ে দারোগা সাহেবের বুটের লাথি খেয়ে রূপা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল। ভাইকে বলেছিল "চল্ মেরে সাথ্"।

"কাঁহা"।

"বেহড় মে, "দাউ"কে পাস"।

"কুঁ্য ?"

"খুন কা বদলা খুন"।

সেদিন যায়নি লক্ষ্মীনারায়ণ। রূপাকে বলেছিল সে ভুল পথে যাচ্ছে। রূপা শোনেনি সে কথা। তার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিল আর ফেরেনি। ফিরল সেদিন, অনেক বছর পরে। দেখা হলো লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তার পরই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতার আগুন।

অভিশপ্ত চম্বলের "বেহড়"গুলো তখন আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মীনারায়ণের মনে হলো হাজার হাজার অশরীরী

আত্মা বুঝি-বা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রাগে, দুঃখে, ধীর, শান্ত লক্ষ্মীনারায়ণ "বেহড়"-এর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে অভিশাপ দিয়েছিল অভিশপ্ত চম্বলের "বেহড়"কে—"শালী, সর্বনাশ হো তেরা"।

লক্ষ্মীনারায়ণ আর আমেদাবাদে ফিরে যায়নি। কারা যেন খবর রটিয়ে দিল, এবার লক্ষ্মীনারায়ণ নিজে রূপার দলের নেতা হবে। ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল লক্ষ্মীনারায়ণ। ছুটে গেল রুস্তমজী সাহেবের কাছে। তার নামে যদি এই কলঙ্ক রটে তাহলে পুলিশের লোকেরা তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। হয়তো তাকেও একদিন চম্বলের "বেহড়ে"র হাতছানি ডেকে নিয়ে যাবে। রূপার ভাই হলেও সে বেঁচে থাকতে চায় সুখে শান্তিতে শুধু লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা নামেই। আর সব পরিচয় সে ভুলে যেতে চায়। অভয় দিলেন রুস্তমজী সাহেব আর প্রতিশ্রুতি দিলেন সাহায্যের। ছোট একটা দোকান খুলে লক্ষ্মীনারায়ণ আজ গোয়ালিয়র শহরে আছে।

আর দুল্লা। ভাগ্যের অন্বেষণে সে-ও গিয়েছিল অনেক দূরে। নৌকা চালাবার কনট্র্যাক্ট নিয়েছিল রাজস্থানে। শিক্ষিত যুবক দুল্লা। কখনও যদিবা শুনেছে রূপা কাছে কিনারায় কোথাও আছে, সে দেখেও দেখেনি। কে জানে হয়তো দেখা করেওছে। জিজ্ঞাসা করলে শুধু হাসে। আর কানহই! সেও দলে ছিল। দিন গুনেছে আর পালিয়েছে এখানে সেখানে। সঙ্গে ছিল—লুক্কা, লায়েক সিং, মেওয়ারাম, রামনাথ আর দু-একজন। লুক্কা হয়েছিল রূপা-দলের নেতা। আগে নাম ছিল লুকমন শর্মা এখন নাম হয়েছে লুক্কা। রূপার মতো সেও ব্রাহ্মণের ছেলে কিন্তু রূপার চেয়েও নির্মম আর নিষ্ঠুর। মোটে আঠারো বছর বয়সে যোগ দিয়েছিল মানসিং-এর দলে। অনেক ডাকাতি, অনেক হত্যা করেছে লুক্কা। দলের লোক ডাকে "লুক্কা পূজারী" বলে। সকাল বিকেল পুজো-আর্চা আর জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে লুক্কা। আধুনিক চিকিৎসা আর আয়ুর্বেদেও লুক্কার জ্ঞান প্রচুর। দলের ডাক্তার সে। ইনজেকসন আর ছোটোখাটো অপারেশন নিজের হাতেই করেছে। আহত দলের লোকের শরীর থেকে গুলী বের করতে সে সিদ্ধহস্ত। আর তা ছাড়া অস্ত্র চালনায় সে রূপার চেয়ে কোনো অংশেই কম

না। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো শুধু লাখনসিং। মেশিনগান টমীগান, রাইফেল, হ্যাণ্ডগ্রেনেড সব তার কাছে ছেলে-খেলা। তার প্রবল-প্রতাপ অন্য ডাকাতদলকে করেছে ভীত। এমনকি লাখনসিংও লুক্কাকে সমাদর করেছে। রূপার মৃত্যুর পর লুক্কা আবার তৈরি করেছে তার দল তাদের নিয়ে যাদের নেতারা পুলিশের হাতে মারা গিয়েছে।

রূপার দলে ছিল নবাবসিং। মানসিং-এর বড় ভাই নবাবসিং গুরুর মৃত্যুর পর তাকে সসম্মানে গদীতে বসিয়েছে রূপা। তারপরে ধীরে ধীরে নবাবসিং হয়েছে বৃদ্ধ, রুগ্ন, আর পঙ্গু। আশি বছরের নবাবসিংকে রূপা নিজের কাঁধে করে মাইলের পর মাইল চলেছে। দলের লোকেরা আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু রূপা তার গুরুর ভাইকে ফেলতে পারেনি। কিন্তু নবাবসিং বুঝেছিল তাকে নিয়ে দলে শুরু হয়েছে ঝগড়া। ঘাটের মড়া আর বয়ে নিয়ে যেতে কেউ রাজী না। একদিন রাত্রে নবাবসিং দল ছেড়ে চলে গেল। অনেক খুঁজল রূপা, কিন্তু তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না। হঠাৎ একদিন রাজস্থান পুলিশের হাতে ধোলপুরের কাছে ধরা পড়ল ৮০ বছর বৃদ্ধ নবাবসিং। জঙ্গলে এক মন্দিরের কাছে—গেরুয়া কাপড় পরে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। নিয়ে যাওয়া হলো আগ্রা জেলে। কিছুদিন চুপচাপ। কিন্তু সেদিন উত্তর-প্রদেশের বড় বড় কর্তাদের আবার টনক নড়ল যখন খবর পাওয়া গেল নবাবসিং আগ্রা জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছে। সব ব্যবস্থা তৈরি। জেলের থেকেই কিছু দূরেই দাঁড়িয়েছিল গাড়ি, নবাবসিং রামদত্ত আর পুরণসিংকে নিয়ে পালাবার জন্যে। শেষ সময়ে কি একটা গোলমালে সব প্ল্যান গেল ভেস্তে।*

রূপার কথা বলতে গিয়েই এতো কথা সব এসে পড়ল। মানসিংকে লোকে ডাকতো "রাজা" মানসিং আর "দাউ" বলে কিন্তু রূপার নাম হয়েছিল "রূপা মহারাজ।" রূপা মহারাজের মাঝে মাঝে দরবার বসত। ঘন জঙ্গলে মধ্যে গাছের নিচে অন্ধকারে বসত দরবার। গাঁয়ের লোকেরা নিয়ে আসতো নজরানা। সারি দিয়ে দাঁড়াত গাঁয়ের লোকেরা নিজের নিজের নজরানা নিয়ে।

*আগ্রায় নবাব সিং-এর বিরুদ্ধে এখন কেস চলছে।

এক একজন করে এগিয়ে এসে প্রণাম করে পায়ের কাছে রেখে দিত যার যা দেবার—টাকা, চাল, গম, বন্দুকের গুলী, জামা-কাপড়। সব জামা-কাপড় রূপার দরকার ছিল না তাই সে শুধু খাকীয় প্যান্ট আর শার্টই দাবি করতো বেশি। দলের সবাইকে পরাতো মিলিটারীর খাকী ইউনিফর্ম। নিজেও পরতো দামী গ্যাবারডীনের উইনিফর্ম। কিন্তু দরবারে মহারাজ শুধু নজরানাই নিত না, নিষ্পত্তি করতো ঝগড়া বিবাদেরও। "ল অব দি জঙ্গল" বললে কি হবে, রূপা মহারাজের ন্যায় ছিল সর্বমান্য। তার বিচারে মৃত্যুদণ্ডের না ছিল কোনো আপীল না কোনো প্রতিবাদ। দু'জন লোক নিয়ে যেত অভিযুক্তকে "বেহড়ে"র পেছনে? খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর একটা চিৎকার আর গুলীর আওয়াজ।

মানসিং যখন কাকরান-কা-পুরার দিকে চলেছিল জ্যোতিষ গণনা করে রূপা তাকে মানা করেছিল সেদিকে যেতে। তার কথা শোনেনি "দাউ'। কিন্তু নিজের ভাগ্য গণনা করতে পারেনি রূপা সেদিন যখন ২৬শে অক্টোবর ১৯৫৯ সন্ধ্যেবেলায় মহুয়া গাঁয়ের কাছেই "বেহড়ে" শুধুমাত্র একটা গুলীতে দস্যু জীবনের অন্ত হয়। সাত হাজার টাকা দিয়ে কেনা টেলিস্কোপিক রাইফেল একবার তুলবারও সময় পায়নি।

দলের আরেকজন নাকি অন্য কথা বলেছিল। রূপা মহারাজ ধরেছিল মদ, আর মেয়েমানুষের নেশা তাকে পাগল করেছিল। তাই জ্যোতিষ গণনার শক্তি সে হারিয়েছিল।

আট

আগ্রা জেলার "বাহ" তহসীলের ছোটো একটা গাঁ—মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানের কোল ঘেঁষা। ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মাঝরাতে সেই গাঁয়েরই এক বাড়িতে কয়েকটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হলো। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়ির চারজন ঘুমন্ত লোককে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বিছানা থেকে টেনে বার করল তারা। খানিকক্ষণ পরেই চম্বলের গিরিবর্ত্মের বুক থেকে

ভেসে এল চারটে গুলীর আওয়াজ আর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। একদিন আগে ৩০শে ডিসেম্বর মাঝরাতে ঠিক এমনিভাবে মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলার আরেকটা গাঁয়ে চারজন ঘুমন্ত লোককে বিছানা থেকে উঠিয়ে "বেহড়"-এর পেছনে নিয়ে গিয়েছিল কয়েকটা ছায়ামূর্তি। সেবারেও শোনা গিয়েছিল অন্ধকারের বুক চিরে গুলীর আওয়াজ আর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

"রূপা মহারাজ", নতুন বছর ১৯৫৯ সালকে সম্বর্ধনা জানাল এইভাবে আটজন নিরীহ লোককে হত্যা করে। কোন অপরাধ করেনি তারা। কোন বিদ্বেষ ছিল না রূপার তাদের বিরুদ্ধে। তবে কেন এই হত্যালীলা? গভর্নমেণ্টকে চ্যালেঞ্জ! কিছুদিন আগেই নাকি পুলিশের বড়কর্তাদের মিটিং-এ কথা হয়েছিল রূপাকে নতুন বছরের আগে শেষ করতে হবে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আটজন লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে রূপা তার শক্তির পরিচয় দিল।

মানসিং-এর তবু কিছু দয়া-মায়া ছিল, কিন্তু রূপা ছিল নিষ্ঠুর হৃদয়হীন। তার ছোটবেলার বন্ধুরা এখনও বলে যে, সে স্কুলে যাকে-তাকে হঠাৎ মেরে বসতো। ডাকাতি জীবনে প্রায় ২০০টা হত্যা করেও তার নিষ্ঠুরতা কমেনি, বেড়েই গিয়েছে। কিছুদিন হত্যা করতে না পারলে রূপার হাত নিশপিশ করত। জঙ্গলে তখন শেয়াল আর প্যান্থার মেরে বেড়াত।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হৃদয়হীন রূপাও একদিন ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গায় বিচলিত হয়ে পড়েছিল। "দাউ"-এর অনুমতি নিয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল কলকাতায়। মহানগরীর ভিড়ে রূপা মিশে গিয়েছিল। জব চার্নকের শহরে যখন দানবদের তাণ্ডবলীলা চলছিল "রূপা মহারাজ"ও চুপচাপ ছিল না। কিছুদিন পরে আবার ফিরে এসেছিল হাসতে হাসতে।

"দাউ" জিজ্ঞাসা করেছিল "ক্যায়া হুয়া বেটা?"

"কুছ নহী দাউ, সাত বদমাশ কো গোলী সে উড়া দিয়া"।

"আচ্ছা কিয়া" বলে মানসিং পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল।

লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেছে রূপা শুধু অপহরণ করে। ধনী ব্যবসায়ী আর জমিদারদের ছেলেদের অপহরণ করেছে আর

নিয়েছে র‍্যানসম। অনেক চেষ্টা করেছে পুলিশ, কিন্তু ধরতে পারেনি কোনবারই। যার ছেলে অপহরণ করেছে রূপা, সে নিজেই গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে লুকিয়ে, পাছে পুলিশ খবর পায়। তার দস্যু-জীবনে শুধু একজন হতভাগ্য বাপ সাহস করে পুলিশে খবর দিয়েছিল। কিন্তু রূপা সে খবর আগেই পেয়ে গিয়েছিল—তাই টাকা নিতে নির্দিষ্ট জায়গায় আসেনি। কিন্তু প্রতিশোধ নিয়েছিল সে ভয়ঙ্করভাবে। রাতের আঁধারে একদিন তাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল। বাপ-ছেলেকে দুটো আলাদা গাছে বেঁধে তিল তিল করে একজনের সামনে আরেকজনকে হত্যা করেছে। তারপর আর কোনদিন কেউ পুলিশে খবর দেয়নি। চুপচাপ টাকা দিয়ে এসেছে। যখন পুলিশ খবর পেয়ে গিয়েছে তদন্ত করতে অম্লান-বদনে বলেছে "কই না তো, আমার ছেলে তো চুরি যায়নি। সে তো, মামারবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল।" সন্তুষ্ট হয়ে হাবিলদারজী চলে গিয়ে থানার রোজনামচায় রিপোর্ট লিখেছে।

কিন্তু এত টাকা রূপা করেছে কি? মদ মেয়েমানুষ তো এই কিছুদিন আগে শুরু করেছিল। তার আগে? মানসিং-এর মতো দয়া-মায়া তো ছিল না তার। মানসিং বাপকে মেরে ছেলের হাতে টাকা তুলে দিয়ে বলেছে—"তোর বাপ আমার দুশমন ছিল, তাই তাকে মেরেছি। কিন্তু তুই তো কোন দোষ করিসনি, তাই তোর জন্যে দিয়ে গেলাম টাকা।" রূপা তো লোককে গুলী মেরে তারপর দা দিয়ে আঙুল কেটে আংটি পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেছি খোজ নিতে কোথায় খরচ হতো তার অর্থ। সব কিছু হয়তো ঠিক জানতে পারিনি কিন্তু যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় রূপার অর্থ খরচ হতো অস্ত্র কিনতে। নিজের দলের লোকদের জন্যে সে ছিল মুক্তহস্ত। দলের প্রায় ৩০ জন সদস্যের জন্যে দিনে তার খরচ ছিল প্রায় ১৫০। তার মধ্যে বেশির ভাগ খরচ হতো ঘি আর বাদামের জন্যে। হাজার হাজার টাকা খরচ করেছে সে রাইফেল আর কার্তুজের পেছনে। সব সময়ে তার দলের কাছে থাকতো পাঁচ হাজার রাউণ্ড অ্যামুনিসন। এই তো কিছুদিন আগেই নাকি রূপা এক লাখ টাকা খরচ করে শক্তিশালী কয়েকটা দূরবীন, হ্যাণ্ড গ্রিনেড, টেলিস্কোপিক রাইফেল, দুটো

টি. সি. এম. আর একটা ওয়্যারলেস সেট কেনে। এক লাখ টাকা সে খরচ করে শুধু মানসিং-এর ছেলে তহসীলদার সিংকে ফাঁসি কাঠ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

দুই বিশ্বস্ত চেলা মানসিং-এর, রূপা আর লাখন সিং। লাখন সিং বেশিদিন থাকেনি "দাউ"-এর সঙ্গে। ছেড়ে চলে গিয়েছিল অনেক আগেই নিজের দল তৈরি করার উদ্দেশ্যে। রূপা "দাউ"কে ছাড়েনি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল "দাউ"-এর কাছে। "দাউ"-এর মৃত্যুর পরে কিছুদিনের জন্যে গিয়েছিল বাবু গুজরের দলে, কিন্তু তারপরই মানসিং-এর দলকে আবার গড়ে তুলে তার নেতা হলো নিজেই। নেতা হতেই শুরু হলো তার আর লাখন সিং-এর মধ্যে বিবাদ। সাম্রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হলো দুই ডাকাতে। লুক্কাকে বলেছিল রূপা সে একদিন লাখনকে মেরে তারপর মরবে, তার আগে না। সে সাধ আর তার পূর্ণ হয়নি। কিন্তু বহুবার হয়েছে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ।

মোরেনা জেলার বরবই গাঁয়ে বিবাদ শুরু হয়েছিল "ঠাকুর" আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছুদিন আগে। গাঁয়ের ঠাকুররা গেল লাখনসিং-এর কাছে "ঠাকুর"দের ইজ্জত বাঁচাতে। লাখনসিং দলবল নিয়ে একদিন এল বরবই গাঁয়ে, ব্রাহ্মণদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে পেটালে তাদের রাইফেলের বাঁট দিয়ে। আর বলে গেল "ফের যদি ঠাকুরদের জ্বালাতন করো কাউকে আস্ত রাখব না। যদি হিম্মত থাকে তাহলে আসুক তোদের বাঁচাতে তোদের রূপা মহারাজ।"

রূপার কাছে খবর পৌঁছতে বেশি দেরী হলো না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার দলবল নিয়ে রূপা পৌঁছল বরবই-এ। লাখন সিং-এর দল তখনও গাঁয়ের সীমানা ছেড়ে যায়নি। তুমুল যুদ্ধ হলো দুই দলে। লাখন হেরে গেল আর পালাল। বিজয়গর্বে রূপা ঢুকলো গাঁয়ে, আর তারপর ঠাকুরদের ওপর যা অত্যাচার শুরু হলো তা অবর্ণনীয়।

যারা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে রূপা কখনও তাহাদের ক্ষমা করেনি। চেষ্টা করেছিল তারই দলের হরিয়া, কিন্তু তার শেষ পরিণাম দেখে দলের বাকী লোকেরা কেঁপে উঠেছিল। হরিয়া

একদিন দস্যুজীবন ত্যাগ করে ভিণ্ড পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল। পুলিশের জেরার জোরে দলের অনেক গুপ্ত কথা সে ফাঁস করে দেয়। পুলিশ জানতে পারল রূপার গতিবিধি, তার সাহায্যকারী কিছু লোকের নাম, আর তার দু-একটা গুপ্ত আস্তানার ঠিকানা। রূপা সব জানতে পারল। প্রতিহিংসার আগুনে সে জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল। হরিয়ার বাড়ি গিয়ে তার আত্মীয়দের বলল হরিয়ার খোঁজ দিতে। পুলিশের কড়া পাহারায় হরিয়া তখন ভিণ্ডে। শহর ছেড়ে তাকে যেতে বারবার মানা করে দিল পুলিশের লোকেরা। নিজের আত্মীয়দের বিশ্বাস করে হরিয়া একদিন শহর ছেড়ে গাঁয়ের পথে পা বাড়াল। কখনও ভাবতেও পারেনি তার নিজের আত্মীয়রাই তাকে রূপার হাতে সঁপে দেবে। নৃশংসতার চরম সীমায় পৌঁছে রূপা তাকে হত্যা করল।

রূপার হাতে হরিয়া জীবন দিল, কিন্তু রূপার ক্ষতি করে গেল অনেক। রূপা পালাতে শুরু করল। একবার যায় রাজস্থানে আবার পালায় উত্তরপ্রদেশে, সেখান থেকে মধ্যপ্রদেশে। খুন ডাকাতি করে কিন্তু সব সময়ই "অন দিন রান"। এদিকে ফোর্থ ব্যাটালিয়নের কমাণ্ড্যাণ্ড কুইন সায়েব ক্রমাগত চলেছেন রূপার খোঁজে। রূপাও জানে। দু-দু'বার চেষ্টা করেছে কুইন সায়েবকে গুলী করতে। একবার তো শেষই হয়েছিল। শুধু সায়েবের গুর্খা জীপ ড্রাইভারটাই অদ্ভুত সাহস দেখিয়ে গুলীর ঝাঁকের মধ্যে দিয়ে স্পীডে জীপ চালিয়ে সায়েবকে বাঁচাতে পেরেছিল।

মোরেনার কাছেই নাগরা গাঁ—ফোর্থ ব্যাটালিয়নের হেড-কোয়ার্টার। কমাণ্ড্যাণ্ড কুইন সায়েব চলেছিল গোয়ালিয়র থেকে নাগরা। পথে মহুয়া গাঁয়ে বিশ্রাম নিতে দাঁড়াল। মহুয়া থানার দারোগা জানকীনাথ মিশ্র সায়েবকে এক পাশে ডেকে চুপি চুপি খবর দিলেন শোনা গিয়েছে মাইল দুয়েক দূরে 'বেহড়'-এর রাস্তা দিয়ে "জি" ওয়ান চলেছে নাগরার দিকে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কুইনের জীপের ওয়্যারলেস "কোড" মেসেজ পাঠাতে শুরু করল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন'-প্ল্যাটুন আর্মড পুলিশ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে—দু-প্ল্যাটুন নাগরাতে, দু-প্ল্যাটুন মহুয়াতে, দু-প্ল্যাটুন

কালী-আড়োলীতে, আর উদিতগড় আর পোরপাতে এক এক প্ল্যাটুন। একটা থাকলো রিজার্ভে। মহুয়ার প্ল্যাটুনদের বলাই হলো না হঠাৎ কেন এই তোড়জোড়। আস্তে আস্তে পোরসা উদিতগড়, আর কালী-আড়োলীর প্ল্যাটুন এসে পৌঁছল নাগরাতে। ছ' প্ল্যাটুন নিয়ে নাগরা থেকে কমাণ্ড্যাণ্ট কুইন শুরু করল মার্চ মহুয়ার দিকে। বেলা ২-৩০টায় আবার এসে পৌঁছল মহুয়া গাঁয়ে। প্ল্যাটুন কমাণ্ডার ছাড়া আর কেউ জানল না কোথায় বা কেন যাওয়া হচ্ছে এত চুপচাপ। কম্পানী কমাণ্ডার কর্তারসিং এক প্ল্যাটুন নিয়ে "বেহড়"-এর পালাবার পথ "সীল" করে "অ্যামবুশ" তৈরি করলেন তিন মাইল রাস্তার ওপর। তিন মাইল রাস্তার পরই চম্বল নদী। বাকী প্ল্যাটুন তিন দিক থেকে চলল "বেহড়"-এর দিকে।

"বেহড়"-এর শেষ দিকে গাছের নিচে দিবা-নিদ্রায় রূপার দল। শুধু একজন পাহারা দিচ্ছিল। তার চিৎকার শোনা গেল "পুলিশকে কুত্তে ভাগো"। কয়েক মিনিটের মধ্যে আটাশটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পুলিশ ছুটল যেদিক থেকে আওয়াজ এল সেইদিকে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। রূপা ভাবল লড়াই করা বৃথা। একবার যদি "বেহড়"-এর নিচের দিকের রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারে ব্যস তাহলেই পালাতে পারবে। মোটে তিন মাইল তারপরই তো চম্বল নদী আর চম্বল নদীর ওপারেই রাজস্থানের সীমানা। পালাল রূপা দলবল নিয়ে তিনদিকে। চারদিক থেকে আসছে গুলীর আওয়াজ। অনেকটা এসে পড়েছে রূপা, আর মোটে আধ মাইল তারপরই চম্বল। শেষ সীমানায় বসেছিল "অ্যামবুশ" পার্টির জমাদার বালমসিং। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো অন্ধকারে সামনে পাহাড়ের ওপর হঠাৎ তিনজন লোক উঠে দাঁড়াল। বালমসিং-এর টমীগান গর্জে উঠল। কিছুই দেখতে পারল না বালমসিং। তারপর সব চুপচাপ। তখন রাত আটটা। ঘন কালো অন্ধকার নেমে এসেছে—চম্বলের বেহড়ে আর মহুয়া গাঁয়ে। সেদিনের মতো অপারেশন বন্ধ রাখবার হুকুম দিল কমাণ্ড্যাণ্ট কুইন। পরের দিন ভোরবেলা তখনও মহুয়া গাঁ জেগে ওঠেনি, কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে কুইন সায়েব চলল গত রাত্রির 'অ্যাকশন'-এর জায়গায়। কই কোথাও তো কিছু নেই।

ঐ তো রক্তের ধারা। কুইনের বুক দুড়দুড় করছে। কার রক্ত! আরো আগে। আরো আগে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে কে যেন। রূপা কি? উল্টে দেখা হলো। না। এ তো রূপা না, এ তো তার দক্ষিণ হস্ত রাজারাম। যাক, তবু একজনকে তো পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কুইন সায়েবের মুখে হতাশার রেখা ফুটে উঠল। ক্ষুব্ধ মনে চলল ফিরে। রাস্তায় ছোটো একটা নালী তার পরই চম্বলের 'বেহড়'। কিন্তু নালীর কাছে ওকি? রক্তমাখা 'হ্যাভারস্যাক'? রক্তের ধারা চলে গিয়েছে বিন্দু বিন্দু করে বেহড়ের মধ্যে। কুইন সায়েব দৌড়ল 'বেহড়ে'র মধ্যে। সঙ্গের অফিসাররা অবাক। হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল কমাণ্ড্যাণ্টের, "উই হ্যাভ গট হিম, উই হ্যাভ গট হিম। জি ওয়ান ইজ লিকুইডেটেড"। পালাবার সময় দলের লোকেরা চেষ্টা করেছে রূপা মহারাজের মৃতদেহ টেনে নিয়ে যেতে। অন্ধকারে তা সম্ভব হয়নি। ভেবেছিল লুকিয়ে রেখে পরদিন আবার নিয়ে যাবে। শুধু একটা মাত্র গুলী চলে গিয়েছে বুকের মধ্যে দিয়ে। মৃদু মৃদু হাসছে রূপা। চম্বলের আতঙ্ক (Chambal Terror) রূপার কি পরিণতি? একটা গুলী ছোঁড়বার সময়ও পায়নি। কিন্তু তার সাত হাজার টাকা দামের টেলিস্কোপিক রাইফেল! তার কি হলো? অনেক খোঁজা হলো—কিন্তু পাওয়া গেল না। দলের কেউ নিয়ে গিয়েছে বোধহয়।

রূপার দামী গ্যাভারডীনের পোশাক থেকে পাওয়া গেল একটা ডায়েরী, ৬৬০৲ টাকা নগদ, তুলসীর মালা আর ছোট একটা রামায়ণ আর কিছু সোনার গয়না। আর পাওয়া গেল চারটে খালি কার্তুজ। খালি কার্তুজের রহস্য আজও জানা যায়নি।

দুপুর বেলা কুইন সায়েব আবার অবাক হলো, যখন বার-তের বছরের একটা ছেলে তাঁর কাছে এল। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে সে। পনেরো দিন আগে রূপা তাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল তার গাঁ থেকে। পনেরো দিন সে দলের সঙ্গে ছিল। অনেক খবর দিল সে পুলিশকে। যখন ডাকাতরা পালাতে শুরু করে, সে সুযোগ বুঝে বেহড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

মোটা লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রুস্তমজী সাহেব নামটা কেটে

দিলেন, রূপার। বললেন "what an inglorious end. He died unsung, unwept, unlamented."

পরের দিন টেলিগ্রাম এল ডাঃ কাটজুর কাছে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের :

> "Glad to know about excellent police work which has brought to an end criminal careers of Roopa dacoit and his associate Rajaram. Please accept congratulations and also convey them to State Police Force."

কিন্তু আরেকটা রহস্য বোধহয় কেউই জানল না। কেন রূপা 'নাগরা'র দিকে চলেছিল? লাখনসিং-এর জন্মভূমি নাগরা গাঁ। খবর পেয়েছিল রূপা, লাখন সেদিন গাঁয়ের দিকে আসবে। লাখনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে চলেছিল সে। কিন্তু এমনি তার নসীব, মরল না লাখন, মরল সে নিজে। লাখনের সেদিন আসার কথা পুলিশ জানতে পারেনি। নিজে মরে রূপা তার শত্রু লাখন সিংকে সেদিন পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল।

উদিতপুরা গাঁয়ে রুক্মিণীর কাছেও কে যেন খবর দিয়েছিল। অন্ধকারে ঘরের এক কোণে বসে রুক্মিণী বোধহয় একফোঁটা চোখের জলও ফেলেছিল। ছোট্টো বার বছরের রূপাকে সে দেখেছিল সেই কতদিন আগে। 'দাউ' বড় ভালোবাসতো রূপাকে। তার বন্ধু ছাবরামের ছেলে ছিল যে রূপা; কিন্তু মোটে ৩৬ বছর বয়সে তারও সব শেষ হয়ে যাবে, তা তো ভাবেনি রুক্মিণী। আর কত সহ্য করবে সে।

আরেকজন সেদিন চোখের জল ফেলেছিল। মোরেনা শহরের আসগরীবাঈ। দস্যুরানী পুতলীর মা আসগরী। সে-ও চিনতো রূপাকে। তার মেয়ে যে কিছু দিন রূপাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল।

নয়

কোনো কথা বলেনি আমায় আসগরীবাঈ। চুপচাপ আমার সামনে বসেছিল জল-ভরা চোখ নিয়ে। জীবনে বহুবার বহুলোককে

তো সে বলেছে কিন্তু কেন বারবার সেই একই প্রশ্ন তাকে করা হয়। সেই একই প্রশ্ন একই সহানুভূতি একই উত্তর। কতবার সে বলবে কেমন করে বাঈজীর মেয়ে সে বাঈজী না হয়ে ডাকাতের সর্দার হলো। কতবার সে বলবে নাতনীর দিকে চেয়ে তার বুকটা মাঝে মাঝে হু হু করে ওঠে। পুলিশ, খবরের কাগজের লোক, মন্ত্রী, নেতারা সবাই জিজ্ঞাসা করে সেই একই প্রশ্ন, পায় সেই একই উত্তর আর একইভাবে নিজেদের কৌতূহল নিবারণ করে চলে যায়। খবরের কাগজের লোকেরা তো রংচং লাগিয়ে কত কি বের করেছে। তার নামে। সত্যি মিথ্যে জড়িয়ে তাকে তৈরি করেছে এক অদ্ভুত চরিত্র। সারা পৃথিবীতে তার নাম হয়ে গেল "দস্যুরাণী"। বিদেশী কাগজে কে যেন নাম দিল "ব্যাণ্ডিট্ কুইন"। কি করে তাদের বোঝাবে তার কাছে সে শুধু পুতলী। তার নয়নের পুতলী

"কিন্তু তার জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?" আমার গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনালেও আসগরীবাঈ হঠাৎ তার সম্বিত ফিরে পেল। এ আবার কি রকম প্রশ্ন? এ প্রশ্ন তো তাকে কেউ আগে জিজ্ঞাসা করেনি। পুতলীর জন্যে তার কষ্ট হয় কি না? কি করে বলবে তার কেমন মনে হয় মোরেনা শহরের রাস্তা দিয়ে নাতনী তান্নোর হাত ধরে যখন মাঝে মাঝে যায়, আঙুল উঠিয়ে লোকে বলে "ব জা রহী হ্যায় পুতলী ডাকু কী মা আউর উসকী লড়কী।" ঐ যাচ্ছে পুতলী ডাকাতের মা আর তার মেয়ে।

চুপ করে থাকে আসগরীবাঈ। চোখের কোণ দুটো আবার চিকচিক করে উঠে। ষাট বছরের বৃদ্ধা আসগরীবাঈ-এর মনে পড়ে অনেকদিন আগের কথা। সে যখন অনেক ছোট ছিল তখন তার মা'র সঙ্গে চলে গিয়েছিল জন্মভূমি মোরেনা জেলার "বারবই" গ্রাম ছেড়ে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা শহরে। আস্তে আস্তে বড় হয়েছে। তখন যৌবন ছিল, রূপ ছিল, গলা ছিল আর ছিল অদ্ভুত এক জোড়া পা। মনে পড়ে তার পুরোনো দিনের কথা। দামী পুরু কার্পেটের ওপর ঘুঙুর পরে যখন তবলার তালে তালে পা দুটো ফেলেছে, মহফিল "বাহ-বাহ" রবে গুঞ্জিত হয়েছে আর অনেক পেয়ালা ছলকে গিয়েছে। অনেকদিনের কথা। অনেক নাম-জানা না-জানা লোক এসেছে আসগরীবাঈ-এর মহফিলে। আগ্রা,

লক্ষ্ণৌ, কানপুরে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। রহমান খাঁ'র সারেঙ্গীর সুরে গেয়েছে অনেক গান। এখনো মনে পড়ে কয়েকটা কলি। কাঁপা কাঁপা গলায় আসগরী বলে যায় হারানো দিনের খুঁজে পাওয়া গানের কলি ঃ

"সাঁবরিয়া রে কাহে মারো নজরীয়া
ইত বহে গঙ্গা, ইত বহে যমুনা
বিচ্ ঠাড়ো কানাইহারে
কাহে মারো নজরীয়া—সাঁবরিয়া রে···
বিন্দ্রাবন কি কুঞ্জ গলিয়ান মে
ম্যা মথুরা কি গুজুরিয়া রে······

আর মনে নেই আসগরীবাঈ-এর! তারপর বয়েস হয়েছে আরো। কোলে এসেছে পুতলী আর তারা। চিন্তা এসেছে এদের মানুষ করে তুলবার কথা ভেবে। ওস্তাদ রেখে শিখিয়েছে গান আর নাচ। তারার ভালো লাগেনি এ জীবন কিন্তু পুতলী আলাদা ধাঁচে গড়া। ছিপছিপে রোগা চেহারা। গলার স্বর অদ্ভুদ মিষ্টি আর শিখেছিল প্রাণ-মাতানো নাচ। হৈ-চৈ পড়ে গেল পুতলীর গানের। "আল্‌হা আর হোলী" গাইতে তার জুড়ি পাওয়া যায় না। মহোবার চন্দেলা রাজা পরমালের রাজসভার দুই বীর সেনাপতি আল্‌হা আর উদাল। তাদের বীরত্বের কাহিনী লেখা হয়েছে গানে পৃথ্বীরাজ চৌহানের সময়। সেই গান আজও মধ্যপ্রদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে গায়। পুতলী শিখলো সেই গান। গাঁয়ে ডাক পড়ে পুতলীর। বিয়ে-শাদীতে 'আল্‌হা' গাইবার বায়না আসে অনেক। কিন্তু পুলিশের কর্তাদের নজর পড়ল পুতলীর ওপর। একদিন সকালে আসগরী হঠাৎ পুতলী আর তারাকে নিয়ে ফিরে এল সুদূর মোরেনা জেলার বারবই গ্রামে আর সেখান থেকে মোরেনা শহরে। আসগরীবাই আজও মোরেনা শহরে ছোট মেয়ে তারা আর পুতলীর মেয়ে তান্নোকে নিয়ে আছে। কিন্তু পুতলী নেই। সেও অনেকদিনের কথা।

মনে করতে চেষ্টা করে আসগরীবাই সেদিনকার কথা। যখন খবর এসেছিল ডুকরে কেঁদে উঠেছিল সে। বড় বায়না নিয়ে পুতলী গিয়েছিল ঢোলপুর রাজ্যে। গাঁয়ের পর গাঁ এসেছে উজাড়

করে। লোকে দেখতে এসেছে পুতলীবাঈ-এর নাচ আর শুনতে এসেছে তার মধুর সঙ্গীত। তখন রাত প্রায় দুটো। গাঁয়ের জমিদারের প্রাঙ্গণে জ্বলছে গ্যাসবাতি। মদের ফোয়ারা ছুটেছে আর পুতলী নেচে চলেছে। বিরাম নেই তার। জমিদারের ছেলের বিয়ে। অনেক টাকা ইনাম পাবে পুতলীবাঈ। মা'র শেখানো পুরোনো গান ধরল পুতলী। শ্রোতারা তখন ঢুলছে।

"সাঁবরিয়ারে কাহে মারো নজরীয়া—
ইত বহে গঙ্গা ইত বহে যমুনা
বীচ ঠাড়ো কানাইহারে···।"

তবলার সম্ তখনও পড়েনি, হঠাৎ শোনা গেল দুটো গুলীর আওয়াজ। এক মুহূর্তের মধ্যে কি যেন সব হয়ে গেল। কোথায় গেল গ্যাসবাতি, কোথায় সারেঙ্গীওয়ালা রহমান খাঁ, তবলচী রামদুলারে, কোথায় গেল মত্ত শ্রোতারা। পুতলী চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। একবার মনে হলো দুটো শক্ত বাহু যেন তাকে জাপটে ধরেছে। মুখের উপর গরম নিশ্বাস। এক লহমার জন্যে পুতলী দেখতে পেলো সুন্দর একটা মুখ নেমে আসছে ধীরে ধীরে তার মুখের উপর। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করতে চেয়েছিল পুতলী কিন্তু পারেনি। দুটো ঠোঁট নিবিড়ভাবে নেমে এসেছিল তার নিজের ঠোঁটের ওপর। তারপর শুধু মনে ছিল অন্ধকার রাস্তা দিয়ে সে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে—"বেহড়ে"র দিকে। সে বসে আছে সামনে আর তাকে বাঁ-হাতে আঁকড়ে ধরে ডান হাতে রাশ ধরে পেছনে বসে আছে আরেকজন।

কেউ কোন কথা বলেনি, কেউ কোন বাধা দেয়নি। কিন্তু পরদিন যখন আসগরী খবর পেয়েছে ডুকরে কেঁদে উঠেছে। লোকের হাতে পায়ে ধরেছে তার নয়নের "পুতলী", পুতলীকে ফিরিয়ে আনতে। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে—সুলতান ডাকুর হাত থেকে পুতলীকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে! একচ্ছত্র আধিপত্য তখন সুলতান ডাকুর। দুর্ধর্ষ ডাকাত, নির্মম, হৃদয়হীন দস্যু সুলতান। আর কে না জানতো পুতলীর প্রেমে পড়েছে সুলতান। আর কিইবা করেছে সে! চিরাচরিত সনাতন প্রথাই তো সে অবলম্বন করেছে। বীরের মতো তার প্রিয়তমাকে বাহুবলে জয় করে নিয়ে গিয়েছে।

মেয়েমানুষদের ভালো লাগতো না সুলতানের। সব অশান্তির মূলে ঐ মেয়েরাই। তাছাড়া ডাকাত দলে মেয়ে সঙ্গে রাখার বিপদ অনেক। সুপুরুষ, সুদর্শন সুলতান। অনেক মেয়েই তাকে করেছে প্রেম নিবেদন কিন্তু সুলতান হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করেছে। "মহব্বৎ, ইয়ে মহব্বৎ হ্যায় কিস্ চিড়ীয়াকা নাম। কোই কিমৎ নেই মেরে পাস"—দলের লোকদের বলেছে অনেকবার। কিন্তু সেই সুলতান ডাকুর মনের এককোণে কবে যে পুতলী তার নিজের জায়গা করে নিয়েছে সে নিজেও জানতে পারেনি। অনেক গাঁয়েই পুতলীকে সে দেখেছে। মেয়েটাকে কি রকম যেন অন্য ধরণের মনে হয়েছে। কেমন অদ্ভুত যেন ওর চোখের চাউনিটা। কই এমন করে তো কেউ চায় না। ভীত হরিণীর মতো চঞ্চল সে চাউনি, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত। রাতে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে সেই চোখ দুটো তাকে করেছে নিদ্রাহীন। চঞ্চল, অস্থির হৃদয়কে বুঝিয়েছে সে অনেক কিন্তু বেশ বুঝতে পেরেছিল কিসের একটা নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। কি একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে যেন টানছে। তারপর একদিন হঠাৎ মাঝ রাতে উঠে জমিদারের মহফিল তছনছ করে দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে পুতলীকে। কাজটা ভালো করলো না মন্দ করলো, তা সে নিজেও বুঝতে পারলো না। দলের লোকেরা ফিস্‌ফিস্ আর কানাঘুষো করে কিন্তু সর্দারের রাঙা চোখ দেখে আর কারুর সাহস হয়নি কিছু বলতে।

"বেহড়ে"র গভীর আস্তানায় নিয়ে এসেছে পুতলীকে সুলতান। হ্যাভারস্যাক থেকে বের করেছে বিলাতী মদ। জাপটে ধরেছে পুতলীকে। প্রাণপণে বাধা দিয়েছে পুতলী কিন্তু একদিন নিজের অজান্তেই করেছে সমর্পণ। সে রাতে "বেহড়ে" হয়েছিল উৎসব। মদের নেশায় পুতলী ঢলে পড়েছে সুলতানের বুকে। "নাচ পুতলী নাচ, আউর নাচ", জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছে সুলতান আর পুতলী নেচেছে সারা রাত।

বাইশ বছরের নাচনেওয়ালী আসগরীবাঈজীর মেয়ে পুতলীর জীবনের মোড় গেল ঘুরে। বাঈজী না হয়ে সে হয়ে গেল দস্যু-সর্দারের প্রেয়সী। দলের লোককে হুকুম দিয়েছিল সুলতান,

পুতলীকে তারা যেন সর্দারের মতোই সম্মান দেয়। পুতলীর হুকুম যেন কখনও অমান্য না হয়। সবাইকার জন্যে ছিল দেশী মদ কিন্তু পুতলীর জন্যে দূর দূর থেকে এসেছে বিলাত্তী মদ। আর এসেছে লিপষ্টিক পাউডার, নূতন নূতন জামা কাপড় আর গয়না। কিন্তু রঙীন নেশায় আর ক'দিন চলবে। সঙ্গের অর্থ ফুরিয়ে এসেছে। শুরু হলো সুলতানের আগেকার জীবনযাত্রা। গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আবার শুরু করল লুঠ, খুন-জখম। পুতলী কেঁপে ওঠে ভয়াবহ সব দৃশ্য দেখে। রক্তের গঙ্গা দেখে ভয়ে আর ঘৃণায় সরে এসেছে সুলতানের কাছ থেকে, কিন্তু আবার যখন দিনের শেষে সুলতান নিবিড়ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে—পুতলী, তু মেরী রাণী হ্যায়, সে নিজেকে করেছে সমর্পণ। প্রাণ মন দিয়ে ভালোবেসেছে তাকে।

কিন্তু রাতে ঘুমের ঘোরে কখনও কখনও ভয়ে চিৎকার করে উঠেছে পুতলী। রক্ত, রক্ত চারিদিকে রক্ত। সকালে উঠে সুলতানকে বলেছে, "মুঝে ছোড় দে সুলতান, মুঝে জানে দে।"

আশঙ্কায় দুলে উঠেছে সুলতান। "নহী মেরী রাণী ম্যা মর জাউঙ্গা। তু মত জানা পুতলী"। কিন্তু একদিন আর পারলো না পুতলীর আগ্রহ ঠেলতে। পুতলীর গাঁয়ের কাছ পর্যন্ত পোঁছে দিয়ে গেল সুলতান। যাবার আগে বারবার সুলতান পুতলীকে বলেছে, পুতলী আর একবার ভেবে দেখ। সভ্য-সমাজে কেউ আর তোকে ডাকবে না। তুই যাস না। ফিরে আয়। কান্না চেপে পুতলী চুপিচুপি জানিয়েছে সুলতানকে, তার কোলে এসেছে সুলতানের সন্তান।

মোরেনায় তার মা আসগরীবাঈ আর বোন হারানো পুতলীকে ফিরে পেয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। আসগরীর নয়নের পুতলী ফিরে এসেছে। মা মেয়ের সুখ-দুঃখের কথা তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বিভীষিকার মতো পুলিশের লোক। নিয়ে গিয়েছে থানায় তাকে। সুলতানের খবর জানতে তার ওপর হয়েছে অকথ্য অত্যাচার। পিঠে ভারী বুটের দাগ নিয়ে ফিরে এসেছে পুতলী। দিনের পর দিন চলেছে তার জেরা। রাতের পর রাত ডাক পড়েছে দারোগা সাহেবের ঘরে কি করবে

পুতলী? সুলতান তো ঠিকই বলেছিল সভ্য-সমাজে তার স্থান নেই। আবার মনের কোন গভীর অন্তরালে অনুভব করেছে একটু ব্যথা। রাতে বিছানায় শুয়ে অনুভব করেছে সুলতানের গরম নিশ্বাস আর দুটো শক্ত বাহুর আলিঙ্গন। বেহড়ের ওদিক থেকে শুনতে পেয়েছে 'পুতলী তু মেরী রাণী হ্যায়।' আরো অনুভব করেছে পুতলী তার মা'র সংসারে গতানুগতিক জীবনযাত্রার বিস্বাদ। কোথায় সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চ। কোথায় সেই বন-জঙ্গল আর বেহড়ের অন্ধকারের রূপ। কোথায় সেই অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। মা'র বাড়ির এই নির্জলা ওঠা-খাওয়া-শোওয়া—জীবনের সার্থকতা কোথায়? কোথায় সুলতানের 'মহব্বত' আর দলের বাকি লোকের দেওয়া সম্মান আর ইজ্জত। আর কোথায়ই বা সুলতানের প্রিয় সাকরেদ বাবু লোহারীর ঈর্ষাভরা আর লালায়িত সেই দৃষ্টি। ফিরে গেলে সে সুলতানকে বলবে বাবু লোহারী লোকটা ভালো নয়। পুতলী জানে সুলতান তার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। বলবে বাবু লোহারী আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাকরেদ। কিন্তু সর্দার তো জানে না 'বাবু' কি রকম সাংঘাতিক লোক। যে নিজের সর্দারের রাণীর ওপর কু-দৃষ্টি দেয়, সে আবার ভালো লোক! সব বলবে, সব বলবে পুতলী একদিন। দল থেকে তাড়াতে হবে 'বাবু'কে। পুতলী জানে সুলতান কিছুতেই রাজি হবে না। হয়তো তার ওপরেই রাগ করবে। প্রায়ই বলতো কিনা সুলতান সব অশান্তির মুলেই ঐ 'আউরাত'রা। তা ভাবুক গে। যদি দরকার হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত সে রাতের কথাও বলে দেবে সুলতানকে। আস্ত রাখবে না সুলতান তাহলে বাবুকে। এখনও আবছা আবছা মনে পড়ে পুতলীর সে রাতের কথা। ডাকাতি করতে গিয়েছিল সুলতান অনেক দূরে। দলের তিনজন ছাড়া বাবু লোহারীকেও রেখে গিয়েছিল সর্দার পুতলীর কাছে থাকবার জন্যে। নেশাটা একটু বেশিই হয়েছিল সেদিন। কতক্ষণ থাকা যায় একা। হ্যাভারস্যাক থেকে বোতলটা বের করে বেশ খানিকটা খেয়ে নিয়েছিল। তারপর মনে নেই কখন সে তন্দ্রায় ঢুলতে ঢুলতে শেষে শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ অনুভব করেছে গরম নিশ্বাস। জোরে জোরে। নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়েছে পুতলী ভাসা ভাসা মুখটা নিজের কাছে টেনে

আনতে। দুটো হাত তার হাত দুটো টেনেছে। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে পুতলী। কই এ তো সুলতানের নিশ্বাস নয়। সে নিশ্বাসের প্রতিটি ওঠা-নামা আর উষ্ণতা তার যে জানা আছে। কই এ বাহু দুটিতে সে শক্তি কই। সে দুটো বাহুর প্রতি মাংস-পেশী, প্রতিটি স্নায়ুকে যে সে চেনে।

বাবু লোহারীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আধো-আলো আধো-ছায়াতে তাকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা নেকড়ে বাঘের মতো। মুখের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা। নিশ্বাসের সঙ্গে আসছে বিশ্রী কড়া দেশী মদের গন্ধ। চিৎকার করে উঠেছে পুতলী। 'মেরী জান চল মেরে সাথ, ভাগ চলে'—বাবু লোহারী পাগলের মতো বলে উঠেছে। জাপটে ধরতে গিয়েছে পুতলীকে। সব মনে নেই পুতলীর কিন্তু এটুকু মনে আছে, বেশ ক্ষিপ্রগতিতে ডান পাটা ঘুরিয়ে জোরে লাথি মেরেছিল বাবুর মুখে। ছিটকে পড়েছিল বাবু পাঁচ হাত দূরে।

"শালে কুত্তে। নমকহাম, শূয়ার"—পাগলের মতো চিৎকার করে উঠেছিল পুতলী। চুপচাপ "বাবু" ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। যাবার আগে শুধু একবার লাল চোখ দুটো ঘুরিয়ে দেখেছিল পুতলীকে।

অস্থির হয়ে পড়েছে পুতলী। আর সহ্য হয় না এই বর্ণ-বৈচিত্রহীন জীবনযাত্রা। সহ্য হয় না রোজ রোজ পুলিশের অকথ্য অত্যাচার। ছোটো বোন তারাটাও কোনো কাজের নয়। সেই সকাল বেলা থেকে রাত পর্যন্ত শুধু ওঠা, নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া। সেই সকাল থেকে উঠে মা'র নাকিসুরে কান্না। অনেক দিন পর পুতলী সেদিন আবার রাতে গাইতে বসলো। সারেঙ্গীওয়ালা রহমান খাঁও নেই, আর তবলচী রামদুলারেও আসগরীবাঈ আর পুতলীবাঈ-এর চাকরি ছেড়ে হয়তো আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ কোথাও কোনো বাঈজীর সঙ্গত করছে। একাই বসলো পুতলী—

"সাঁবরিয়ারে কাহে মারো নজরীয়া
ইত বহে গঙ্গা, ইত বহে যমুনা
বীচ ঠাড়ো কানাইহারে।
কাহে মারো নজরীয়া—"

দু'দিন পরে আসগরীবাঈ-এর ঘর নবজাত শিশুর কান্নায় মুখরিত হলো। ঘর আলো করে পুতলীর কোলে এল সন্তান। সুলতানের সন্তান। নাম হলো তান্নো। আসগরী বুকে তুলে নিল নাতনীকে।

আরো দু'মাস পরে গানের বায়না নিয়ে পুতলী গেল বারবই গাঁয়ে। সে রাতেই গাঁয়ে আবার এল সুলতানের দল। পুতলীর আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

আবার সুলতানের আস্তানায় হলো উৎসব। পুতলী রাণী ফিরে এসেছে। তেমনিভাবে, ঠিক তেমনিভাবেই আবার সর্দার তাকে নিজের কাছে টেনে নিল।

"বল্, আমাকে তুই আর কখনও ছেড়ে যাবি না", সুলতান প্রতিশ্রুতি দাবী করে।

"না, তোকে ছেড়ে আর কখনও যাবো না।" কথা দেয় পুতলী।

শুরু হলো পুতলীর নতুন জীবন। আজ এখানে কাল ওখানে। চোখের সামনে দেখে যাচ্ছে ক্রমাগত খুন, ডাকাতি, লুট। নিজে বসে ভাগ করে দিয়েছে লুটের মাল। তার বিচার কেউ অমান্য করেনি। ধীরে ধীরে পুতলী নেমে যেতে লাগল নিচে, আরো নিচে। সুলতান বোঝায় এমনি করে বসে থাকলে চলবে না, বন্দুক চালানো শিখতে হবে, পিস্তল ছোঁড়া জানতে হবে আর শিখতে হবে ডাকাতি করতে। ভয়ে কেঁপে উঠল পুতলী। কিন্তু শুধু কিছুদিন। তারপর সেও একদিন হয়ে গেল দস্যুরাণী—Bandit Queen পুতলী। তিন মাস চলল তার ট্রেনিং। অব্যর্থ নিশানা। পিস্তল আর রাইফেল ছোঁড়ায় দলে তার জুড়ি পাওয়া যায় না। পিঠ চাপড়ে সুলতান বলে—"সাবাস মেরে রাণী, সাবাস।"

কোথায় কোন পুলিশ অফিসারের খাতায় লেখা হলো কেসহিস্ট্রী।

> **"The martial songs that she had sung had gone to her head like a heady wine, and with misconceived notions of romance she plunged into the vortex of**

lawlessness which soon sucked her deep into its swirling currents."

রক্ত দেখে যে পুতলী ভয়ে শিউরে উঠেছে, প্রথম হত্যা করতে শুধু খানিকক্ষণের জন্যে সে বিচলিত হয়েছিল, তারপরই দৃঢ় ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছে গাছে বাঁধা লোকটার দিকে আর বন্দুক তুলে মোটে তিন ফুট দূর থেকে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। ডাকাতি করে ফিরছিল সবাই। সঙ্গে ধরে এনেছে গাঁয়ের একটা নিরীহ লোককে। হঠাৎ কি হলো সুলতানের, লোকটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। বন্দুক বের করে পুতলীর হাতে দিয়ে বললে, "যা লোকটাকে মেরে আয়।"

"আমি ?"

"হ্যাঁ। ভয় কিসের। ওটা পুলিশের কুত্তা।"

বন্দুকটা নিতেই পুতলীর হাতটা কাঁপতে লাগল। একি করছে সে ! ডাকাতের দলে এসেছে বলে কি সে নিজে খুন করবে ! মেয়েমানুষ হয়ে একটা নিরীহ লোককে হত্যা ! না না, সে পারবে না।

"যা পুতলী এগিয়ে যা। খুব কাছে যা। মাথায় তাক্ কর।"

"না না, আমি পারব না। তুই কি বলছিস।"

"যা বলছি"—সুলতান ক্ষেপে ওঠে।

এগিয়ে চলল পুতলী। "বেহড়"-এর চারিদিক কাতর আর্তনাদে ভরে গেল। "আমায় ছেড়ে দে, আমায় তোরা ছেড়ে দে, আমায় মারিসনি।" পুতলী এগিয়ে চলেছে, কাছে, আরো আছে। "মাইয়া মুঝে ছোড় দে। বেটী মুঝে ছোড় দে।"

শিশুর মতো অসহায় লোকটা একবার মা বলে আর একবার মেয়ে বলে ডাকছে পুতলীকে। মুহূর্তের জন্যে পুতলী বিচলিত হয়ে পড়ল। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই মাথা তাক করে ছুঁড়ল গুলি। আর কিছুই তার মনে নেই। সব যেন গুলিয়ে গেল। দলের বাকী লোকদের চিৎকার আর হাততালি কানে আসতে লাগল আর বুঝতে পারল দুটো শক্ত বাহু তাকে জাপটে ধরেছে। মুখের ওপর পড়ছে গরম নিশ্বাস। "সাবাস মেরী রাণী, সাবাস।"

পুতলী,—নাচনেওয়ালী পুতলী, দস্যুরাণী পুতলী, হলো খুনী। সভ্য-সমাজে ফিরে যাবার তার সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে। রক্তের নেশা তাকে পেয়ে বসল। পর পর খুন করে চলল পুতলী। বাপের সামনে ছেলেকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, মা'র সামনে বাচ্চাকে নির্দয়ভাবে হত্যার তাণ্ডবলীলায় মত্ত হলো পুতলী। সুলতানের ভয় হতে লাগল পুতলীর সে রূপ দেখে। কিন্তু পুতলী নির্বিকার। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, শুধু হত্যা আর হত্যা।

সেদিন রাতেও তৈরি হচ্ছিল সবাই ডাকাতি করতে যাবার জন্যে। ভোরবেলায় বেরোতে হবে, পুতলী খানিকটা ঘুমবার জন্যে বিছানায় শুয়েছিল। ভাবছিল তার মা'র কথা, বোন তারার কথা, তার নিজের ফেলে-আসা দিনের কথা, আর মনে হলো ছোট একটা দুরন্ত শিশুর কথা। পুতলী চঞ্চল হয়ে উঠল। কত বড় হয়েছে মেয়েটা। সখ করে নাম রেখেছিল তান্নো। মা আসগরী বলেছিল বিব্বো নাম রাখতে, কিন্তু নামটা পছন্দ হয়নি পুতলীর—তাই তান্নো রেখেছিল। সুলতানেরও বড় ভালো লেগেছিল নামটা। পুতলী বিছানায় উঠে বসল। মেয়েটাকে একবার দেখার জন্যে মনটা কেঁদে উঠলো। শুধু একবার। একবার শুধু কোলে তুলে নিয়ে তাকে চুমু খাবে। তাকে বলবেও না যে সে তার মা। কি লাভ হবে মেয়েকে জানিয়ে তার মা ডাকাত—দস্যুরাণী পুতলী। তার চেয়ে এই ভালো। "দাদীর কাছে মানুষ হোক, লেখাপড়া শিখুক, বড় হোক। লোকে জিজ্ঞাসা করলে বলতেই হবে তার মা মরে গিয়েছে। সত্যিই তো। পুতলী তো সেদিনই মরে গিয়েছে যেদিন ঢোলপুরের সেই মহ্‌ফিলে আধরাতে সুলতান তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে তো সেদিনই মরে গিয়েছিল, যেদিন নিরীহ গাঁয়ের লোকটার মাথার খুলি সে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শুধু একবার সে তান্নোকে দেখবে। তারপরই চলে আসবে। পুতলী উঠে দাঁড়াল। এখনি রওনা হতে হবে তাহলেই দু'দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে বারবই গ্রামে। কিন্তু সুলতান? সে তো যেতে দেবে না। সে তো অনেকবার তাকে বলেছে সে খুনী, আর তার ফেরার কোনো পথ নেই। কিন্তু শুধু কয়েকদিনের জন্যে বই তো নয়। সাবধানে

গিয়ে ফিরে আসলেই তো হবে। পুলিশ টেরও পাবে না। না, পুতলী জানে, সুলতান প্রাণ গেলেও তাকে যেতে দেবে না। থাকগে কি আর হয়েছে। চুপচাপ চলে গেলেই হবে। না হয় সুলতান একটু রাগারাগি করবে। দু'দিন পরেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। সুলতানকে তো জানে। এখন বলতে গেলেই বিপদ। তাছাড়া আজ যে বড় ডাকাতি করতে যেতে হবে, সুলতানের মেজাজই হয়তো ঠিক নেই। তার চেয়ে চুপচাপ চলে যাওয়াই ভালো।

তখনও ভোর হয়নি। পুতলী ধীরে ধীরে বাইরে এল। পাশেই শুনতে পেল দলের লোকদের কথাবার্তা। সব তৈরি রওনা হবার জন্য। সুলতানের ডাক শোনা গেল, "চল পুতলী, জলদি আ"। এই-ই সময়। আর দেরী করলে সব মাটি হয়ে যাবে।

"আরে আতী কুঁ্য নহী। দের হো রহী হ্যায়"—সুলতানের স্বর আরো কাছে।

হঠাৎ গুলীর আওয়াজ। মুহূর্তের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল। শুধু শোনা গেল সুলতানের চিৎকার, "ভাগো, ভাগো, পুলিশকে কুত্তে।" আর শোনা গেল, "পুতলী কহাঁ গই জলদী ভাগ।" তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল পুতলী। অবিরাম গুলী চলছে তখনও, কিন্তু দলের কেউই কাছে কিনারায় নেই। সব পালিয়েছে।

ভোর হয়ে এল আর পুতলী ধীরে ধীরে "বেহড়" থেকে বেরিয়ে এল। সামনেই পুলিশের দল। সোজা চলে গেল পুলিশের সামনে, বলল, "আমি পুতলী, আমি আত্মসমর্পণ করছি। চল কোথায় যেতে হবে।" বিজয়গর্বে পুলিশের লোক পুতলীকে নিয়ে চলল। পুতলীর মনে অনেক চিন্তা। কাজটা কি ভালো হলো? কি আর হবে। তার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে? হয়তো ক'দিন পরেই ছেড়ে দেবে তাকে। তারপর সে চলে যাবে সোজা বারবই গ্রামে মা'র কাছে বোনের কাছে আর তার তান্নোর কাছে। সবাইকে নিয়ে চলে যাবে কোথাও দূরে অনেক দূরে।

আগ্রার তাজগঞ্জ থানায় নিয়ে গেল পুতলীকে। সেখান থেকে ঢোলপুরে। জামিনে খালাস পেল পুতলী কিন্তু তাকে বারবই গ্রামে

ফিরে যেতে দিতে দারোগা সাহেব রাজী নন। দুটি শর্ত তাঁর। প্রথম, পুতলীকে ঢোলপুরে ডেকে আনতে হবে তার বোন তারাকে। সে থাকবে কিছুদিন দারোগা সাহেবের কাছে, আর দ্বিতীয়, তাকে হতে হবে পুলিশ ইনফরমার। খোঁজ দিতে হবে সুলতানের দলের। আরো জানিয়ে দিলেন তিনি সুলতানের এই ধারণা হয়েছে যে, পুতলীই পুলিশকে খবর দিয়েছিল সেদিন, যে জন্যে রাজই গ্রামে হঠাৎ তাদের দলকে পুলিশ আক্রমণ করতে পেরেছিল। প্রথম শর্ত মানতে পুতলী রাজী নয়। নিজের জীবনটা নষ্ট হয়েছে বলে কি ছোট বোন তারাটার জীবনও নষ্ট করবে সে? না, দিদি হয়ে সে তা পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত সে ভেবে দেখবে। ভেবে দেখবার কি আছে। জানিয়ে দিলে যে সে রাজী। একবার পালাতে পারলে আর কি তার খোঁজ পায়। দারোগা সাহেবও সহজে ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—"তবে তুই কিছুদিন থাক আমার কাছে। নিজের ইচ্ছায় যদি না আসিস তবে তোর মা বোন সবাইকে নিয়ে আসব ধরে। তোর মাকে পুরবো জেলে আর তোর সামনেই তোর পেয়ারের বোন তারাকে নিয়ে আসব ঘরে।"

না না, তা হতে দেবে না পুতলী। সেই থাকবে সাহেবের কাছে। জরুরী কাজে দারোগা সাহেব চলে গেলেন মফঃস্বলে। কথা রইল, তিনি ফিরবেন পরদিন রাতে, পুতলী যেন তাঁর জন্যে তৈরি থাকে। তা কেন, সে এখনি গিয়ে উঠবে দারোগা সাহেবের বাড়িতে। আর পরদিন রাতে? এমন গান আর নাচ শোনাবে সাহেবকে যে সাহেবের তবিয়ৎ খুশ্ করে দেবে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা দারোগা সাহেব ফিরেছেন। সঙ্গে মদের বোতল আর দুটি বন্ধু। কিন্তু কোথায় পুতলী? পাখি উড়ে গিয়েছে। খালি বিছানার উপর পড়ে আছে শুধু নীল উড়নি। ততক্ষণে পুতলী পেঁাছে গিয়েছে আবার সুলতানের কাছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্থ অনেক দূর পায়ে হেঁটে পেঁাছেছে সুলতানের কাছে।

গম্ভীরভাবে বসেছিল সুলতান। কয়েক দিনেই যেন তার কত বয়স বেড়ে গিয়েছে। চুপচাপ। একটা কথাও বলেনি। কাছে এসে বসেছে পুতলী অনেকক্ষণ, তবুও কথা বলেনি।

"সুলতান", আহতের মতো বলেছে পুতলী।

"নিকল্ যা মেরে সামনেসে। বেইমান কাঁহিকি", ফেটে পড়ল সুলতান।

জানতো পুতলী এ হবেই। দারোগা সাহেব তো আগেই বলেছিল—দলের লোকের কি ধারণা হয়েছে তার ওপর। রাত ভোর জেগে সব বুঝিয়েছে পুতলী। সব কথা বলেছে। কিছু বুঝেছে সুলতান, কিছু হয়তো বোঝেনি। আবার তাকে দু'হাত দিয়ে টেনে নিয়েছে কাছে, কিন্তু সে আলিঙ্গনে আগের সেই উষ্ণতা খুঁজে পেল না পুতলী। কোথায় যেন কি একটা খোঁচা দিচ্ছে সুলতানকে। পুতলী সবই বুঝল। আর বোধ হয় জোড়া লাগবে না। বুঝতে পারল বাবু লোহারী কি রকম বিষিয়েছে সুলতানের মন। তবু আশা আছে পুতলীর, আস্তে আস্তে সবই ঠিক হয়ে যাবে। সুলতান আবার বুঝতে পারবে পুতলী শুধু তারই! পুতলী সেই রকমই আছে। পুতলী তারই "রাণী"। পুতলী একটুও বদলায়নি। প্রমাণ চাই তার একনিষ্ঠতার? তাও দেবে। দিনের পর দিন পুতলী সুলতানের সঙ্গে গিয়েছে ডাকাতি করতে। অবাক করেছে দলের লোকদের তার নির্মমতা আর হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়ে। একদিন পঁচিশ মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে দেখিয়েছে, সেও কিছু কম না। পুলিশ দলের ওপর চালিয়েছে এলোপাথারি গুলী। মেরেছে অনেক পুলিশের লোক। সেই দারোগা সাহেবকেও ছাড়েনি সে। প্রতিশোধ নিয়েছে তাকে কুকুরের মতো গুলী করে। মেয়েদের কান ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিয়েছে সোনার দুল, হাত কেটে বার করেছে চুড়ি আর আঙুল কেটে নিয়েছে আংটি। আরও প্রমাণ চাই? আরো?

নবীন উৎসাহে সুলতান সিং আবার শুরু করল তার দস্যু-জীবন। তখনও মানসিং বেঁচে। সুলতান নিজের দলে টানল লাখনসিং-এর দলকে। দুই দল মিলে যা শুরু করল তা যেমনি ভয়াবহ তেমনি নিষ্ঠুর। পুলিশের কর্তারা হিম-শিম খেয়ে গেলেন। কিছুতেই কিছু করা যায় না সুলতান-লাখনের দলকে। লাখনকেও কিন্তু ভালো লাগেনি পুতলীর। লোকটা বড় ধূর্ত। চোখ দুটো দেখলেই কেমন যেন ভয় করে। পুতলী জানতো, লাখনের সঙ্গে বনিবনা হবে না সুলতানের। একদিন ভাঙন ধরবেই এবং সেদিন আসন্ন।

হলোও তাই। শুরু হলো ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য কিন্তু খোলাখুলিভাবে বিবাদ হলো না। লাখনের সঙ্গে তখন বাছা বাছা লোক—পাহাড়া, হুজুরী কল্লা এবং আরো অনেকে।

সেদিনের কথা পুতলী কখনও ভোলেনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভোলেনি। সেই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা, সেই ঘৃণিত কাপুরুষতা, সে কখনও ভুলতে পারেনি। ভেবেছিল নির্মমভাবে প্রতিশোধ নেবে সে কিন্তু নসীবের কি খেল, যাকে সে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেছে তার অপকার্যের জন্যে, তারই জীবন-সঙ্গিনী হয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিল সে ! জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে সে ছেড়ে যায়নি আর সেও তাকে ছাড়েনি। একটুও ভোলেনি সেদিনকার কথা পুতলী। তারিখটাও মনে আছে তার; ৫ই মে, ১৯৫৫। মোরেনা জেলার "নাগরা"র কাছেই অর্জুনপুর "বেহড়ে"ই তো ঘটেছিল সেই ঘৃণিত অপরাধ। সে কি ভুলতে পারে? হঠাৎ হয়েছিল পুলিশের আক্রমণ। তখন দুপুর বারোটা। চম্বলের "বেহড়" থেকে যেন আগুন ছুটছে। পুতলীর সামনেই পুলিশের গুলীতে মরল সুলতানের প্রিয় সাকরেদ মাতাদিন। দলের লোকেরা পালাতে লাগল। সুলতান পুতলীকে বলল, তুই "বেহড়"-এর ওপাশে লুকিয়ে পড়। তুই পালাস না যেন। সুলতানের মনে সন্দেহ জেগেছে আবার। হেসে পুতলী তার কথা মতোই লুকিয়ে পড়ল। তারপর? এইবার আমায় একটু থামতে হবে। পুতলীর মুখেই শোনা যাক—

> "সুলতান দাঁড়িয়েছিল ছোট একটা টিলার ওপর। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে বাবু লোহারী। সুলতান ওকে আমাকে দেখতে বলে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখলাম, লাখন সিং কল্লাকে ইশারা করে সুলতানের দিকে ইঙ্গিত করল। কল্লা আস্তে আস্তে রাইফেল তুলে পিছন থেকে সুলতানকে গুলী করল। সুলতান সেইখানেই পড়ে গেল। সুলতানের প্রিয় ঘোড়া "বাহাদুর" সজল নয়নে চেয়ে থাকল তার মৃত প্রভুর দিকে।"

তারপর চোখে অন্ধকার দেখেছে পুতলী। চিৎকার করতে গিয়েছে, কিন্তু কে যেন তার মুখটা চেপে ধরেছে। দুটো হাত তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে "বেহড়"-এর ভিতরে। তখনও গুলী

চলছে। একটা কুৎসিত মুখ নেমে এসেছে তার মুখের ওপর আর তার ঠোঁটের ওপর কামড় বসিয়েছে একজোড়া ঠোঁট, যেন সাপের কামড়। বাবু লোহারী।

তারপর? তারপর পুতলী যখন মাটির শয্যা ছেড়ে উঠেছে সে তখন সব হারিয়েছে—শুধু সুলতানকেই নয়, তার আর সবকিছুই। ছেঁড়া কাঁচুলীটা বুকে চেপে অঝোরে কেঁদেছে পুতলী।

একটু আগে পুতলীর কথা শোনাবার জন্যে আমি যে থেমেছিলাম তার কারণ হলো; সুলতানের মৃত্যু নিয়ে বিবাদ এখনও শেষ হয়নি। পুলিশ জাহির করেছে সুলতানকে তারা মেরেছে। সত্য-মিথ্যে জানা আজ হয়তো যাবে না। আজ সুলতানও নেই, পুতলীও নেই। বাবু লোহারী আর কল্লাও নেই। হ্যাঁ, আছে কেবল লাখন সিং। কিন্তু সে কি বলবে সত্যি কথা? আর কার কাছেই বা বলবে! অনেক খোঁজ করেছি। অনেক চেষ্টা করেছি লাখনের সঙ্গে দেখা করতে। একবার হয়েওছিল, কিন্তু থাক সে কথা। লাখনের কথা পরে হবে। কিন্তু পুতলী আমায় বলেছিল তার কথা। শুধু আমায় কেন, সে তো পণ্ডিত নেহরুকেও চিঠি লিখে সব কথা জানিয়েছিল। এতো সেদিনের কথা।

পুতলীর জীবনে এল হতাশা। কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল সব। এদিকে বাবু লোহারী হয়েছে দলের নেতা। কল্লা আর পাহাড়া দু'জনেই হলো পুতলীর পাণিপ্রার্থী। ভাবতেও পারে না পুতলী। কল্লা, যে সুলতানকে খুন করলে, কোন সাহসে তার কাছে এগিয়ে আসে প্রেম জানাতে। আর বাবু লোহারী? দিন গুনছে পুতলী। একদিন সময় আসবে যেদিন সবাইকার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। এত তাড়াতাড়ি যে সময় আসবে তা সে জানত না আর ভাবতেও পারেনি। চার পাঁচ মাসও যায়নি। হঠাৎ একদিন দলের সঙ্গে আবার "এনকাউণ্টার" হলো পুলিশের, মোরেনার কাছে খাম-কি-ভূমিয়াতে। "বেহড়"-এর ওপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল বাবু লোহারী আর দলের লোকেরা চালাচ্ছিল গুলী। কিছুই শোনা যায় না, শুধু গুলীর আওয়াজ। কাছেই মিরাজপুর। পালাতে পারলেই সবচেয়ে ভালো।

এবার আবার আমায় থামতে হবে। শুনতে হবে আবার পুতলীর মুখে

> "আমি বাবুকে বললাম উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে পুলিশের লোক গাঁয়ের দিকেও আছে কিনা। বাবু আমার কথা মতো উঠল টিলার ওপর। আমি খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকলাম। ধীরে ধীরে রাইফেল উঠিয়ে শুধু একটা গুলী ছুঁড়লাম। বাবু লোহারী টিলার ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে, 'বেহড়'-এর নিচে।"

আবার সেই বিবাদ। পুলিশের লোক বলে, তারা মেরেছে বাবুকে আর পুতলী বলে, সে শোধ নিয়েছে বাবুর বিশ্বাসঘাতকতার। কিন্তু কে বলবে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। কেউ তো নেই। পুতলী আমায় বলেছিল তার কথা। আর বাবুর নাম করে বলেছিল, "শালা কুত্তা"। শুধু আমাকে কেন, বাবুকে মারার কথা সে তো পণ্ডিত নেহরুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল।

তারপর আবার এসেছে নৈরাশ্য। এসেছে পাহাড়া সিং। জানিয়েছে প্রেম। কাঠের পুতুলের মতো পুতলী তার সঙ্গে গিয়েছে। পাহাড়া দিয়েছে তাকে ছোট ছেলে—সুরেন্দ্র। আজ সে কোথায় কে জানে? তান্নো কিন্তু আছে। তারপর পাহাড়াও একদিন পুলিশের গুলীতে জীবন দিয়েছে। তারও পরে একদিন এসেছে কল্যাণ সিং—কল্লা। ভাবতেও পারেনি পুতলী কি করে সে কল্লাকে ভালোবেসে ফেলল। সেই কল্লা যে লাখনের হুকুমে সুলতানকে গুলী করেছিল। কিন্তু কল্লা এদের সবার চাইতে কেমন যেন আলাদা। সুলতানের মেয়ে তান্নো আর পাহাড়ার ছেলে সুরেন্দ্রর দায়িত্ব সে নিজে নিতে চেয়েছে। তার বাহুতেও পুতলী পেয়েছে সে-শক্তি আর নিশ্বাসে সে-উষ্ণতা। কল্লার দলেই সে পেয়েছে সবচেয়ে বেশি সম্মান। সে ছিল তার স্ত্রী, তার নার্স, তার সবকিছু। অনেক ভেবে চিন্তে পুতলী একদিন চিঠি লিখল পণ্ডিত নেহরুকে। নভেম্বর, ১৯৫৬-র কথা। নেহরুজীর জন্মদিনে সে চিঠি পাঠিয়েছিল পুতলী। লিখেছিল :—

> "যদিও নারী হিসেবে ডাকাতদের সঙ্গে জঙ্গলে আর বেহড়ে ঘুরে ঘুরে আমাকে জীবনে অনেক কষ্ট আর অবর্ণনীয় দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে, আমার ভয় হয় আমার জীবনেরও শেষ হয়তো ডাকাতরূপেই হবে। এই আমার ভাগ্যে লেখা।"

প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিল দস্যুরাণী পুতলী তাকে ক্ষমা করতে। চেয়েছিল সাধারণ জীবন যাপন করার শুধু একটা সুযোগ।

পুতলী সে চিঠির উত্তর পায়নি। অনেকদিন অপেক্ষা করেছে তবুও পায়নি। এ তার ভাগ্যেরই লিখন যে তার শেষও হয়তো হবে ডাকাতরূপেই।

দশ

সেদিন আসগরীবাঈ-এর বাড়ি থেকেও চুপচাপ মাথা নিচু করে চলে এসেছিলাম। ঠিক তেমনিভাবে, যে রকম চলে এসেছিলাম উদিতপুরা গাঁ ছেড়ে রুক্মিণীর প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে। আসগরী কোনো প্রশ্ন আমায় করেনি, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। কিছু বুঝতে না পেরে তান্নোও দাদীর চোখের জল দেখে কেঁদে উঠেছিল। আর পুতলীর বোন তারা! চুপচাপ বসেছিল। অতিকষ্টে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে চোখের ইশারায় আমায় চলে যেতে বলছিল। চোখের নিচে গভীর কালি পড়েছে। মাঝে মাঝে ঘুসঘুসে জ্বর হয়। একটু একটু কাশি শুরু হয়েছে। তারা জানে তার কি হয়েছে। আমিও জানতাম। আমায় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বলেছে. "ভালোই হয়েছে, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। এসব দৃশ্য আমার আর বেশিদিন দেখতে হবে না।"

প্রশ্ন করেছিলাম আসগরীকে, "কোথায় আছে পুতলী এখন জানো কিছু?"

কথাটা বেফাঁসই বলা হয়েছিল বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু একবার কথা বলে ফেরত তো আর নেওয়া যায় না। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল আসগরীবাঈ, তার পর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

"তাই যদি জানতাম তাহলে কেঁদে কেঁদে অন্ধ কেন হতাম বলতে পার? আর যদি-বা জানতাম তা বলে কি তার সর্বনাশ ডেকে আনব?"

"কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করলে কোনো ক্ষতি তো আর হবে না। তাছাড়া আমি কিছু কিছু আন্দাজ করেছি সে আজকাল কোথায় আছে।"

আর ঠিক থাকতে পারেনি আসগরী। "যদি পারো শুধু একবার আমায় দেখিয়ে দাও দূর থেকে। পোড়ারমুখীকে শুধু একবার দেখব। দূর থেকে তাকে দেখাব এই তান্নোটাকে। তাকে শুধু বলব ক'দিন আর এটাকে বুকে করে রাখব। আমি তো আর পারি না।"

তারা বুদ্ধিমতী মেয়ে। মাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে ভিতরে। জল দিয়ে মুখ ধুয়ে মুছে আসগরী প্রকৃতিস্থ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তান্নোকে কাছে ডেকে টফির বাক্স দিয়েছি। হেসে তান্নো জিজ্ঞাসা করেছে, আবার আমি কবে আসব। বলেছি খুব শীগগীর আসব।

"বহোত জলদী ?"—বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞাসা করেছে।

"হাঁ, বহোত জলদী।"

"ফির মিঠাই লাওগে ?"

"যব যব আউঙ্গা মিঠাই লাউঙ্গা।"

"হামেশা ?"

"হাঁ, হামেশা।"

খুশিতে তান্নো হেসে গড়িয়ে পড়েছে। তারপর তান্নোকে আর আসগরীকে বসিয়ে ফটো নিয়েছি। যাবার আগে আসগরী এক পাশে আমায় ডেকে বলেছে, "আমায় পুতলীর একটা ফটো দাও। আমি কাউকে বলব না। বাক্সের এক কোণে রেখে দেব। শুধু মাঝে মাঝে একবার দেখব। কেউ জানতে পারবে না। আল্লাহ তোমার ভালো করবে।"

সেদিন আসগরীকে ফটো দিইনি বা দিতে পারিনি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বহোত জলদী তাকে ফটো দিব। তান্নোকেও বলেছিলাম বহোত জলদী তার জন্যে মিঠাই নিয়ে আসব। কিন্তু সে 'জলদী' যে এত 'জলদী' হবে তা তো জানতাম না।

ভেসে চলল পুতলী কল্লার সঙ্গে। একটার পর আরেকটা অপরাধ। কিন্তু কল্লার কাছে শেষবারের মতো যাবার আগে গেল

রূপার কাছে। সুলতানের বন্ধু ছিল রূপা। সম্মান করত সুলতানকে কিন্তু রূপা রাজী নয়। একে ব্রাহ্মণ তার ওপর কোনো মেয়েকে সে নিজের দলে রাখার ঝুঁকি নিতে পারবে না। তবুও মাসখানেক থেকে গেল পুতলী। রূপার দলে শুরু হলো দলাদলি। লুক্কা এসে রূপাকে দলের লোকেদের মনোভাব জানায়। মেয়েটার ভাগ্যই খারাপ। যে দলের সঙ্গে থেকেছে তারই সর্দার পুলিশের হাতে মারা পড়েছে। জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী রূপা এই ভয়ঙ্কর সঙ্কেত অগ্রাহ্য করতে পারল না। পুতলী সবই শুনল। একদিন রাতের অন্ধকারে আবার মিশে গেল "বেহড়ে"। তাই যখন রূপা মারা গেল, আসগরীবাঈ বোধ হয় সেদিনও একটু কেঁদেছিল। হাজার হলেও কিছুদিনের জন্যে তো ছিল পুতলী রূপার কাছে।

কল্লার কাছে ফিরে গেল পুতলী। কিন্তু কল্লা একটা প্রশ্নও করেনি কেন বা কোথায় সে গিয়েছিল। কোনোও সন্দেহও তার মনে জাগেনি। সেইরকমভাবেই বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। সুলতানের চেয়েও নিবিড় আলিঙ্গন! পুতলী নিজেকে বিলিয়ে দিল কল্লার কাছে। দুঃখ নয়, অনুশোচনায়ও না, আনন্দে। এত আনন্দ সে জীবনে কখনও পায়নি।

কিছুদিন পরেই নতুন ডাকাত দলের আবির্ভাব হলো। কল্লা-পুতলীর দল। কল্লার দলে এসে পুতলী পেল সমান অধিকার। ডাকাতি করতে গিয়ে দলের লোকেরা উল্লাসে চেঁচিয়েছে—"পুতলী কি জয়!" খিল খিল করে হেসে কল্লার বুকে ঢলে পড়েছে পুতলী। ডাকাতির সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। ইন্সপেক্টর জেনারেল সাহেবের আপিসের 'গ্রাফ' উঠতে লাগল ওপরের দিকে। কল্লা-পুতলীর দল পুলিশের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ডাকাতির পর ডাকাতি হয়। হত্যালীলা চলেছে অবিরাম, কিন্তু এনকাউন্টারের সুযোগ দেয় না এরা। বড়কর্তারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হুকুম হলো, যে রকম ভাবে পারো এনকাউন্টার কর দলের সঙ্গে। খবর আসে পুতলী এসেছে এ-গাঁয়ে। পুলিশ ছুটে যায়, কিন্তু কোথায় কি? কোথা থেকে পাবে পুতলীকে? মাথায় একরাশ ঘোমটা টেনে পুতলী হয়তো সেই গাঁয়েই কারোর বাড়িতে রান্নাঘরে বসে কুটনো কুটছে।

কিন্তু একদিন এনকাউণ্টার হলো গোরমী গাঁয়ের কাছেই 'বেহড়' এ। সবাইকার সামনে দাঁড়িয়ে পুতলী চালিয়েছে গুলী। দূর থেকে পুলিশের লোকেরা দেখছে দস্যুরানী পুতলীকে—এক হাতে কোলের ওপর রাখা একটি শিশু, অন্যহাতে রাইফেল। পাহাড়ার ছেলে সুরেন্দ্র। "বেহড়ে"ই হয়েছে তার জন্ম, "বেহড়ে"ই সে বেড়ে উঠেছে। আজ কোথায় সে, কেউ জানে না। জানলেও কেউ বলে না। আসগরী তার জন্যেও কাঁদে। আমায় বলেছিল, "মুঝে ঢুড় দেও কাঁহা হ্যায় ওহ্ বাচ্চা।" কোথা থেকে খুঁজে দেবো সুরেন্দ্রকে, বোঝে না আসগরী।

গোরমী গাঁয়ের "বেহড়ে" তখনও পুতলীর রাইফেলের গুলীর আওয়াজের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে কল্লা ফিরে তাকাল। পুতলীর হাত থেকে সুরেন্দ্র মাটিতে পড়ে গেল আর বাঁ হাতটা চেপে পুতলী ছুটে পালাতে লাগল। সাব-ইন্সপেক্টর ভাজেকারের অব্যর্থ নিশানা। বাঁ হাতের হাড় ফুঁড়ে চলে গিয়েছে গুলী। কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছে কল্লা পুতলীকে। চার মাইল সমানে তাকে বয়ে নিয়ে পালিয়েছে, গিরিপথের ওপর পড়েছে তাজা লাল রক্ত। পরদিন পুলিশের লোকে রক্তের ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে ধাওয়া করেছে; কিন্তু পায়নি কাউকে। সারা রাত কাছের এক গাঁয়েই পুতলী পড়ে থেকেছে অজ্ঞান হয়ে। পুলিশের ভয়ে যন্ত্রণায় চেঁচাতে পর্যন্ত পারেনি।

তারপর দু'মাস পুতলীর আর কোনো খোঁজ নেই। পুলিশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু বেশিদিন আর বিশ্রাম করতে হলো না। একদিন খবর এল খিতোলী গাঁ থেকে। সেখানে কল্লার দলের আবির্ভাব হয়েছে। চারটে প্ল্যাটুন দিয়ে গাঁ ঘিরে ফেলা হলো। সাব-ইন্সপেক্টার ভাজেকার নিজে চললেন প্রত্যেকটা বাড়ি সার্চ করতে। দুটোর বেশি বাড়ি সার্চ করতে তাঁকে হয়নি। তৃতীয় বাড়ির বারান্দায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা রাইফেলের গুলী জানলা থেকে এসে তাঁর বুকে লেগেছে। উঠবারও সময় পাননি তিনি। মরার আগে শুধু নাকি বলে গিয়েছিলেন তাঁকে যে মেরেছে সে পুতলী। এ-ও বলেছিলেন, পুতলীর বাঁ হাতটা কাটা হয়েছে। সে কাটা বাঁ হাতের ওপর রাইফেল রেখে গুলী

চালিয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করেনি ভাজেকারের কথা। পরে রূঢ় সত্য তাদের ভুল ভাঙিয়েছে। কানাইপুরায় যখন কিছুদিন পরে আবার এনকাউন্টার হলো, কল্লা-পুতলীর দল তখন সবে খেতে বসেছে। পালাবার সময় ফেলে গিয়েছে শালপাতার উপর না খাওয়া রুটি আর তরকারি। আর পাওয়া গিয়েছিল পুতলীর লিপস্টিক।

কেউ জানতে পারেনি কবে পুতলী গোয়ালিয়র না লক্ষ্ণৌ গিয়ে এক বিখ্যাত ডাক্তারের কাছ থেকে নিজের হাত কাটিয়ে এনেছে। ডাক্তারকে পারিশ্রমিক দিয়েছে বাইশ হাজার টাকা। হাত কাটাবার পরে পুতলী হয়ে উঠেছে আরো নিষ্ঠুর আরো নির্মম। হত্যা আর ডাকাতির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫৭'র ডিসেম্বর মাসে পর পর দু'দিনের ডাকাতিতে পুতলী লুট করেছে ৭৫০০০৲ টাকা। ভিণ্ড, মোরেনা, শিবপুরী, গোয়ালিয়র, চার জেলায় ছেয়ে পড়েছিল কল্লা-পুতলীর আতঙ্ক। এক দিকে কলা-পুতলী আর অন্য দিকে লাখনসিং। ঠিক হলো আগে লাখনসিংকে শেষ করা যাক তার পরে দেখা যাবে কল্লা-পুতলীকে।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৮ সাল। মোরেনায় খবর এসেছিল, লাখনসিং কোঁথাড় গাঁয়ে কয়েকটা খুন করার জন্যে আসছে। পুলিশ ফোর্স পাঠানো হলো কোঁথাড়ে আর লাখনসিং-এর সব পালাবার পথ বন্ধ করে রাখা হলো। কাছেই কুঁয়ারী নদী। কুঁয়ারীর ওপারেও রাখা হলো এক প্ল্যাটুন। 'আড়োশী' বেহড়ের কাছে থাকল আর-একটা দল। সেঁউনিয়া, লেপা, সান-গোলী সব গাঁয়েরই চারদিকে পুলিশ। তরস্‌মা গাঁ, তাপরই ছোলার ক্ষেত। আর-একটু দূরে 'বেহড়' আর তারপরই কুঁয়ারী নদী। এক-এক মিনিটকে মনে হয় এক-এক যুগ। প্রতীক্ষা করছে পুলিশের দল। আজ যদি লাখনসিং-এর দলকে কাবু করতে পারে পুলিশের দল তাহলে চম্বলের সবচেয়ে বড় অভিশাপ তারা মুছে ফেলতে পারবে। আশঙ্কায়, আশায় আর উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে সবাই।

উত্তরের জঙ্গলের কাছে হঠাৎ দেখা গেল আট-দশজন লোককে। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক থেকে অগ্রসর হলো পুলিশ ফোর্স। কিন্তু একি? কার এত সাহস যে পুলিশের এত বিরাট দলের ওপর

প্রথমে গুলী ছোড়ে? এ তো লাখনসিং নয়! কে তাহলে? ঐ যে দূরে দাঁড়িয়ে একা রাইফেল ছুঁড়ছে। কমাণ্ডার কৈলাস সিং-এর কানে হঠাৎ গেল সিপাইদের চিৎকার, "হুজুর পুতলীবাঈ।" পুতলীবাঈ? কৈলাস সিং উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। একি হলো? লাখনের জন্য পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে দস্যুরাণী পুতলী! মুহূর্তের মধ্যে শুরু হলো আক্রমণ। কল্লা দেখল বিপদ। দলকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলল। পুতলীর কাছে থাকল দশজন লোক আর সে নিলো মোটে পাঁচজনকে জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদের সামনে দাঁড়িয়েও কল্লা প্রথমে পুতলীকে বাঁচাবার কথাই ভেবেছে। কিন্তু এত পুলিশের সামনে কি করতে পারবে তারা? "ভাগো পুতলী ভাগো।" পালাতে বলল কল্লা সবাইকে। কিন্তু কোথায় পালাবে? চারদিকে থেকে গুলী আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। এক-এক গজ করে পালায় পুতলী। পেছনে ফিরে চায় আর রাইফেল চালায়। পালায় আর রাইফেল চালায়। সামনেই ছোলার ক্ষেত। পালাল পুতলী দলবল নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। একটা কোনো 'কভার চাই। কিন্তু কোথায় 'কভার'। ক্ষেতের মধ্যে ভাঙা দেওয়াল, তাও পুলিশের হাতে। ছুটল পুতলী পাগলের মতো 'বেহড়ের' দিকে। পেছনে ফিরে তাকাল একবার। ছোলার ক্ষেত রক্তে ভেসে গিয়েছে। তার দলের নয়জন লোকের রক্ত। মৃত্যু-যন্ত্রণায় তারা কাতরাচ্ছে। পুলিশ ছুটে আসছে। কাছে, আরো কাছে। পুতলী ছুটল সামনের দিকে। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে 'বেহড়'। শুনতে পাচ্ছে—সর্বনাশা কুঁয়ারীর ডাক। আরেকটু। আরেকটু এগোলেই তার সব বিপদ কেটে যাবে। এক ঝাঁপ কুঁয়ারীতে, ব্যস তার পরেই ওপার। আর কল্লাও বোধহয় পালিয়ে আসতে পারবে। বেহড়ের ওপর উঠে দাঁড়াল পুতলী। নিচে, প্রায় একশো ফুট নিচে বয়ে চলেছে কুঁয়ারী। একমুহূর্ত ভাবল পুতলী, তারপরই দিল ঝাঁপ। যখন পুলিশের দল বেহড়ের ওপরে এসে পৌঁছেছে, পুতলী তখন মাঝ-দরিয়ায়। দম ফুরিয়ে আসছে, তবুও সাঁতরে চলেছে। কত দূরেই বা ওপার? ঐ তো দেখা যাচ্ছে, চিকচিক করছে বালি। কিন্তু একি মাথাটা ঘুরছে কেন? শরীরটা এত ভারি লাগছে কেন? আর পারে না

পুতলী এক হাত দিয়ে সাঁতরাতে। আস্তে আস্তে এক হাত দিয়ে খুলে ফেলল ফুলপ্যান্ট আর জ্যাকেট, আবার চলল সাঁতরে নূতন উদ্যমে। আর মোটে দশ গজ। মোটে পাঁচগজ। খানিকটা ডুব-সাঁতার দিয়ে পুতলী আরেকটু এগিয়ে গিয়ে উঠল। 'বেহড়ে'র বুক চিরে, কুঁয়ারীর শান্ত ঢেউ-এর ওপর শুধু একটা আওয়াজ ভেসে এল—"সুই—"। পুতলী চোখে অন্ধকার দেখল। বুকের ভিতর দিয়ে কি যেন চলে গেল। বুকের কাছে কুঁয়ারীর জলটা হয়ে উঠল টুকটুকে লাল। ওপারটা সরে গেল দূরে অনেক দূরে। পুতলীর চোখের সামনে সব ঘুরতে লাগল। পঁচিশ-তিরিশটা মৃতদেহ তার সামনে। তারা যেন অট্টহাস্য করে উঠল তার কানের কাছে। আরো সব চেনা-অচেনা মুখ ঘুরতে লাগল তার চোখের সামনে—সুলতান, বাবুলোহারী, রূপা, কল্লা আসগরীবাঈ, তারা, তান্নো, সুরেন্দ্র, সাব-ইন্সপেক্টর ভাজেকার এবং আরো অনেকে।

জলের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল পুতলী। আর কখনও উঠবে না। কয়েক জোড়া শক্ত বাহু তাকে জল থেকে টেনে ওঠাচ্ছে। কই, এতো সুলতান আর কল্লার শক্ত বাহু নয়? তবে কি পুলিশ? তাহলে পুলিশ ওপারেও ছিল। তার মৃত্যু যে কুঁয়ারীর পারে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল তা তো জানতো না পুতলী। বুকের কাছটা ভীষণ জোরে ব্যথা করে উঠল। জলটা লাল হয়ে উঠল। বেহড়ের বুকে তখন নেমেছে ঘন কালো অন্ধকার।

আসগরীবাঈ আর তান্নোকে বলেছিলাম 'বহোত জলদী' আসব। আসগরীবাঈকে কথা দিয়েছিলাম তাকে পুতলীর ফটোও দেব। সাত দিনও বোধ হয় হয়নি, নিজেই আবার গেলাম মোরেনা শহরে সেদিন। সারা শহর ভেঙে পড়েছে দস্যুরানী পুতলীকে দেখতে। সেই হাজার হাজার কৌতূহলী জনতার ভিড়ের এক কোণে আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। জনতার গোলমালের মধ্যে থেকে ভেসে এসেছিল একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার। জানতাম ছুটে আসছে পুতলীকে দেখতে তার মা আসগরী, তার বোন তারা আর মেয়ে তান্নো। চুপচাপ এক কোণে সরে এসেছিলাম। পকেটে-রাখা পুতলীর ফটোটা হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলাম। হাতের টফির বাক্সটা লুকিয়ে রাখলাম সযত্নে। মোরেনা থেকে চুপচাপ চলে

যাব কি ? কি করে আসগরীকে তার নয়নের পুতলীর এই বীভৎস ফটো দেব ? অনেকক্ষণ আনমনা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, কখন যে তান্নো পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জানতেও পারিনি। গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনাল নিজের কাছেই, যখন বোকার মতো তান্নোকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঠাই লেওগী তান্নো ?"

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তান্নো, "নহী আজ ম্যায় কুছ নহী খাউঙ্গী।" ভিড় চিরে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে আসগরীবাঈ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কদম সাহেবের পায়ে আছড়ে পড়ল, "মুঝে কুছ নহী চাহিয়ে। মুঝে মেরী পুতলী কো দে দো সাহাব।" কিছু না শুধু পুতলীকে ফেরত চায় আসগরী। কদম সাহেব উপরওলাদের হুকুম জানালেন পুতলীর লাশ আত্মীয়দের দেওয়া হবে না। ডুকরে কেঁদে উঠল আসগরী, যখন পুতলী আর ন'জন ডাকাতের লাশ নির্মমভাবে পুলিশ লরীতে ফেলে নিয়ে যাওয়া হলো কোনো অজ্ঞাত জায়গায়। দস্যুরানী পুতলীর হলো শেষ। কেউ গাইলো না গান। কোনো ঘুঙুর বাজল না কোথাও। কোনো সারেঙ্গীতে কেউ দিল না টান আর কোনো তবলাতে পড়ল না তাল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা যখন ধীর পদক্ষেপে আসগরীবাঈ-এর বাড়ির দিকে গিয়েছি মোরেনা শহরের সেই কুখ্যাত গলি ছিল অন্ধকার। পুতলীকে সম্মান দিয়েছে তার নিজের লোকেরা। তার জন্যে কেঁদেছে মোতিবাঈ, মালিকা, ফুলবাঈ এবং আরো অনেকে। তার সম্মানে তারা আজ জ্বালায়নি ঘরে বাতি। তবলা, সারেঙ্গী, ঘুঙুর সরিয়ে রেখেছে একপাশে। ম্লান মুখে ফিরিয়ে দিয়েছে নাম জানা, না-জানা অনেক খরিদ্দারদের। তাদেরই একজন তো ছিল পুতলী। তার জন্য এতটুকুও করবে না তারা ?

যখন আসগরীর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি, সে তখনও কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলে গিয়েছে। "ফোটো লায়ে মেরে লিয়ে ?" জিজ্ঞাসা করেছে আসগরী। কোনো কথা বলতে পারিনি সেদিন। চুপচাপ পকেট থেকে ফটোটা অন্ধকারে আসগরীর হাতে দিয়ে আর টফির বাক্সটা খাটের এক কোণে রেখে চলে এসেছি মোরেনা শহর ছেড়ে। তারপর অনেকদিন যাইনি মোরেনাতে। ভয় হতো যদি আসগরী সেই ফটোটা আমায়

দেখিয়ে বলত, "এই ফটো চেয়েছিলাম তোমার কাছে?" তখন কি উত্তর দিতাম। ভেবেছিলাম একদিন আসগরী, তান্নো আর তারা আমাকে ভুলে যাবে আর আমিও তাদের ভুলে যাব। ওরা আমায় ভোলেনি। আমার ভুল ভাঙল সেদিন, যখন কাজের তাগিদে আমায় আবার যেতে হয়েছিল মোরেনা শহরে। সেদিন (১৫ই মে, ১৯৬০) সন্ধ্যেবেলায় আবার মোরেনার সেই কুখ্যাত গলির শেষপ্রান্তে আসগরীবাঈ-এর ভাঙা ঘরের সামনে দাঁড়ালাম।

"কৌন হ্যায়?" লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল বৃদ্ধা আসগরী। এই দু'বছরে অনেক বদলে গিয়েছে। চোখের জ্যোতি হয়েছে ক্ষীণ চুলগুলো গিয়েছে সব পেকে। দারিদ্র্য আর শোক ছেয়ে রয়েছে সারা চেহারায়। ভেবেছিলাম চিনতে পারবে না আসগরী। লণ্ঠনটা মুখের কাছে এনেই চেঁচিয়ে উঠল, "আরে সাহাব্ আপ? আইয়ে আইয়ে।" ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে অনেক দিনের পুরনো "শের" মনে পড়ে যায় আসগরীর। নিজের মনেই আওড়ায়ঃ

"বহ আয়ে ঘরমে হামারে
খুদা কি কুদরত হ্যায়
কভী উনকো কভী আপনে
ঘর কো দেখতে হ্যায়।"

"আরে তান্নো, আরে তারা, দেখতো কোন্ আয়ে হ্যাঁয়।" চেঁচিয়ে ডাকে সবাইকে আসগরী। ঘুম থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে আসে তান্নো। অনেক বড় হয়েছে। চোখটা টেরা ছিল, এখন আবার সাধারণ অবস্থায় ফিরেছে। মুচকি হাসে তান্নো।

"কুঁ্য পহছানা মুঝে।" জিজ্ঞাসা করি তান্নোকে, আমায় চিনতে পেরেছে কিনা। খানিকক্ষণ মিটমিট করে চেয়ে থাকে তান্নো, তারপর হঠাৎ আমার হাতের টফির বাক্সটার ওপর নজর পড়তেই চেঁচিয়ে ওঠে, "মিঠাইওয়ালে সাহাব।" স্কুলে পড়ে তান্নো। মা'র নাম জিজ্ঞেস করলে বলে, "পুতলীবাঈ।" আমার হাত ধরে তান্নো টেনে নিয়ে যায় পাশের একটা ঘরে। দেওয়ালে ছোটো একটা কুলুঙ্গী। লাল ভেলভেটের পর্দা দিয়ে ঢাকা। পর্দাটা

সরিয়ে দিয়ে তান্নো একপাশে দাঁড়াল। একটু চমকে উঠেছিলাম। কুলুঙ্গীর মধ্যে রাখা হয়েছে আমার দেওয়া পুতলীর সেই মৃতদেহের ফটো। সামনে জ্বলছে প্রদীপ আর ধূপ। ফটোয় ঝোলানো মালা আর কাছেই রয়েছে রামায়ণ। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারিনি ঘরের মধ্যে। পর্দা টেনে দেবার আগে তান্নো মা'র ছবিকে করল প্রণাম। ফিরে আসতে আসগরী বললে, দু'বেলা পুজো করে তার মা'র ছবিকে তান্নো।

"কিন্তু রামায়ণ কেন? তোমরা তো মুসলমান?" ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে কথাটা হাসিচ্ছলে বললাম।

"আরে আমরা আর কিসের মুসলমান? আমার 'ও' ছিল মুসলমান। সে তো প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। আর কি আছে বল? আমাদের আবার জাত, আমাদের আবার ধর্ম?" হেসে ওঠে বৃদ্ধা আসগরী।

"সেলাম সাহাব।" খুক্ খুক্ করে কাশতে কাশতে ঘরে এসে দাঁড়াল তারা। আরো খারাপ চেহারা হয়েছে। জোর করে টেনে আনে হাসি, "কৈসে হ্যাঁয় আপ?"

"শুকরিয়া, কৈসী হো তারা?" জিজ্ঞাসা করি।

"ব্যস, থোড়েই দিনকে মেহমান," হাসি-কান্নায় মিশিয়ে বলে তারা। আর কিছুদিন বেঁচে আছি আর কি? আসগরী কেঁদে ওঠে। ঘরে এসে দাঁড়ায় পুতলীর ভাই আল্লাদিয়া। দস্যুরানী পুতলীর ভাই আল্লাদিয়া মোরেনা শহরে আজ মজদুরী করে। যা কিছু উপার্জন করে, তাই দিয়ে করে সাহায্য আসগরীকে। আর যদি কখনও সখনও বিয়ে-শাদীতে বায়না পায়, তাহলে গান গেয়ে তারা কিছু উপার্জন করে। ভেবেছিল কোনো দিন সে মা'র পেশা নেবে না। কিন্তু সংসার চলে কি ক'রে? আর সংসার বলতে তো শুধু ঐ তান্নো। তার নিজের আর আসগরীর দিন তো ফুরিয়ে এসেছে। যদি এই মেয়েটা মানুষ হয়ে ওঠে, তাহলেই সব কষ্ট, সব দুঃখ সার্থক হবে।

আসগরীর কোঁচকানো গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে কিছুই চায় না। "আমি এই ছোটো মেয়েটার জন্য সব

করতে রাজী আছি। আমি দিল্লী যাব। আমি মাথা খুঁড়ে মরব। সবাইকে বলব এই মেয়েটার লেখাপড়ার বন্দোবস্ত তাঁরা যেন করে দেন। কত কিছুই তো হচ্ছে, শুধু এই ছোটো মেয়েটার একটু লেখাপড়ার ব্যবস্থা হবে না? আসগরী এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যায়। তারপরই আসগরী আমায় সেই প্রশ্ন করেছিল। সেই সনাতন প্রশ্ন, যা আমায় উদিতপুরা গাঁয়ে মানসিং-এর স্ত্রী রুক্মিণীও করেছিল। "ইস্ বাচ্চেকা ক্যায়া কসুর? আমি চুপ করে ছিলাম। কারণ এর উত্তর আমার কাছে নেই। অজানা আশঙ্কায় আসগরীর বুক কেঁপে ওঠে। তান্নোকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে জড়িয়ে ধরে বলে, যদি এই বাচ্চাটাও? আর বলতে পারে না আসগরী। নিজের মুখ নিজেই চেপে ধরে। "আগর ইসকা খুন ভী খোল গয়া সাহাব মেরা তো পায়ের কে নিচেসে তখতা নিকল জায়গা।" যদি এই মেয়েটারও রক্ত নেচে ওঠে? যদি 'বেহড়ে'র হাতছানি একেও টেনে নিয়ে যায়, তাহলে বৃদ্ধা আসগরীর আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। পায়ের তলার মাটি সরে যাবে।

মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে চলে এসেছিলাম সেদিন আসগরী আর তারাকে। কোনো দাম নেই আমার সান্ত্বনার, তা আমি জানি। কার কাছে যাবে আসগরী তার নাতনীর জন্যে। কে শুনবে তার কথা? কত দরখাস্ত, কত আর্জিই তো সে দিয়েছে। কই কি আর হলো? এখনও যে সবাই কথায় কথায় বলে, "ওহ্ জা রহী হ্যায় ডাকু পুতলী কি লড়কী আর মা।" তাই বিনোবা ভাবে যখন সেদিন এলেন মোরেনায়, আসগরী যায়নি তাঁর কাছে। "কি হবে গিয়ে?" আসগরী আমায় বলেছিল। "তবুও একবার তো যাও।" বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তবুও যায়নি আসগরী। "কৌন ক্যায়া দেগা মুঝ বদনসীব কো। জো হোগা আল্লা কি মর্জি।" আল্লার মর্জির ওপর সব ছেড়ে দিয়েছে আসগরী। কে আর তার মতো অভাগীকে কি দেবে?

একদিন হয়তো অনেকেই ভুলে যাবে পুতলীকে, কিন্তু আজ থেকে অনেক বছর পরেও চম্বল নদীর আশেপাশের গাঁয়ে গেলে শোনা যাবে পুতলী সুলতানের নামের 'আল্হা' গান। আর চিরকাল হয়তো সরকারী নথিপত্রে থাকবে এই ক'টা কথা :—

"In the villages of Central India, people will sing folk songs for years about the exploits of a willowy dancing girl who became a dacoit, and terrorised the countryside with murder and robbery. Death has wiped out our scores against her. Her cruelty and her ruthlessness will be forgotten, but what will be remembered is the fearless courage of this woman, who endured much and suffered much, but lived her own life as the gang leader of a desperate band of outlaws.

This brave but misguided woman lived her life without regret. Dancing girl, dacoit and nurse, she had drunk life to the dregs within the short period of 29 years"...

আর কল্লা? সেদিন 'আড়োশী' বেহড়ের কাছ থেকে পালাতে সে চায়নি পুতলীকে ফেলে, কিন্তু কি লাভ হতো সবাই মরে? দশজন তো গেল। আর সেও তো পায়ে গুলী লেগে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে পালাতে পেরেছিল মোটে পাঁচজন লোক নিয়ে। পুতলী গিয়ে তার সব কিছু শেষ করে দিয়ে গেল। তার দল গেল ভেঙে আর তার সঙ্গে তার হৃদয়ও ভাঙল। কিন্তু মোটে ছ'মাস। তারপরই আবার উঠে দাঁড়াল কল্লা।

এগারো

বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। জাওরা শহরে তখনকার মধ্যভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিং চলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরসিং রাও দীক্ষিত কুড়োচ্ছেন অনেক হাততালি আর প্রশংসা। মানসিংকে মেরে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রেখেছেন আর বাঁচিয়েছেন সরকারের মান-ইজ্জত। দীক্ষিতজী বক্তৃতা দিতে উঠলেন। পাঁচ মিনিটও বলা হয়নি, হঠাৎ কে যেন একটা টেলিগ্রাম তাঁর হাতে দিয়ে গেল। বক্তৃতা থামিয়ে টেলিগ্রাম পড়লেন। হাতটা একটু কেঁপে উঠল। বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। দীক্ষিতজী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ভুরু ত্রুটো কুঁচকে উঠল চিন্তায়। কি এমন লেখা ছিল টেলিগ্রামে যা মধ্যভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিচলিত করল?

বেশি কিছুই না। টেলিগ্রাম এসেছে পুলিশের কাছ থেকে। শুধু কয়েকটা সাধারণ কথা। এরকম টেলিগ্রাম তো প্রায়ই আসে। তবে আজ কেন দীক্ষিতজী এত চঞ্চল? বারবার টেলিগ্রামটা পড়েন। বিশ্বাস হয় না। কি করে হতে পারে।

"ফৌজদার সিং-এর মৃতদেহ নাগরার কাছে বেহড়ে পাওয়া গিয়েছে। আমাদের হাতে মরেনি। কে মেরেছে এখনও জানা যায়নি।"

এই কয়েকটা কথা লেখা ছিল। তাহলে কি দীক্ষিতজীর সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে? বড় জোরগলায় যে বলেছিলেন কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে শেষ করবেন। কি হবে এবার? কে মারল ফৌজদার সিংকে? তবে কি—

হ্যাঁ ঠিকই ভেবেছিলেন দীক্ষিতজী। ফৌজদার সিংকে মেরেছিল লাখন সিং। মিঃ রুস্তমজীর মন্টিক্রিস্টো লিস্টের লাল পেন্সিল দিয়ে নির্মমভাবে কাটা নামগুলোর মধ্যে যে নামটা এখনও বাকী আছে, যে-নামটা মাঝে মাঝে দেখে এখনও রুস্তমজী সাহেব অস্বস্তি বোধ করেন। সেই নাম লাখন সিং। যার নামে সারা চম্বল উপত্যকা কাঁপে। যার জন্যে রাতের পর রাত কুইন সাহেব ঘুমতে পারে না। লাখন সিং, যে আজ পর্যন্ত ২৫০ জনকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে। যার ভয়ে বৃদ্ধ রঘুবীর সিং ফোর্থ ব্যাটালিয়নের হেড কোয়ার্টার নাগরা ছেড়ে যেতে সাহস করে না। সেই লাখন সিং-ই মেরেছে ফৌজদার সিংকে। তাহলে লাখন কি জানতে পেরেছিল যে, তার বিশ্বস্ত অনুচর দুর্ধর্ষ ডাকাত ফৌজদার সিং চুপি চুপি পুলিশের দলে ভিড়েছে। তা কি করে সম্ভব! ফৌজদার তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। ফৌজদার যে তার ডান হাত। না, লাখন জানত না কোনো কথা। তাহলে সে ফৌজদারকে কেন মারল? বিখ্যাত দস্যু লাখন সিং-এর চরিত্রের সেই অসাধারণ দিকটা তুলে ধরবার জন্যে এই একটা ঘটনাই যথেষ্ট।

সে রাতে নাগরার কাছে হঠাৎ লাখনের দলের সঙ্গে হয়ে গেল পুলিশের এনকাউণ্টার। চারজন বাছা বাছা লোককে নিয়ে সে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাল। কিন্তু এই এনকাউণ্টার তো হবার কথা নয়। লাখন যে নাগরার কাছে ছিল সে কথা তো

কাকপক্ষীরও জানবার কথা নয়। তবে কি করে সম্ভব হলো? জীবনে এত বড় হার, এত ক্ষতি লাখনের কোন কালেই হয়নি। লাখন পালাচ্ছে আর ভাবছে। ভাবছে আর পালাচ্ছে। গভীর রাতে এসে পৌঁছল অন্য গাঁয়ে। দলের সবাই সন্ত্রস্ত। লাখন কারোর সঙ্গে কথাটি কইছে না। শুধু মুখে এক কথা, "ইয়ে দাবিশ হো কেয়সা গয়া"। কি করে এই এনকাউণ্টার হলো। জীবনে প্রথম সেদিন লাখন সিং মদ খায়। গাঁ থেকে মদ আনিয়ে সারারাত সে মদ খেয়েছে। দলের লোকেরা অবাক হয়ে দেখেছে তাকে। তার সেই ভয়ঙ্কর রূপ এর আগে আর তারা কখনও দেখেনি। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। লাখন তখনও মদ খাচ্ছে। সামনে বসে আছে বাকী লোকেরা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "বুঝেছি, কেউ ধোকা দিয়েছে। আমাদের মধ্যেই কেউ ধোকা দিয়েছে। পুলিশকে খবর দিয়েছে সে। কিন্তু কে সেই ধোকেবাজ।" পুবের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে আর মদ খেয়ে লাখন-এর চোখও হয়েছে টক্‌টকে লাল। সবাইকে তৈরি হতে বলল। রওনা হতে হবে। হয়তো পেছনে পুলিশ এখনও তাড়া করছে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল লাখন। সবাইকে দাঁড়াতে বলল এক লাইনে। পর পর দাঁড়িয়ে গেল সবাই—জ্বালা সিং, অভিলাখ সিং, ফিরঙ্গী, হুজুরী সিং, ফৌজদার সিং, প্রহ্লাদ, মহাবীর, মহারাজ সিং, এবং আরো সকলে। এক লাইনে দাঁড় করিয়ে লাখন তাদের সামনে পায়চারি করতে শুরু করল। মুখে সেই এক কথা; "কিসিনে ধোকা দিয়া, কোন হ্যায় ওহ্"। প্রায় আধ ঘণ্টা চলল পদচারণা। এক-একবার থামে একজনের সামনে। কিছুক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আবার শুরু হয় পায়চারি। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। হঠাৎ পকেট থেকে রিভলবার বের করে লাখন সিং গুলী করল ফৌজদারকে। ফৌজদার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দলের লোকদের মুখ থেকে শুধু বেরুলো অস্ফুট শব্দ। এ কি করলে লাখন! তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর ফৌজদারকে সে নিজের হাতে মারল! মৃত ফৌজদার সিং-এর মুখের ওপর থুথু ফেলে লাখন—"ইয়ে হ্যায় ওহ্ ধোকেবাজ"। এই সেই লোক যে ধোকা দিয়েছে। দ্বিতীয় কথা না বলে লাখন

হুকুম করল সবাইকে রওনা হতে। লাখন ভুল করেনি। সত্যিই ফৌজদার সিং তাকে ধোকা দিতে যাচ্ছিল। ফৌজদারের খবরেই এনকাউন্টার হয়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে।

লাখন সিং ভুল করে না। অনেকেই আমার কথা শুনে হেসেছে যখনই আমি বলেছি, লাখন সিং-এর "সিকস্থ সেন্স" আছে। হেসেছে সবাই কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছে অনেক। শুধু সিকস্থ সেন্স-ই না, "সেন্স অব ডেঞ্জার"—বিপদের অনুভূতিও তার অদ্ভুত। আশু বিপদের গন্ধ পায় লাখন। কতবারই তো হলো এনকাউন্টার কিন্তু লাখনের গায়ে আঁচও লাগেনি। হ্যাঁ, একবার পায়ে লেগেছিল গুলী। এখনও তার দাগ আছে কিন্তু তা শুধু আহত সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে ইচ্ছে করে বিপদের সামনে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিবারই লাখন পুলিশের গতিবিধি সম্বন্ধে খবর পেয়ে সচেতন হয়েছে। তার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সই শুধু এর জন্যে দায়ী নয়। লাখন সিং জানতে পারে বিপদ আসছে। অত ভেবে চিন্তে সাবধান হয়ে বোধহয় কেউ ডাকাতি করে না।

এখনও আমার সে রাতের কথা মনে আছে। সব ছবির মতো মনে হয়। অনেক কাটখড় পুড়িয়ে বন্দোবস্ত করেছিলাম একজনের সঙ্গে। যখন গাঁয়ে পৌঁছেছিলাম রাত প্রায় দশটা। রাত বারোটায় নাকি লাখন আসবে। দুরু দুরু বুকে বসেছিলাম। কি কথা বলব তার সঙ্গে? দেখা করাটা কি ঠিক হবে? যদি লাখন আমার কোনো ক্ষতি করে? কিন্তু রাত প্রায় দুটো বেজে গেল কোথায় লাখন? সবই বৃথা। প্রায় আড়াইটার সময় দশ বারোজন লোক পাশের গাঁ থেকে এল প্রত্যেকের কাঁধেই বন্দুক। বন্দুক প্রায় প্রত্যেকেই রাখে এদিকে। যে জায়গায় আমি বসেছিলাম আমার কণ্ট্যাক্টকে নিয়ে তারা সেখানে এসে বসল। সাদাসিধে চেহারা। সাধারণ পোষাক। যাক্, লাখন না আসুক এদের সঙ্গেই আড্ডা দেওয়া যাক। অনেকক্ষণ কথা হলো এদের সঙ্গে ডাকাতি সমস্যা নিয়ে। ছিলাম লাখনের এলাকায় তাই স্বভাবতই ঠাকুর লাখন সিং-এর সম্বন্ধেই বেশি আলোচনা হলো। এদের মধ্যে মাতব্বর গোছের লোকটাই বেশি কথাবার্তা বলছিল। শোনাচ্ছিল সব পুরোনো ইতিহাস। কি

করে "ঠাকুর" সাহেব ডাকাত হলো। কেন সে "বাগী" হয়েছে। কত কথা। ঠাকুর সাহেব নাকি অদ্ভুত লোক। প্রায় ছ'ফিট চেহারা। তা এরা সবাই তো লম্বা চওড়া। চরিত্রবান "ঠাকুর সাহেব" মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেয় না। এক রাতে একবার ৪০ মাইল হেঁটে পুলিশকে হকচকিয়ে দিয়েছিল। রাইফেল, টি. এম. সি., সব রকম অস্ত্র চালাতেই ওস্তাদ। মাথার ওপর প্রায় ৩০ হাজার টাকার পুরস্কার নিয়ে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থান তছনছ করে বেড়াচ্ছে। রূপার মতোই সে মানসিং-এর কাছে দীক্ষা পেয়েছিল "বাগী" হবার। কিন্তু মানসিং-এর জীবনকালেই সে তৈরি করেছে নিজের দল বাছা বাছা লোক নিয়ে। গল্প আর শেষ হয় না। আমার তখন ঘুম এসেছে। আর ভালো লাগছে না দস্যু সর্দারের তারিফ। হাই তুলতে তুলতে উঠলাম। পাশের গাঁয়ের মাতব্বরকে বললাম আবার একদিন শুনব তাদের ঠাকুর সাহেবের কথা।

"আচ্ছি বাত হ্যায়। ফির কভী। রাম রাম বাবুজী"।

"রাম রাম"।

চলে গেল পাশের গাঁয়ের লোকেরা। রাগে তখন আমার গাঁ রি রি করছে। আমার সঙ্গের লোকটাকে ধরে মারতে ইচ্ছে করছিল। শুধু শুধু সারারাত বসিয়ে বকাল। খুব এক চোট গালাগালি করলাম। নিজের কথার খেলাপই শুধু করেনি, আমার সময় আর অর্থ নষ্টও হলো তার ধাপ্পায় এতদূরে এসে। সব পণ্ডশ্রম। আমি তো আর লাখন সিং-এর গুণগান শুনতে আসিনি। এসেছি লাখন সিংকে দেখতে।

লোকটা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসতে লাগল। লজ্জা নেই। আবার হাসছে। বেটা বেইমানী করে আবার রসিকতা করছে। লোকটার হাসি আর বন্ধ হয় না। হো হো করে হেসেই চলছে। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

"বেবকুফ কে মাফিক্ হাসতা কুঁ্য হ্যায়?" রেগে প্রায় ফেটে পড়ি।

কে শোনে আমার কথা। লোকটা হেসেই চলল। বাবুজী ম্যায় বেবকুফ কি আপ বেবকুফ ?"

"উল্টা চোর কোতয়ালকো ডাঁটে।" চোর আবার কোতয়ালকে দেখায় চোখরাঙানি। উল্টে আমায় বলে বেবকুফ। সাহস তো কম নয়। ভয় হচ্ছে, লোকটাকে বেশি কিছু বলতেও পারছি না। যা সব লোক ভিণ্ড মোরেনার। কিন্তু লোকটকে খুন করতে পারলে খুব খুশি হতাম।

"বাবুজী আপ দো ঘণ্টা ঠাকুর সাহেবকে সাথে বাতচীত কিয়া আউর হামকো বোলতে হামনে ধোকা দিয়া। আরে ধোকা তো আপনে খায়া।"

লোকটা বলে কি! আমি দু'ঘণ্টা লাখন সিং-এর সঙ্গে কথা বলেছি? তবে কি? তবে কি? ঐ মাতব্বর গোছের লোকটা?

"জী। বহ্ই তো থা লাখন সিং—লোকটা এবার অট্টহাস্য করে ওঠে। ঐ মাতব্বর লোকটাই তাহলে লাখন সিং। ভালো করে একবার দেখলামও না। নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে যাই। কিন্তু যে ঠাকুর সাহেব এক রাতে ৪০ মাইল যেতে পারে, সে এখন কোথায় চলে গিয়েছে কে জানে?

কিন্তু দোষ কাকে দেব? দোষ না আমার, না আমার সাহায্যকারী লোকটার। দোষ ঠাকুর লাখনসিং-এর। এই তো লাখন সিং। এই সাবধানতার জন্যেই তো সে আজও পুলিশের চোখে ধোকা দিয়ে বেঁচে আছে। কতদিন থাকতে পারবে বলা কঠিন আজ প্রায় ১২ বছর ধরে তো বেঁচে আছে। মোটে ৩৭ বছর বয়সেই এমন বিভীষিকা হয়েছে সে, যে আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে কি করবে ভাবতেও ভয় লাগে।

আরেকবার হয়েছিল। সেবারেও "ঠাকুর সাহেব" আমায় ধোকা না দিলেও, "দর্শন" দেয়নি! খবর ঠিকই পেয়েছিলাম সেবারে। সন্ধ্যেবেলাই পৌঁছে গিয়েছিলাম গাঁয়ে। জটলা করে বসেছিলাম গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে বটগাছের নিচে। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছি। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ গাঁয়েরই একটা লোক উঠে দাঁড়াল। বন্দুক তুলে ধরে সবাইকে হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বসতে হুকুম দিল। লোকটার দিকে চাইতেই হেসে বলল, "হ্যাঁ বাবুজী আপভী।"

কতক্ষণ যে এরকম বসেছিলাম জানি না। হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে শুধু দেখতে পেয়েছিলাম প্রায় বিশ জোড়া পা। অতি ক্ষিপ্র-গতিতে চলে যাচ্ছে। ঠিক থাকতে পারিনি, চেঁচিয়ে উঠেছিলাম— "রাম রাম ঠাকুর সাহাব। বাবুজীকা রাম রাম।" একমুহূর্তের জন্যে, শুধু এক মুহূর্তের জন্যেই বিশ জোড়া পায়ের মধ্যে এক জোড়া পা হঠাৎ থেমে গেল। মৃদু আওয়াজ শুনতে পেলাম "রাম রাম"। তারপরই বিশ জোড়া পায়ের সঙ্গে সেই এক জোড়া পা-ও ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলল। হাঁটুর থেকে মাথাটা বের করতে গিয়ে অনুভব করছি বন্দুকের নলটা নেমে এসেছে ঘাড়ের ওপর। আবার নামিয়ে নিয়েছি। ইতিমধ্যে বিশ জোড়া পা হয়েছে অদৃশ্য। মাথা তুলেছি সবাই। গাঁয়ের লোকটা হেসে বলেছে, "মাফ্ করনা বাবুজী। ঠাকুর সাহাব কা হুকুম থা।" লাখন সিং দিয়েছে হুকুম। আশু বিপদের আশঙ্কায় সে সাবধানতা অবলম্বন করেছে। কোথা থেকে যেন খবর পেয়েছিল ঠাকুর সাহেব যে, গাঁয়ের দু'একজন লোক হয়েছে পুলিশের ইনফর্মার। তাকে সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তাই তার সতর্কতা। গাঁয়ের লোকটা আমায় এক ধারে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বলেছে, যে ক'জন আমরা বসে-ছিলাম বটগাছটার নিচে তার মধ্যেই ছিল পুলিশ ইনফর্মাররা। এখনও চেনা যায়নি তাদের। কিন্তু ক'দিন। ঠাকুর সাহেব ঠিক চিনে নেবে তাদের। তারপর? ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম সেদিন।

তার দু'দিন পরেই খবর পেলাম গাঁয়ের তিনজন লোককে নির্দয়ভাবে খুন করেছে লাখন সিং নিজে। সে ঠিকই জানতে পেরেছিল কারা পুলিশের "মুখবীর" (ইন্‌ফর্মার)। তারপরের বার যখন ঠাকুর সাহেব সেই গাঁয়ে এসেছে, সবাইকে বটগাছের নিচে আর বন্দুকের পাহারায় হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকতে হয়নি। কিন্তু আমার আর যাওয়া হয়নি সেই গাঁয়ে। গেলে হয়তো "ঠাকুর সাহেব" মৃদু হেসে বলতো, "রাম রাম বাবুজী।" আমি হয়তো বলতাম "রাম রাম ঠাকুর সাহেব।" কিন্তু ঠাকুর সাহেব আমায় ধোকা দিতে পারেনি। আরেকদিন পড়েছিল আমার খপ্পরে। চমকে উঠেছিল যখন কানের

কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিলাম, "রাম রাম ঠাকুর সাহেব।"

বিনোবা ভাবের প্রার্থনা সভায় সেদিন সন্ধ্যায় হয়েছিল হাজার হাজার লোকের ভিড়। প্রার্থনাসভা শেষ হবার পরও জনতার ভিড় ছিল সারা জায়গাটা ছড়িয়ে। ভিড় ঠেলে খুঁজছি আমার জীপটা। একপাশে হঠাৎ নজর গেল। থমকে দাঁড়ালাম। না কোনো ভুল নেই। আধরাতে দেখা গাঁয়ের সেই মাতব্বরকে কি ভুল করতে পারি? চোখ নামিয়ে দেখলাম পায়ের দিকে। কবে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে দেখা বিশ জোড়া পায়ের মধ্যের এক জোড়া পা। কিন্তু গোড়ালির ওপরেই গুলীর দাগটা তো আর মুছে যাবে না। ভিড় ঠেলে পাশে দাঁড়ালাম। কানের কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিলাম, "রাম রাম ঠাকুর সাহেব"।

রাম রাম…"। এক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'জোড়া চঞ্চল চোখ চারিদিকে ঘুরে গেল আর ডান হাতটা এক লহমায় কোমরে ধুতির কাছে রাখা একটা শক্ত জিনিসের কাছে চলে গেল। "রাম রাম বাবুজী" ঠাকুর সাহেবের মুখে মৃদু হাসি।

জনতার ভিড়ের চাপে এগিয়ে চললাম। বেশি কথা হলো না। ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো কথা। বললাম, তার গাঁ "নাগরা" গিয়েছিলাম। আবার থমকে দাঁড়াল ঠাকুর সাহেব। অনেকদিন যায়নি ঠাকুর সাহেব তার গাঁয়ে। অনেকদিন। যাবে সে খুবই শিগ্‌গির। তার যে এখনও ঠাকুর রঘুবীর সিং-এর সঙ্গে বোঝাপড়া বাকি আছে। সেটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। তার প্রতিশোধ সে নিয়ে নিক তারপর যা কিছু হোক কোনো "পরওয়া" নেই ঠাকুর সাহেবের।

নাগরায়, ঠাকুর সাহেবের বাড়ি আজ ভেঙে পড়েছে। সামনের দরজায় পড়েছে পুলিশের বিরাট তালা। ছাদ ধ্বসে পড়ে গিয়েছে। কে আর দেখবে?

"আপকা মকান তো বিলকুল টুটকে গির পড়া"।

আলোচনার রেশ টানতে গিয়ে বললাম ঠাকুর সাহেবকে তার ভাঙা বাড়ির অবস্থা।

আবার মুহূর্তের জন্যে থামল "ঠাকুর সাহেব।" সে দৃশ্য আমি

জীবনে ভুলব না। কেউ দেখেছে কিনা জানি না কিন্তু আমি সেদিন দেখলাম দুর্ধর্ষ দস্যুসর্দার যে নিজে হাতে প্রায় ২০০ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে সেই লাখনসিং-এর চোখে জল। বাড়ির জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠেছে তার। ছল ছল চোখে একবার আমার দিকে চাইল। তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল ঠাকুর সাহেব। একি করলাম! এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে হারালাম। কেন বলতে গেলাম তাকে তার বাড়ির কথা। কিন্তু আমি কি জানি, পুলিশের ভাষায় যাকে বলা হয় "the great homicidal maniac", সেই লাখন সিং একটা ভাঙা বাড়ির জন্যে কাঁদবে। ভিড় ঠেলে খুঁজেছি অনেক। কোথায় পাওয়া যায় সেই গাঁয়ের মাতব্বরকে? কোথায় দেখা যায় সেই বিশ জোড়া পায়ের মধ্যে এক জোড়া? সে হয়তো এখন চলে গিয়েছে নাগরার দিকেই। কিন্তু নাগরায় তো ফোর্থ ব্যাটালিয়নের হেড কোয়ার্টার। আর কোনো দিন হয়তো দেখা হবে না ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে। হয়তো হবে সেদিন, যখন ঠাকুর সাহের আর "রাম রাম বাবুজী" বলতে পারবে না। হয়তো সেদিন, যখন রুস্তমজী সাহেবের মন্টিক্রিস্টো লিস্ট থেকে লাল পেন্সিল দিয়ে তার নামটা নির্মমভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে।

বারো

আমার সব কথা না শুনেই সেদিন 'ঠাকুর সাহেব' চলে গিয়েছিল। সব কথা তো বলা হয়নি আমার। বলার সময় কোথায় দিল আমায়! ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু আমার আর সব কথা শুনলে কি করত লাখন সিং? যে মানুষটা নিজের ভাঙা বাড়ির কথা শুনে কেঁদে ফেলে সে আমার জানা বাকী সব কথা শুনলে কি করত! আমার সব কথা বলা হয়নি, কিন্তু ঠাকুর সাহেব কী এখনও জানতে পারেনি যে, উত্তরপ্রদেশের জালোন জেলার ছোটো গাঁ আকবরপুরাতে তার স্ত্রী আজ মৃত্যুশয্যায়! সে কি জানে তার স্ত্রী তাকে দেখবার জন্যে কি আকুলি-বিকুলি করছে! লাখন কি এও

জানে না ভাদাপুর গাঁয়ে তার বৃদ্ধা মা রোজ কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। আর তার বড় ভাই মালখন সিং, যে শত প্ররোচনা ও প্রলোভনের মধ্যেও বাকী চার ভাইয়ের মতো 'বেহড়ে'র হাতছানিতে ভোলেনি? কিন্তু মালখন সিং তো ছোটো ভাই লাখনকে ঘৃণা করে না। সে জানে লাখন ভুল করেছে, মস্ত বড় ভুল করেছে। কিন্তু হাজার হলেও নিজের ভাই তো। এক মায়ের দুধ খেয়ে দু'জনে একসঙ্গে বড় হয়েছে। নাগরার কাছেই বেহড়ে খেলে বেড়িয়েছে দু'জনে একসঙ্গে। "আখির মেরা ছোটা ভাই হ্যায় সাহাব। এক মাকা দুধ পিয়া হ্যায় হামনে"—আমায় বলেছিল মালখন সিং।

চুপচাপ চোরের মতো ভিণ্ডের পুলিশ সুপার মিঃ পাহুজার ঘরে ঢুকেছিল মালখন সিং। কুণ্ঠিত ভাব, চোখে ভয়। যেন সে নিজেই দোষী। অবাক হয়ে দেখছিলাম তার দিকে। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন দস্যু লাখন সিং-এর ভাই-এর এই নিরীহ চেহারা! কোণে রাখা বেঞ্চির একধারে বসেছিল মালখন সিং। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে ধীরে ধীরে। মিঃ পাহুজাকে মিনতি জানায় মালখন সিং। যদি কোনো রকমে লাখন সিং বিনোবা ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে সে জীবনে সবচেয়ে খুশি হবে। শুধু লাখনই নয়, তার আরেক ভাই ফিরঙ্গী সিং, সেও তো লাখনের সঙ্গে রয়েছে। তারও উচিৎ আত্মসমর্পণ করা। নয়তো কোনোদিন পুলিশের গুলীতে দু'জনেই 'বেহড়ে' প্রাণ দেবে।

"মরনে দেও। তুমহারা কেয়া?" মালখনকে বলেছিলাম।

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়েছিল মালখন। তারপর ধরা গলায় বলেছিল আমায় আর পাহুজাকে অবাক করে—"ক্যায়া বাত করতে হো সাহাব, আখির মেরা ছোটা ভাই হ্যায়। এক মা'কা দুধ পিয়া হ্যায় হামনে।"

কিন্তু লাখন তো জানে না এই সাক্ষাতের কথা। আমাকে বলবার সুযোগ আর সময়ই দেয়নি সে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কোনো কালেই জানবে না হয়তো তার স্নেহপ্রবণ দাদার কথা আর সেই যে "এক মা'কা দুধ পিয়া হ্যায়," সেই মা'র কথা। আমি কিন্তু এর জন্যে দায়ী নই। যত দুঃখই 'ঠাকুর সাহেব'

সেদিন পেতো আমি সব কথা বলতাম। শুধু একজনের কথা বাদ দিতাম। তার কথা তো লাখনকে বলার কোনো মানে হয় না। সে নিজেই সব জানে। প্রায়ই তো যায় সে পাগুরী গাঁয়ে। অন্য সময় দূরে থাকলেও রাখী পূর্ণিমার দিন তো লাখন পাগুরী গাঁয়ে তার বোন সোনচিড়াইয়ার কাছে হাজার বিপদ তুচ্ছ করেও যাবেই। সোনচিড়াইয়া (সোনার পাখি)-কে এত ভালবাসে লাখন যে তার কাছ থেকে বেশি দিন বেশি দূর তো সে থাকতে পারে না। সোনচিড়াইয়া যে তার ভাইয়ের গর্বে গর্বিতা। অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল সোনচিড়াইয়া। কিন্তু তার কথা লাখনকে বলে তো কোনো লাভ নেই। লাখন নিজেই জানে সব কথা। আর না জানলেও সোনচিড়াইয়া নিশ্চয়ই তাকে বলেছে "ভোপাল সে এক আংরেজী আখবারওয়ালা" তার কাছে এসেছিল। তাই সেদিন "ঠাকুর সাহেব" ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে না গেলেও তাকে আমি সোনচিড়াইয়ার কথা বলতাম না।

কিন্তু রঘুবীর সিং-এর কথা তাকে আমি নিশ্চয় বলতাম। সারা দুনিয়াতে বোধ হয় রঘুবীর সিং-এর মতো লাখনকে আর কেউ অত ঘৃণা করে না। লাখন নিজে জানে একথা। তার জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু। লাখন মনে করে রঘুবীর সিং-এর জন্যেই আজ সে "বাগী।" লাখন এটাও জানে একদিন রঘুবীর সিং-এর সঙ্গে তাকে শেষ বোঝাপড়া করতেই হবে। হয়তো লাখন এও জানে যে, ভারতবর্ষে বোধ হয় রঘুবীর সিং-এর মতো সুরক্ষিত লোক আর নেই। একটা পুরো পুলিশ ব্যাটালিয়ন—কুইন সাহেবের ফোর্থ ব্যাটালিয়ন—তাকে রক্ষা করে রেখেছে কয়েক বছর ধরে। রঘুবীর সিং-এর পরিবারের প্রায়ই সবাইকেই বলি হতে হয়েছে লাখনের প্রতিহিংসার ভীষণ আগুনে। যে কয়েকজন বেঁচে আছে তারাও রয়েছে পুলিশের সতর্ক পাহারায় গোয়ালিয়র শহরে। হাজার হলেও রাজপুত রক্ত তো, তাই নিজে যেতে পারেনি আর যেতে পারেনি তার জামাই ভীকম সিং। পুলিশের আশ্রয়ে পড়ে রয়েছে মোরেনা জেলার নাগরা গাঁয়ে।

নাগরা। নাগরা, যেখানে আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও কোনো পুলিশের লোক যেতে সাহস করত না। নাগরা, যেখানে

যে-কোনো বাড়ির পিছনের দরজা খুললেই "বেহড়"। পুরো গাঁটাই "বেহড়ে"র ওপর তৈরি হয়েছে। নাগরা, যেখানে আজও দাঁড়িয়ে আছে শীতলা-মাইকী মন্দির। সে মন্দিরে আজো গেলে দেখতে পাওয়া যাবে মন্দিরে টাঙানো বিরাট বিরাট ঘণ্টা। ঘণ্টা টাঙিয়েছে লাখন সিং, তার ভাই বিশ্বম্ভর সিং, আর ভাইপো হুজুরী সিং। নাগরা যেখানে আজও কোনো রকমে টিকে আছে লাখন সিং-এর ভাঙা বাড়িটা। নাগরা, যেখানে রয়েছে ঠাকুর রঘুবীর সিং-এর বিরাট বাড়ি "হাভেলী"। হাভেলীর দেওয়ালে এখনও রয়েছে গুলীর দাগ। সেই নাগরা গাঁয়েই আজ থেকে ৩৭ বছর আগে জন্ম হয়েছিল এক সমৃদ্ধ "তোমর" রাজপুত পরিবারে ঠাকুর লাখন সিং-এর।

মোরেনা থেকে পোরসা—"বেহড়"-এর মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে প্রায় ৩০ মাইল রাস্তা এঁকেবেঁকে চম্বল আর কুঁয়ারী নদীর কোল ঘেঁষে। পোরসায় গেলে এখনও বৃদ্ধ রতনলালের সাথে দেখা হবে। ষাট বছরের বৃদ্ধ রতনলাল, কিন্তু সব কথা তার মনে আছে। ছ'ফুট দীর্ঘ চেহারা। ধোলপুর রাজ্যে ডাকাতি করার জন্যে পঞ্চাশ বছরের জেল হয়েছিল। অবশ্য দশ বছর পরে ছাড়া পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বলবে তার মনে নেই ক'টা খুন সে করেছে। হবে হয়তো দশ-বিশটা। কে আর এই সব ছোটো ছোটো কথা মনে রাখে। আজ রতনলাল পোরসার নামকরা লোক। বেশ কয়েক বিঘা জমি আছে। এই তো সেদিন আচার্য বিনোবা ভাবেকে ভূদানে কিছু জমি রতনলাল অনায়াসে দিয়ে দিল। সেই রতনলালকে জিজ্ঞেস করলেই বলবে পোরসা আর নাগরার কথা। রতনলালই তো আমায় বলেছিল আগে নাকি পোরসা ছিল উট আর হাতী চুরির প্রধান আড্ডা। আর সেই সব চুরির মাল যেত পোরসা থেকে নাগরা। রাস্তা তো আর ছিল না, এঁকেবেঁকে বেহড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো প্রায় বারো মাইল। তারপরেই নাগরা আর নাগরা থেকে আজকের উত্তরপ্রদেশ। আজই না নয় পোরসা থেকে নাগরা পর্যন্ত রাস্তা হয়েছে। হয়েছে বললে ভুল হবে। আজ প্রায় দশ বছর থেকে হচ্ছে। সেই দশ বছর আগে ভারত সরকারের মন্ত্রী কাকা সাহেব

গ্যাডগিল এসেছিলেন রাস্তা তৈরির উদ্‌ঘাটন সমারোহে পৌরোহিত্য করতে। সেই থেকে তৈরি হচ্ছে রাস্তা, আজও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি।

পোরসা থেকে মাইল সাতেক পর্যন্ত আছে রাস্তার নামে একটা প্রহসন, কিন্তু তারপরে আর কিছুই নেই। খেতখামার ভেঙে আল পথ দিয়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে নাগরায়। গাঁ কে গাঁ বেহড়ের উপর তৈরি। গাঁয়ের একটু দূরেই বিরাট একটা বাড়ি নাগরার লোকে বলে "হাভেলী।" ঠাকুর রঘুবীর সিং-এর 'হাভেলী'! এখন ফোর্থ ব্যাটালিয়নের কম্যাণ্ডাণ্ট কুইন সায়েবের "হেড কোয়ার্টার।" একটা লোকও যদি ডাকাতি বা খুন করে "বেহড়"-এ লাফিয়ে পড়ে, কুইন সায়েবের পুরো ব্যাটালিয়ন তাকে বেহড়ের সেই অজস্র অলি-গলিতে খুঁজে পাবে না। রাতে কুইন সায়েবের ঘরে ক্যাম্প খাটে শুয়ে মাঝে মাঝে চমকে উঠেছি। কোথা থেকে যেন কিসের একটা একটানা শব্দ হচ্ছে। উঠে বসেছি খাটের উপর, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হেসে উঠেছে কুইন বিরাট জোরে—"হোয়াট ম্যান, ইউ আর অ্যাফ্রেড?" কিছুই না। বেহড়ের উপর দিয়ে শো-শো করে বয়ে চলেছে চম্বল থেকে ভেসে আসা বাতাস। সব সময়েই চলে সেই বাতাস। রাতের নিস্তব্ধতায় শুধু শোনা যায়। কান পেতে শুনেছি সেই ভয়াবহ একটানা আওয়াজ। বেহড়ের বুকে এসে আছড়াচ্ছে চম্বলের হাওয়া। মনে হয়, শত শত অশরীরী প্রেতাত্মা বুঝিবা অট্টহাস্য করছে। আপনভোলা, দুঃসাহসিক কুইন সায়েব সেই রাতেই বিছানা থেকে উঠিয়েছে আমায়। "লেট আস গো টু দি র‍্যাভাইন্স। আই লাভ ইট।" বলে কি? এই রাত দুপুরে 'বেহড়'-এ ঘুরতে যাব? অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাচ্চা কুইন সায়েবকে কি করে বোঝাই যে, অত সাহস আমার নেই। তবু চুপচাপ নিশির ডাক শুনে লোকে যেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলে যায়, ঠিক তেমনিভাবে সে-রাতে কুইনের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম অভিশপ্ত চম্বলের বেহড়ে। আমার সামনে চলেছে কুইন, কাঁধে ঝোলানো রাইফেল। কুইনকে দেখাচ্ছিল একটা ছায়ামূর্তির মতো। বেহড়ের সেই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতায় শোনা যাচ্ছিল শুধু আমাদের

দু'জনের পায়ের আওয়াজ ধুপ—ধুপ—ধুপ। মাঝে মাঝে ভেসে এসেছে চম্বলের দুরন্ত হাওয়া। ভয় পেয়ে কুইনকে বলেছি, "লেট আস গো ব্যাক।" "নো ম্যান, ডোণ্ট বদার।" এখনও যখন ভাবি সেই নিশুতি রাতের কথা, অস্বস্তি বোধ করি। বেহড়ের সেই অন্ধকারের রূপ আমি কখনও ভুলব না। খানিকক্ষণ চলার পর আমার যেন নেশা ধরে গেল। কুইন অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, যখন ওকে বললাম—আরো চলো, আরো দেখব। বেহড়ের হাতছানি অনুভব করেছি। বেহড়ের নেশায় অভিভূতের মতো এগিয়ে চলেছি। রাস্তার বাঁকে ঘুরতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছি। সামনেই ভেসে উঠে অশরীরী প্রেতাত্মার মতো বিরাট একটা বেহড়। আবার এগোই, আবার বেহড়। প্রকৃতির অদ্ভুত আর অপরূপ এই চ্যালেঞ্জ যেন বলছে, "কোথায় যাবে? এস, আমার কাছে। এস, আমার সঙ্গে, আমি নিয়ে যাবো তোমায় অভিশপ্ত চম্বলে। যুগ-যুগান্তে থেকে আমি দাঁড়িয়ে আছি সতর্ক প্রহরীর মতো। আমার হাতছানিকে উপেক্ষা করো না।" আরো এগিয়ে গিয়েছি, আবার বেহড়। কোন্ সময় যে কুইন দাঁড়িয়ে গিয়েছে বুঝতেই পারিনি। যখন বুঝতে পারলাম, তখন অন্ধকারে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা ভাঙা বাড়ির সামনে। লাখন সিং-এর বাড়ি। পকেট থেকে চাবি বের করে কুইন তালা খুলল। অন্ধকারে দুটো বাদুড় মাথার উপর ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কি একটা অজানা ভয়ে আমি আবার থমকে দাঁড়াই। "কাম অন ম্যান্"—কুইন ডেকেছে। গাঁয়ের একপাশে ডেকে ওঠে দু'-একটা কুকুর বিশ্রীভাবে। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু কুইনের মুখের জ্বলন্ত সিগারেট। পরের পর ছোটো-বড়-মাঝারি রকমের ঘর। সামনেই উঠোন। বাড়ির ছাদ ধ্বসে পড়েছে, উঠোন ভরে গেছে আগাছায়। বড় পরিবারের জন্যে বিরাট বাড়ি ছিল এককালে। এখন আর কেউ নেই। অনেকদিন পর্যন্ত সন্ধ্যেবেলা ঘরে বাতি জ্বালিয়েছে লাখনের মা, কিন্তু সে-ও আজ বছর সাতেক হলো চলে গিয়েছে বড়ছেলে মালখনের কাছে ভাদাপুরে। লাখনের বাড়ির বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ কথা বলেছি কুইনের সঙ্গে। তারপর আবার তালা

লাগিয়ে বেরিয়ে এসেছি। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়েছে কুইন আমায় শীতলা মাঈ-এর সেই মন্দিরে। সেখানে টাঙানো রয়েছে বড় বড় ঘণ্টা। নাম লেখা আছে প্রত্যেকটাতে—এইটা লাখনের টাঙানো ঘণ্টা, এইটা হুজুরী সিং-এর টাঙানো। হঠাৎ সেই রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে বেজে ওঠে ঘণ্টা—ঢং—ঢং—ঢং—ঢং। চমকে উঠেছিলাম প্রথমে। পরে কুইনের হাসি দেখে পিছনে ফিরে তাকাই। এক হাতে কুইন তার রাইফেল চেপে ধরেছে, অন্য হাতে বাজাচ্ছে লাখনের টাঙানো ঘণ্টা আর হাসছে পাগলের মতো। "আই উইল গেট হিম, আই উইল গেট হিম, দি ব্লাডি কিলার।"—কুইনের হাসি আর কথা, সেই অদ্ভুত পরিবেশে আরো অদ্ভুত শোনায়। নাগরার লোকেরা কিন্তু অবাক হয় না। তারা জানে মাঝে মাঝে কুইন এমনি পাগলামি করে। রাত দুপুরে ক্যাম্প ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় অভিশপ্ত চম্বলের এক বেহড় থেকে আর এক বেহড়ে। তারা কিন্তু এ-ও জানে যে, আরেকজনও রাতের আঁধারে বেহড়ের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় রাইফেল হাতে। প্রায়ই সে ঘোরে। একদিন না একদিন হয়তো সে কুইন সায়েবকে পাবে সামনাসামনি। তারপর নসীবে যা লেখা আছে, তাই হবে। যার রাইফেল আগে গর্জাবে, সেই জিতবে। কিন্তু তার আগে তার চাই আরেকজনকে শুধু একবার। একবার পেলেই সব হিসেব-নিকেশ সে সেদিন শেষ করে দেবে। লাখন খুঁজে বেড়ায় বেহড়ে রঘুবীর সিংকে। শুধু একবার। মাত্র একবার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় সে, তার পরই সে পুরনো দিনের প্রতিশোধ নিয়ে নেবে—সেই 'খুন কা বদলা খুন'। প্রায় ২৫ বছরের আগেকার ঘটনা, কিন্তু লাখন আজও ভোলেনি। ভুলতে তো সে চায় না। শুধু এই না-ভোলার জন্যেই তো সে লাফ দিয়েছিল বেহড়ে। কে না জানে সে কথা। পোরসার রতনলাল জানে, মানসিং জানতো, পুতলী জানতো, রূপা জানতো। নাগরার প্রতিটি লোক জানে। শুধু তাই না, ঠাকুর সাহেবের পুরোন সব কথা, ভিণ্ড মোরেনার কে না জানে। রঘুবীর সিং নিজেও জানে। তার জামাই ভীকম সিং, সে-ও জানে। আর জানতো রঘুবীর সিং-এর পরিবারের সেই ১৪ জন, যারা লাখনের

প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে মরেছে। প্রতি বিজয়া দশমীর দিন রঘুবীর সিং-এর পরিবারের লোকেরা কেঁপেছে অজানা ভয়ে। কে জানে, আজ কার দিন ঘনিয়ে এসেছে। রাজপুত ইতিহাসে, বিজয়া দশমীর দিন বড় শুভ। রাজপুতেরা কপালে 'টীকা' লাগিয়ে যুদ্ধ করতে বেরতো বিজয়া দশমীর দিন। তাই লাখনও তার শত্রু নিপাতের জন্যে বেছে নিয়েছিল বিজয়া দশমীর দিন। বৃদ্ধ রঘুবীর সিংকে জিজ্ঞেস করলে সে সব বলতে পারবে। ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো ঘটনা তার সব মনে আছে। বেশ গুছিয়ে বলবে। সব নাম ক'টা তার মনে আছে। ভুলে সে কিছুই যায়নি, কিন্তু বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। দূরে হাত দিয়ে দেখাবে ধূ ধূ করছে তার ক্ষেত।—আজ তার নিজের সাহস নেই ক্ষেতে গিয়ে কাজ করার। ক্ষেতে কাজ করতে গিয়েই তো অমুক অমুককে লাখনের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আর তাছাড়া সারা নাগরা গাঁয়ে কার এত বুকের পাটা যে, লাখনের শত্রু রঘুবীর সিং-এর ক্ষেতে মজুরী করে লাখনের বিরাগভাজন হবে।

উদিতপুরা গাঁয়ে মানসিং-এর স্ত্রী রুক্মিণী আঙুলের কর গুণে পুলিশের গুলীতে মরা তার ছেলেদের নাম বলেছিল আমায়—"হুনুত সিং, সুবেদার সিং, ধামন সিং, যশবন্ত সিং…। নাগরা গাঁয়ে রঘুবীর সিংও আমায় আঙুলের কর গুণে অনেক নাম শুনিয়েছিল, লাখনের গুলীতে যারা মরেছে। অনেকের নাম। সব মনে নেই। বিড় বিড় করে বলেছিল রঘুবীর সিং সেদিন—তিলক সিং, মথুরী সিং, জবর সিং। আরো অনেক নাম। আমার মনে নেই সব নাম, কিন্তু রঘুবীরের মনে আছে—আর মনে আছে লাখন সিং-এর। তারা কি করে ভুলবে! কথা তো আজকের নয়। এই প্রতিশোধ আর 'খুন কা বদলা খুনে'র কাহিনীর শুরু অনেক আগে এই নাগরাতেই। লাখন আর রঘুবীর সিং-এর নাগরা।

ছোট গাঁ হলে কি হবে, নাগরা আর তার আশেপাশে প্রতিপত্তি ছিল ঠাকুরদের প্রচুর। গাঁয়ের শীর্ষস্থান কে পাবে, সেই নিয়েই বিবাদ শুরু হয়েছিল সুদূর খেড়ারাঠোরে মানসিং-এর বাবা বিহারী সিং আর পণ্ডিত তল্‌ফীরামে। তার ভয়ঙ্কর পরিণতি তো

কারো অজানা নেই। খেড়ারাঠোরে ছিল ঠাকুর আর ব্রাহ্মণদের বিবাদ। কিন্তু নাগরায় যে বিবাদ শুরু হলো তা ঠাকুরদের নিজেদের মধ্যেই। ঠাকুর রঘুবীর সিং আর ঠাকুর সুবা সিং-এর বিবাদ। লাখন সিং-এর মামা সুবা সিং। সেই বিবাদের পরিণতির কাহিনীও লেখা হয়েছে লাল রক্তে। চম্বলেয় প্রতিটি বেহড় সাক্ষী সেই কাহিনীর। আর সাক্ষী সেই বিবাদের রঘুবীর সিং-এর বিরাট 'হাভেলী'। খুঁজলে এখনও পাওয়া যাবে দেওয়ালে গুলীর দাগ। রঘুবীর সিং-এর জামাই ভীকম সিং, সে-ও তো সাক্ষী। শার্টের হাতটা কনুই-এর ওপর গুটিয়ে নিয়ে দেখিয়েছিল আমায় চার ইঞ্চি গুলির দাগ। কালো হয়ে গিয়েছে জায়গাটা। 'দেখা সাব, ক্যায়া কিয়া শালে নে' ভীকম সিং বলেছিল।

চুরির আড্ডা ছিল নাগরা। অনেক রকমের চুরি হতো। রতনলালই তো বলেছিল, উট আর হাতীও চুরি হতো, আর চুরি হতো গরু-বলদ, আফিম, গম, বাজরা। চুরি করে 'স্মাগল' করে নিয়ে যেত উত্তরপ্রদেশে আর রাজস্থানে চম্বলের ওপারে। তাছাড়া সাধারণ চুরি তো ছিলই। সুবা সিং আর রঘুবীর সিং দু'জনেই ছিল এই চুরির ব্যবসায়ে লিপ্ত। নিজেরা চুরি করত না, কিন্তু মাইনে-করা লোক ছিল চুরি করার জন্যে। নিজেরা শুধু চুরির মাল বিক্রি করার বন্দোবস্ত করেই খালাস। মানসিং আর উত্তর-প্রদেশের দুর্ধর্ষ ডাকাত চারনা ছিল সুবা সিং আর রঘুবীর দু'জনেরই বন্ধু। মানসিং নির্ভয়ে আশ্রয় পেত এদের কাছে। মানসিং-এর সংরক্ষণে অবাধে এরা চালিয়ে গিয়েছে নিজেদের অবৈধ ব্যবসা। কেউ সাহস করেনি পুলিশকে খবর দেবার। একই ব্যবসা, একই গাঁ, একই উদ্দেশ্য—রঘুবীর আর সুবা ছিল অভিন্নহৃদয় বন্ধু। লাখন, তার সবচেয়ে বড়ভাই বিশ্বম্ভর সিং আর ভাইপো মাধো সিং ছিল সুবা সিং-এর দলে। চতুর বুদ্ধিমান লাখন ছিল দলের নামকরা লোক। নাগরায় তখন এদেরই রাজত্ব। সাব ইন্সপেক্টর আজিম খান একবার সাহস করে খানাতল্লাসী করতে এসেছিল নাগরা গাঁয়ে। গাঁয়ের মাঝপথেই তাকে ঘেরাও করেছে এরা। বর্শার গভীর আঘাত কাঁধে নিয়ে ফিরে গিয়েছে আজিম খান। পুলিশের হেড কনস্টেবল সুন্দরলাল আরো বেশি সাহস দেখিয়ে

সুবা সিং-এর বাড়ীতে ঢুকে চুরির মাল বের করেছে। কিন্তু তাকে গাঁ থেকে ফিরতে হয়নি। তাকে ধরে রেখেছে এরা। দিনের পর দিন অত্যাচার হয়েছে সুন্দরলালের উপর, অকথ্য অত্যাচার। শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত মাল জোর করে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিপদ ঘনিয়ে এল নাগরাতে। শুরু হলো বিবাদ সুবা সিং আর রঘুবীরের মধ্যে। আগ্রার কাছেই খেড়া-মালোনী গাঁ থেকে রঘুবীর সিং-এর দলের তিলক সিং আর হীরাসিং চুরি করে আনল কয়েক জোড়া বলদ। যার চুরি হলো, সে গেল লাখনের ভাই বিশ্বম্ভরের কাছে। কেঁদে জানাল, সে তাদের আত্মীয় আর বলদ চুরি করবে নাগরার লোকেরা? বিশ্বম্ভরের মাথায় কুবুদ্ধি ঢুকল। চুপচাপ পুলিশকে খবর দিল রঘুবীরের লোকদের নামে। পুলিশ এল। রঘুবীরের বাড়ী থেকে চুরি করা বলদ বের করা হলো আর ধরে নিয়ে গেল দলের কয়েকজনকে।

ব্যস্ শুরু হয়ে গেল বিবাদ। তার শেষ আজও হয়নি। কবে শেষ হবে, কে জানে। কিছুদিন পরেই মানসিং-এর দলের সঙ্গে পুলিশের এনকাউণ্টারে ইন্সপেক্টর জগন্নাথ সিং, রাজারাম আর তিনজন সেপাই মারা পড়ল। পুলিশ এবার মানসিং-এর বন্ধু সুবা সিংকে ছাড়ল না। সুবা সিং-এর উপর হুকুম হলো মোরেনা জেলা ত্যাগ করে চলে যাবার।

নাগরায় সেদিন উৎসব হলো রঘুবীর সিং-এর বাড়ীতে। রঘুবীর এবার নাগরায় করবে একাধিপত্য। গাঁয়ের লোকেরা হয়ে উঠল শঙ্কিত। এইবার শুরু হবে।

তেরো

গাঁয়ের সীমানায় পুলিশের পাহারায় এল সুবা সিং। এইবার তাকে ছেড়ে যেতে হবে নাগরা। তাকে পৌঁছতে এসেছে লাখন সিং, মালখন সিং, বিশ্বম্ভর সিং, ফিরঙ্গী সিং, মাধো সিং আরো অনেকে। মুচকি হাসছে রঘুবীর সিং, তিলক সিং, হীরা সিং আর জবর সিং। অনেক সহ্য করেছে সুবা সিং, আর এই অপমান সে

সহ্য করতে পারে না। তার সামনে রঘুবীর তার অবস্থা দেখে হাসবে আর সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মুখ বুজে থাকবে ?

লাখনকে বুকে জাপটে ধরে সুবা সিং। চোখে তার জল। "বেটা, ইস্‌কা বদলা লেনা।" এর প্রতিশোধ তুই নিস, বলল ভাগ্নেকে।

মাথার পাগড়ী মামার পায়ের তলায় রেখে লাখন প্রতিজ্ঞা করল, "ইসকা বদলা যব তক্ না লুঙ্গা চৈন সে নহী বৈঠুঙ্গা"। যতদিন এর প্রতিশোধ না নেবে, সে স্থির হয়ে বসবে না। ব্যস হয়ে গেল শুরু।

নাগরা গাঁয়ের ইতিহাস লেখা শুরু হয়ে গেল।

কিছুদিন পরেই জীবনের প্রথম ঘৃণিত অপরাধ করল লাখন সিং। লোদা-কি-পলী গাঁয়ে ডাকাতি করল। তার ভাই বিশ্বম্ভর আর আরো কিছু লোক ধরা পড়ল। লাখনকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। সে তখন ধরেছে বেহড়ের রাস্তা। চম্বল পার হয়ে উত্তরপ্রদেশে গিয়ে যোগ দিল ডাকাত হরগোবিন্দ আর মহারাজ সিং-এর দলে। কিন্তু লাখনের মতো লোকের পক্ষে কারোর অধীনে কাজ করা বেশি দিন পোষাল না। দল ছেড়ে সে এবার গেল দুর্ধর্ষ দস্যু চারনা'র কাছে। এক বছরের মধ্যেই তৈরি করল নিজের দল। লোদা-কি-পলী ডাকাতি মামলায় যারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল সেই পাঁচজন মুচীকে নির্মমভাবে একদিন হত্যা করল লাখন। ফিরঙ্গী এই ডাকাতি মামলায় হাইকোর্ট থেকে ছাড়া পেল, কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই পুলিশ তাকে আবার গ্রেপ্তার করল, লোকে বলে রঘুবীর সিং-এর প্ররোচনায়।

লাখন আবার প্রতিজ্ঞা করল। রঘুবীর, তার আত্মীয় আর দলের সব লোককে হত্যা করে "বদলা" নেবার প্রতিজ্ঞা। ছ' মাসের মধ্যেই লাখন নিল তার প্রথম বদলা। রঘুবীরের আত্মীয় তিলক সিং আর মথুরী সিংকে গায়ের কাছেই ক্ষেতের মধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল। তারপর বিপুল উদ্যমে নামল তার হত্যালীলায়। ভিণ্ড, মোরেনায় তার দল হলো সবচেয়ে শক্তিশালী। নাগরার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় বাঘের মতো। রঘুবীরের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া যে তখনও তার হয়নি। তার পরিবারের কয়েকজনকে

শেষ করেও লাখন শান্ত হলো না। রঘুবীরকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিল পুলিশ। রঘুবীরের "হাভেলী"তে বসল পুলিশের হেড-কোয়ার্টার। ফোর্থ ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডাণ্ট কুইন সায়েবের হেডকোয়ার্টার।

আগেই বলেছি লাখনের "সিক্সথ সেন্স"-এর কথা আর আশু বিপদের আশঙ্কায় তার সতর্কতার কথা। কিন্তু লাখনের বরাত জোরের কথা তো বলা হয়নি। বরাতের জোর না থাকলে ২৪শে মার্চ, ১৯৫২ রাতেই হতো লাখনের শেষ। জমাদার মহাডিকের কাছে ইনফর্মার ঠিক খবরই দিয়েছিল। লাখন এসেছিল নাগরা গাঁয়ে। ফেরবার কথা রাত ১০টায়। ফেরত যাবার রাস্তায় তৈরি হলো অ্যামবুশ। পুলিশ পার্টি দেখতে পাচ্ছে লাখন ফিরছে। ক্লিক্ ক্লিক্ করে রাইফেলের বোল্ট পিছনে চলে গেল। লাখন বুঝতে পারল কি ভীষণ বিপদে সে পড়েছে। পালাবারও পথ নেই। পুলিশ ফারার শুরু করেছে। লাখন খুঁজতে শুরু করল একটা "কভার"! কোথায় কভার। লাখন পিছু হটতে লাগল। তাও বেশি দূর তো যাওয়া যাবে না। পিছনের রাস্তাও তো অ্যামবুশ পার্টি আগলে বসে আছে। শেষে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে বলল দলের সবাইকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে পুলিশ পার্টি ফায়ার করতে করতে। কতক্ষণই বা সে লড়তে পারবে? পাগলের মতো মরিয়া হয়ে লাখন ফায়ার শুরু করল। ঠিক এমনি সময় কোথা থেকে প্রায় কুড়িটা মাল বোঝাই উট তার সামনে এসে পড়ল। ব্যস আর কি চাই। কুড়িটা উট তাকে কভার দেবার জন্যে যথেষ্ট। লাখন নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেল পুলিশ ব্যূহ থেকে।

আবার লাখন সিং-এর সন্দেহ হলো রঘুবীরের উপর। কিছুদিন পরই বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় নাগরার কাছেই ক্ষেতের মধ্যে লাখন নির্মমভাবে খুন করল রঘুবীরের ভাই জবর সিংকে। যাবার আগে জানিয়ে দিল প্রতি বিজয়া দশমীর দিনই সে আসবে যতদিন না রঘুবীরকে পায়। তার পরের বছর বিজয়া দশমীতেও লাখন করেছিল "হাভেলী" আক্রমণ কিন্তু পুলিশের কড়া পাহারায় সেদিন রঘুবীরের পরিবারের সবাই বেঁচে গেল। লাখনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো। সেবার বিজয়া দশমীতে সে কিছুই করতে পারল না।

কিন্তু তার ঠিক দু'দিন পরেই সে তার প্রতিশোধ নিল এমনিভাবে যে আজও পুলিশের কর্তারা লাখনের ধূর্ততা আর "স্ট্র্যাটেজী"র কথা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় খবর এলো নাগরার পুলিশ-হেডকোয়ার্টারে। আগের দিন উত্তরপ্রদেশে আগ্রার কাছে যখন মানসিং-এর দলের সঙ্গে এনকাউন্টার হয় তখন লাখন ছিল মানসিং-এর সঙ্গে। এও খবর এল লাখন সেই পথ দিয়েই ফিরে আসছে নাগরার দিকে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাগরা থেকে পুলিশ ফোর্স সরিয়ে পাঠানো হলো আগ্রা বর্ডারের কাছে।

পুলিশ ফোর্স রওনা হবার পর বোধ হয় আধ ঘণ্টাও হয়নি। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো তার দলবল নিয়ে লাখন ঝাঁপিয়ে পড়ল নাগরা গাঁয়ের ওপর। আধ ঘণ্টার মধ্যেই রঘুবীরের পরিবারের আটজনকে লাখন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। ছোট্ট একটা ভুল খবর পুলিশকে দিয়ে লাখন তার প্রতিশোধ নিয়ে নিল। যখন এই ঘটনা নাগরায় হলো পুলিশের ডি. আই. জী. মিঃ শর্মা আর এস. পি. মিঃ দেশমুখ তখন মোটে বারো মাইল দূরে পোরসায় ক্যাম্প করেছিলেন। অনেক পরে ওয়্যারলেসে তাঁদের কাছে এই ভয়ানক হত্যালীলার খবর এসেছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে তারা যখন নাগরায় পৌঁছলেন তখন রঘুবীরের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে কান্নার রোল। "হাভেলী"র দেওয়ালে গুলীর দাগ। রঘুবীর সিং তখন গাঁয়ে ছিল না তাই সে গিয়েছিল বেঁচে, কিন্তু ফিরে এসে সেদিন সেও ভেঙে পড়েছিল কান্নায়। পাথরের মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল রঘুবীর। নিশ্চল তার চোখের দৃষ্টি। পলকহীন সে তাকিয়ে ছিল আটটা লাশের দিকে। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে! পাশে দাঁড়ানো কনেস্টবলের হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল পাগলের মতো বেহড়ের দিকে। দশ মিনিট পর বিভ্রান্তের মতো যখন ফিরে এসেছে তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। লাখনের সঙ্গে যুদ্ধে সে হেরে গিয়েছে।

"শালা কুত্তা। শালা হারামী। শালেকা নাশ হো"—রঘুবীর লাখনের নাম শুনেই জ্বলে উঠেছিল। বৃদ্ধ হয়েছে রঘুবীর। ফোর্থ ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারে কুইন সাহেবের ক্যাম্পের সামনেই

নিমগাছের ছায়ায় বসেছিলাম আমরা। আমি, রঘুবীর তার জামাই ভীকম সিং আর কুইন।

"কতদিন আর পুলিশের পাহারায় চোরের মতো পালিয়ে পালিয় বেড়াবে ?" রঘুবীরকে জিজ্ঞাসা করি।

কুইনের দিকে এক মুহূর্ত তাকাল রঘুবীর। এক ঝিলিক হাসি ভেসে ওঠে কুইনের মুখে। রঘুবীরের জ্যোতিহীন চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। "জব তক্ ইয়ে সাহাব উস্ শালেকো ন মারে তব তক্। উস্কী লাশ আয়েগী ইহাঁ আউর ম্যায় উস্পর থুকুঁঙ্গা।" যতদিন না কুইন লাখনকে মারে ততদিন পর্যন্ত। যেদিন লাখনের লাশ আসবে সেদিন রঘুবীর তার ওপর থুথু ফেলবে।

একরাশ থুথু ফেলে রঘুবীর রাগে লজ্জায় আর ঘৃণায়।

তারপর ? তারপর রঘুবীর চলে যাবে নাগরা ছেড়ে। মাটির মায়া ত্যাগ করে তার "হাভেলী" ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ রঘুবীর চলে যাবে অনেক দূরে। নাগরাকে, নাগরার ইতিহাস সব সে ভুলে যেতে চায়। একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় তার পেছনে ফেলে-আসা রক্তমাখা দিনগুলোকে।

চোখের আগুন আবার নিবে আসে। পাথরের মতো নিশ্চল, জ্যোতিহীন চোখ দুটো অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে হাভেলীর দিকে। তারপর একসময়ে জলে ঢাকা পড়ে যায় সব কিছু। টস্ টস্ করে দু'ফোঁটা চোখের জল সময়ের আগুনতি দাগ কাটা কোঁচকানো শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। রঘুবীর কেঁদে ওঠে। "আমি ঠাকুর রাজপুত আর আজ আমি একটা "কুত্তার" ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি পুলিশের পাহারায়। আমার ক্ষেত, আমার বাড়ি, আজ আমার হয়েও আমার না।" আর বলতে পারে না রঘুবীর, কান্নায় ভেঙে পড়ে।

"কাম অন ম্যান। কেয়া তোম রোতা ম্যান", কুইন বকে ওঠে রঘুবীরকে।

রঘুবীর গুণতে শুরু করে হাতের আঙুলের দাগগুলো—তিলক সিং, মথুরী সিং, জবর সিং, হীরা সিং... আরো অনেক সব নাম। প্রশ্ন করে আমাকে "আমি না হয় ঝগড়া করেছি লাখনের সঙ্গে। কিন্তু ইন লোগোঁকো ক্যায়া কসুর ?" এরা কি করেছে ?

কি দোষ ছিল তার জামাই ভীকম সিং-এর যে আজীবন সে হাতে গুলীর দাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

কিন্তু রঘুবীর হয়তো জানে না, তার মতো ঠাকুর লাখন সিংও আজকাল প্রায়ই হাতের আঙুলের দাগ গুণে গুণে অনেক নাম বিড়বিড় করে বকে সময়ে অসময়ে। দল তার ধীরে ধীরে কমে আসছে। আগে ছিল ৩০।৩৫ জন লোক। এখন দাঁড়িয়েছে ২০।২২ জনে। আস্তে আস্তে সব হয়তো একদিন শেষ হয়ে যাবে। বেঁচে থাকবে হয়তো সে শুধু নিজে রঘুবীরের ওপর "বদলা" নিতে। হয়তো বা নাগরার কাছেই কুইন সাহেবের হাতেই…। কিন্তু তার আগে যে রঘুবীরের সঙ্গে একবার শেষবারের মতো বোঝাপড়া করতেই হবে। সে সময় হবে কি? রূপার সঙ্গে তার ঝগড়ার খুব সুযোগ নিয়েছে কুইন সাহেব। অনেক কিছু জানতে পেরেছে? অনেক নামই মনে হয় ঠাকুর সাহেবের। কত লোক এল গেল দলে। কত মারা পড়ল তারই সামনে। অনেক নাম। ফৌজদার সিং। ধোকেবাজ। দাগাবাজ। শুধু একটা গুলী। ব্যস খতম। ঠাকুর সাহেব জানতো ফৌজদার সিং-ই তাকে ধোকা দিয়েছিল। কেউ তাকে বলেনি। ফৌজদারের চোখ দুটোই তাকে বলে দিয়েছিল। আর অভিলাখ সিং? তার বিশ্বস্ত অনুচর। শুধু ছোট্টো একটা ভুলের জন্য ধরা পড়ল। ভাবতেও পারে না ঠাকুর সাহেব ৭২ বছরের জেল হয়ে গেল অভিলাখের সেদিন। কয়েকটা সাক্ষীকে সাবাড় করেও কোনোই লাভ হলো না। একটা গাঁয়ের মেয়ে তার এত "হিম্মত"। ঠাকুর সাহেবের আদেশ অমান্য করে কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এল অভিলাখের বিরুদ্ধে। যাক দেখা যাবে। তার সঙ্গেও বোঝাপড়া হবে একদিন। মেয়েমানুষ হলে কি হবে। ধোকা দিলেই ধোকা খেতে হবে। ঠাকুর সাহেবের "বদলা" ভীষণ "বদলা"। বিশ্বাস না হয় নাগরা গাঁয়ে রঘুবীরকে জিজ্ঞাসা করে এসো।

আর তার নিজের ভাইপো হুজুরী সিং, ঠাকুর সাহেব জানতো সে একদিন পুলিশের হাতে মারা পড়বেই। এখনও মাঝে মাঝে চেহারাটা মনে পড়ে। কি সুন্দর চেহারা ছিল হুজুরী সিং-এর। সে যে মেয়েদের খপ্পরে পড়বে তা ঠাকুর সাহেব জানতো। কিন্তু

বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল হুজুরী সিং। অত মদ আর মেয়েদের নেশা যাকে পায় তার দিন তো ঘনিয়ে আসবেই। পই পই করে মানা করেছে ভাইপোকে, কিন্তু শোনেনি। ভালোই হয়েছে মরেছে। অমন লোককে দলে রাখার অনেক বিপদ। পুলিশের হাতে না মরলে, লাখন একদিন নিজেই গুলী করত হুজুরীকে! মদ মেয়েমানুষের রোগ অনেকেরই আছে, কিন্তু হুজুরীটা ছিল পাষণ্ড। পশুর চেয়েও অধম। মেয়েমানুষদের ওপর শুধু অত্যাচার করেই সে ক্ষান্ত হতো না, পরে তাদের গলা টিপে মেরে ফেলত। ইংরেজী কাগজে নাকি তার নাম ছিল "সেক্স ম্যানিয়াক, পার্ভার্ট"। আর পুলিশের খাতায় লেখা ছিল "a delinquent Don Juan and an unrepentent raper of women." ভালোই হয়েছে হুজুরী মরেছে। বেঁচে থাকলে হয়তো কত বিপদের মধ্যেই না ফেলত তাকে।

কিন্তু জ্বলা সিং-এর মৃত্যুই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে ঠাকুর সাহেবকে। কি জানি হয়তো সেদিন নিজে সঙ্গে থাকলে জ্বলা সিং এমনিভাবে মরত না। তারই ভুল হয়েছিল জ্বলাকে আলাদা ভাবে ডাকাতি করবার অনুমতি দিয়ে। কিন্তু কিই বা করবে ঠাকুর সাহেব। নিজের ভাইঝির বিয়ের জন্যে টাকার দরকার ছিল জ্বলার। ঠাকুর সাহেবের নিজেরই তখন ভীষণ টানাটানি চলছে। রাইফেল আর টি.এম.সি. কিনতেই অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল। নয় তো সে নিজেই দিয়ে দিতে পারত টাকা জ্বলার ভাইঝির বিয়ের জন্যে। কতবারই তো কত লোককে দিয়েছে এরকমভাবে টাকা। তা জ্বলা নিজেই তো প্রস্তাব আনল। বললে, কিছুদিন ছেড়ে দাও আমাকে। কয়েকজনের সঙ্গে আমার "বদলা" নেওয়া বাকী আছে এখনও। মাস দুয়েকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। "বদলা" নেওয়াও হবে আর ভাইঝির বিয়ের টাকাও যোগাড় হয়ে যাবে। লাখন রাজী হয়ে গেল। যাক বেচারী ভাইঝির বিয়ের জন্যে যদি টাকা যোগাড় করতে পারে ক্ষতি কি। বড় ভালোবাসে ভাইঝিকে জ্বলা সিং। এত টানও আবার ভালো না। কোনোদিন হয়তো বিপদে পড়বে।

তারিফ করতে হয় জ্বলা সিংকে। কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ

কিছু টাকা যোগাড় করে ফেলল। পুলিশের লোকেরা একটু হকচকিয়ে পড়েছিল। ডাকাতি করে লাখন সিং-এর দলের জ্বলা সিং, কিন্তু লাখনের পাত্তা নেই। তাহলে কি জ্বলার সঙ্গে লাখনের মনোমালিন্য হয়েছে? লাখন খুব হেসেছিল সেদিন পুলিশের হয়রানির কথা ভেবে। কিসের "ইণ্টেলিজেন্স" ব্যাটাদের? ছোট্ট ব্যাপারেই ধোকা খেয়েছে। কিন্তু জ্বলাটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে। অত ধূমধাম করে বিয়ে দেবার কি দরকার? আর অত টাকাই বা সে কেন খরচ করতে যাচ্ছে!

জানতো ঠাকুর সাহেব বিপদে পড়বে একদিন জ্বলা, আর হলোও তাই। মরিয়া হয়ে উঠেছিল জ্বলা। পরেরদিন সন্ধ্যেবেলা ভাইঝির বিয়ে। আগের দিন করতে গিয়েছে ডাকাতি, শেষ মোওকায় কিছু টাকা পাওয়া যায় কিনা দেখতে। পুলিশ কিন্তু এবার আর ধোকা খায়নি। গাঁয়ের বাইরে আসার আগেই হলো "এনকাউণ্টার"। চেষ্টা করলেই পালাতে পারত জ্বলা। কিন্তু কি যে হলো শেষ মুহূর্তে। পাগলের মতো দেওয়ালের ওপরে উঠে এলোপাথাড়ি গুলী চালাতে শুরু করল। কতক্ষণ আর প্পারবে। ধড়াস করে পড়ল আর উঠল না। কাল তার ভাইঝির বিয়ে।

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেয়েছিল লাখন সিং-এর। জ্বলা সিং-এর মৃতদেহ সনাক্ত করতে হিমসিম খেয়ে গেল পুলিশ। কাগজওয়ালাদের রটিয়ে দিল লাখন সিং-এর দলের আর একজন লোক মাখন সিং মারা পড়েছে। পরের দিন সকালেই কিন্তু তাদের ভুল ভাঙল। কিন্তু এই যে জ্বলা সিং তার প্রমাণ কি? কে সনাক্ত করবে তার লাশকে?

কিন্তু পুলিশ একি করলো! জ্বলা সিং-এর লাশ নিয়ে যে তারা তার গ্রামের দিকেই চলল। গাঁয়ে যে তার ভাইঝির বিয়ে সেদিন। উঃ, কী পাষণ্ড পুলিশের লোকগুলো। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। জ্বলার ভাইঝির বিয়ে গাঁয়ে। গাঁ উজার করে সব লোক এসেছে বিয়েতে। মণ্ডপে জ্বলছে গ্যাসের বাতি। সানাই বাজছে। মেয়েকে নিয়ে আসা হচ্ছে বিয়ের মণ্ডপে। ঠিক সেই সময়েই পুলিশ পৌঁছল খাণ্ডোলী গাঁয়ে জ্বলার লাশ নিয়ে।

অদৃষ্টের কি পরিহাস। যে ভাইঝির বিয়ের জন্যে জলা এত সব কিছু করল তার বিয়েই সে দেখতে পেল না। শুধু তাই নয়। বিয়ের মঙ্গল মুহূর্তে তারই লাশ পৌঁছল বাড়ির প্রাঙ্গণে। আছড়ে পড়ল জলার ভাইঝি কাকার বুকের উপর! লাশ সনাক্ত হয়ে গেল।

যখন বর-বধূ যজ্ঞের আগুনের চারপাশে সাতপাক ঘুরছে, গাঁয়ের কিছু দূরেই নদীর কাছে জলে উঠল জলা সিং-এর চিতা দাউ দাউ করে। বড় খারাপ লেগেছিল সেদিন ঠাকুর সাহেবের। বড় খারাপ লেগেছিল। এমনটা কেন হয়! এমনটা কি না হলেই নয়? নসীবের খেল, বড়ই নির্মম।

অনেকের কথাই মনে পড়ে ঠাকুর সাহেবের। বাবু লোহারী, সুলতান সিং। শুধু একটা ইশারা করেছিল কল্লাকে। ব্যস একটা গুলীতেই খতম অত বড় "বাগী"। কিন্তু আশ্চর্য, পুতলীকে সে তো পেল না। যাক। কি আর হয়েছে। এমন কিছু ভালো লাগেনি তাকে। হঠাৎ একটু দুর্বলতা এসেছিল প্রথমে, তারপরেই ভুলে গিয়েছিল পুতলীকে। আর কল্লা। পুতলীর কল্লা! এও নসীবের খেল। যে কল্লা সুলতানকে মারল সেই কল্লাই শেষে পুতলীর প্রেমে পড়ল। আর আচ্ছা মেয়েটা তো। সুলতানকে মারার পরেও কল্লাকে ভালোবাসলো! হ্যাঁ, কল্লাটা মরদ ছিল। শেষ পর্যন্ত পুতলীকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। পায়ে গুলী লেগে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে ছিল। দু'মাস পরে আবার উঠেছিল।

লাল সিং-এর কথাও ভুলতে পারে না ঠাকুর সাহেব। "কালিজে পড়া, ফৌজের হাবিলদার শেষে কিনা "বাগী" হলো। কেন যে শুধু শুধু নিজের দল গড়তে গেল!

আর মনে পড়ে ঠাকুর সাহেবেব পাণ্ডরী গাঁয়ের কথা। পাণ্ডরীতে থাকে তার আদরের ছোটো বোন সোনচিড়ইয়া। পাণ্ডরীর সঙ্গে আরেকটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সে স্মৃতি হচ্ছে হরবিলাসের।

চৌদ্দ

হরবিলাসও "ধোকা" করেছিল ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে। সাহস করে দল ছাড়বে বলে হুমকি দিয়েছিল। তা কি কখনও হয়? একবার দলে ঢুকলে কি আর দল ছাড়া যায়? একবার যে "বাগী" হয়েছে সে কি আর কখনও ফিরতে পারে? বেহড়ের হাতছানিতে যে একবার ভুলেছে সে আর কোনদিনই বেহড় থেকে ফিরতে পারে না। কিন্তু হরবিলাস চেয়েছিল পালাতে। কোথায় পালিয়ে যাবে? পুলিশের কাছে, না নিজের আলাদা দল তৈরী করতে? কে জানে। বলতে পারতো শুধু হরবিলাস নিজে। কিন্তু হরবিলাস তো আর নেই যে সে বলবে। হ্যাঁ, বলতে পারে ঠাকুর সাহেব। কিন্তু সে তো বলবে না। পাণ্ডরী গাঁয়ের সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে সেই ঘটনা, কিন্তু তারাও কেউ জানে না কেন এই রকম হলো। তারা শুধু এই জানতো হরবিলাস "ধোকা" করেছে ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে। আর বেশি জানার তাদের প্রয়োজনও নেই, আর সাহসও নেই।

নাগরা ছেড়ে আরো অনেক এগিয়ে যেতে হবে। নাগরা থেকে কানহেরা, কানহেরা থেকে কাডোরা, কাডোরা থেকে সুরপুরা, সুরপুরা থেকে উদিতপুরা। উদিতপুরা থেকে ভিণ্ড আর ভিণ্ড থেকে আরো কয়েকটা গাঁ ছাড়িয়ে তবে পড়বে পাণ্ডরী। রাস্তা ঘাট তো নেই। ক্ষেতের মধ্যে দিয়েই কোনো রকমে যাওয়া আসা করতে হয়। আর পাণ্ডরী পৌঁছতে গেলে তো বেহড়ের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। জীপে গেলে বেহড়ের গায়ে মাঝে মাঝে ধাক্কা লাগে। বর্ষায় সময় জল ঢুকে পড়ে বেহড়ের রাস্তায়। ব্যস সব বন্ধ। পাণ্ডরী তখন সভ্যজগত থেকে অনেক দূরে। সারা গাঁটাই বেহড়ের ওপরে। ছড়ানো ছড়ানো বাড়ি সব। এক একটা বেহড়ের ওপর এক একটা বাড়ি। বাড়ির পেছনের দরজা খুললেই বেহড়। সোজা চলে যাও বেহড়ের মধ্যে দিয়ে। তারপরই চম্বল।

সমৃদ্ধশালী ঠাকুরদের গাঁ পাণ্ডরী। ইস্কুল আছে, মন্দির আছে, নেতা আছে, সবই আছে পাণ্ডরীতে। আর আছে লাখনের বোন

সোনচিড়ইয়া। ঠাকুরদের গাঁ কিন্তু পাণ্ডরীতে কেউ মাছ মাংস খায় না। জীব হত্যা মহাপাপ, তাই পাণ্ডরীর ঠাকুররা সব নিরামিষ। কিন্তু মানুষের জীবনের কোন দাম নেই পাণ্ডরীতে। মানুষকে খুন করা! সে কথা আলাদা! সে তো "ইজ্জত"-এর কথা। সে হলো খুন কা বদলা খুনের ব্যাপার।

সোনচিড়ইয়ার বাড়ির দাওয়াতে বসে বেশ দেখা যায় ক্ষেত আর বেহড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা গাঁয়ে এসেছে। আসার আর যাবার ঐ একটাই রাস্তা। দাওয়া থেকে প্রায় এক মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যায় এঁকে বেঁকে রাস্তা আসছে। ঠাকুর সাহেব প্রায়ই আসে পাণ্ডরীতে। যদি কেউ খবর দেয় পুলিশে তবুও কোনো ভয় নেই। এক মাইল দূর থেকে দেখা যাচ্ছে পুলিশের গাড়ি আসছে। নির্বিঘ্নে খাওয়া দাওয়া করে ঠাকুর সাহেব পেছনের দরজা খুলে নেমে গেল বেহড় দিয়ে। পুলিশ এল সোনচিড়ইয়ার কাছে। জিজ্ঞাসা করল ঠাকুর সাহেব এসেছিল কিনা। "হ্যাঁ এসেছিল। এই মিনিট দশেক আগে চলে গেল।" ব্যস, আর কিছুই করার নেই। ততক্ষণে লাখন সিং হয়তো চম্বল সাঁতরে অনেক দূর চলে গিয়েছে। বাড়ির মধ্যে দিয়ে আর চম্বলের জলের মধ্যে জীপ নিয়ে তো যাওয়া যায় না?

হ্যাঁ, এই পাণ্ডরীতেই হয়েছিল সেই ঘটনা। গাঁয়ের সবাই বলবে হরবিলাস "ধোকা" করেছিল ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে। গাঁয়ে ঢুকতেই মস্ত বড় "বাবুল" গাছ। সব চেয়ে বড় সাক্ষী সেই "বাবুল" গাছটা। গাটা আমার যেন কি রকম কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। তখন সবে ভোর হয়েছে। সোনচিড়ইয়া বোধহয় তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। হাতে সময় ছিল খানিকটা তাই গাঁ'টা একটু ঘুরে দেখব বলে এগলাম। এসে নিজের অজান্তেই কখও যে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম বাবুল গাছটার নিচে, নিজেই বুঝতে পারিনি।

সঙ্গের লোকটা ফিস্‌ফিস্ করে হঠাৎ বলে উঠল, "এই গাছটার সঙ্গেই..."

"এই গাছটায় কি?"

চাপা গলায় উত্তর এল—ঠিক এই রকম ভোর বেলাই

ঠাকুর সাহেব সেদিন সবাইকে জাগিয়ে ছিল তাদের ঘুম থেকে। সবাইকে আসতে বলা হয়েছিল বাবুল গাছটার কাছে। এসেও ছিল গাঁয়ের সবাই। তারপর পিছমোড়া করে বেঁধে এনেছিল হরবিলাসকে…"

তারপর ?

"তারপর আর কি ? গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে ঠাকুর সাহেব নিজে গুলী করে মারল হরবিলাসকে।"

"গাঁয়ের লোকে কিছু করল না এই নৃশংস হত্যা দেখে ?" জিজ্ঞেস করেছিলাম লোকটাকে।

অদ্ভুতভাবে হেসে লোকটা বলেছিল, "কি যে বলেন আপনি। তারা সব দাঁড়িয়ে দেখল। তু'ঘণ্টা পড়েছিল হরবিলাসের লাশ। যখন পুলিশ এল তখন শকুনি ঘুরছে লাশের ওপর।"

ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে 'ধোকা' করলেই ধোকা খেতে হয়। গাঁয়ের লোকেরা এখনও বাবুল গাছটার দিকে আড়চোখে চেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তাদের অগাধ বিশ্বাস ঠাকুর সাহেবের ওপর। যারা যারা তার সঙ্গে 'ধোকা' করেছে বা তার দল ছেড়ে চলে গিয়েছে তারা সবাই ধোকা খেয়েছে। সব ক'টা শেষ হয়েছে, কিন্তু ঠাকুর সাহেব তো এখনও বেঁচে। কেউ কি তার কিছু করতে পেরেছে ! ফৌজদার সিং, সুলতান সিং, অভিলাখ সিং, জ্বলা সিং, হরবিলাস, কল্লা, লালসিং, শঙ্কর গুজর, অমৃতলাল, পুতলী, রূপা, এমন কি 'দাউ' মানসিংও। কে কোথায় তলিয়ে গেল। হ্যাঁ পানা আর বাহাত্বরা এখনও আছে, কিন্তু তারা আর ঠাকুর সাহেবের কাছে কিই বা ! বেশ ছিল লালসিংটা ঠাকুর সাহেবের কাছে। কেন যে আলাদা করে নিজের দল করতে গেল শুধু শুধু।

লালসিং। ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়ছিল। একদিন ভর্তি হলো ফৌজে। ট্রেনিং হলো, সব কিছু হলো, লালসিং হয়ে গেল হাবিলদার লালসিং। ফৌজের নামকরা আর্মরার (Armourer) হাবিলদার লালসিং বদলী হয়ে এল ঝাঁসীর কাছে বাবিনা ক্যাম্পে। হঠাৎ যেন কি করে একদিন লালসিং-এর দেখা হয়ে গেল ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে। বাবিনা থেকে ধীরে

ধীরে চুরি হতে থাকল রাইফেল, বন্দুক আর কার্তুজ। ধরা পড়ে গেল লালসিং। আর্মস স্মাগলিং-এর চার্জে বন্দী হলো ২৭ বছরের সুপুরুষ যুবা লালসিং। কোর্ট মার্শাল হবে। ঠাকুর সাহেবকে অনেক সাহায্য করেছে লালসিং। ঠাকুর সাহেব তো আর "অহসান-ফরামোশ" (অকৃতজ্ঞ) লোক না। তাই একদিন সকালে কোর্ট মার্শালের লক-আপ থেকে যেন হাওয়ার মতো উবে গেল হাবিলদার লালসিং। লাখনের দলের সবচেয়ে সম্মানিত সভ্য হলো লালসিং। মিলিটারীর লোক, ক্র্যাক্ শট। দলের বাকী লোককে বন্দুক চালানো শেখায় আর খারাপ হয়ে গেলে সারিয়েও দেয়। ধীরে ধীরে নেমে যেতে লাগল লালসিং অপরাধ আর হত্যার অন্ধকূপে। সরকারী খাতায় নাম হলো "লালসিং দি টেরিব্‌ল্"।

লালসিং নিজে কিন্তু সুখী হলো না। সে হতে চাইল আর এক লাখনসিং। দেবীর মন্দিরে গিয়ে সারাদিন ধর্না দিয়ে চাইল বরদান—সে যেন লাখনের চেয়েও বড় বাগী হতে পারে। দেবীর কাছে মানত করল ১০৫টা ছিন্নমুণ্ড। দু'দিন পরেই লালসিং লাখনকে ছেড়ে নিজের দল তৈরি করল। তার নিজস্ব দস্যুজীবনের শুরুতেই সে একদিন পৌঁছল শিবপুরের কাছে এক গাঁয়ে। দেবীর মানত পূর্ণ করতে হবে। নিরীহ পাঁচজন মীনা জাতের গ্রামবাসীদের ধরে এনে তাদের মাথা কেটে ছিন্নমুণ্ড রেখে এল দেবীর মন্দিরে। সারা মধ্যপ্রদেশে এই নৃশংস হত্যায় চমকে উঠল।

তবুও রুস্তমজী সাহেবের দয়া হলো। চেষ্টা করলেন লালসিংকে ভালো পথে আনতে। তাকে খবর পাঠানো হলো—সে যেন আত্মসমর্পণ করে। লালসিং ভেবে দেখল। কাউন্টার অফার পাঠাল রুস্তমজী সাহেবকে। দুটো তার শর্ত—প্রথম, মিলিটারী থেকে তাকে যেন 'পার্ডন' দেওয়া হয় আর খুনের জন্যে তাকে যেন ফাঁসি না দেওয়া হয়। রুস্তমজী সাহেব বলে পাঠালেন তিনি এই শর্ত মানতে রাজী নন। লালসিং তবুও হয়তো আত্মসমর্পণ করত, কিন্তু ঠাকুব সাহেব সাবধান করে দিল "খবরদার"। লাখন সিং জানতো একবার লালসিং আত্মসমর্পণ করলে তার নিজের দলের অনেক খবরই ফাঁস হয়ে যাবে।

লালসিং-এর ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেল চিরকালের মতো। রুস্তমজী সাহেব 'অফার' ফেরত নিয়ে নিলেন।

বেশি দিন লাগল না লালসিংকে পেতে। ছোটো দল, কম হাতিয়ার, তাছাড়া লাখনের দল-ছাড়া লোককে গাঁয়ের লোকেরাও সাহায্য করতে ভয় পায়। তিনদিন তিনরাত লালসিং পালিয়েছে বন-জঙ্গল-পাহাড়-নদী ভেঙে আর পেছনে চলেছে পুলিশ। চারদিনের দিন আর পারেনি লালসিং। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশ পার্টির সামনে। তিরিশ রাউণ্ড গুলী ছিল, পাগলের মতো ফায়ার করেছে। তারপর মুখ থুবড়ে পরে গিয়েছে একটা গুলী খেয়ে, আর ওঠেনি। পোস্টমর্টমের পর হাসপাতালের ডাক্তারও বলে উঠেছেন "দি পুয়র চ্যাপ"। লালসিং-এর পেটে ছিল শুধু জল আর কিছু জঙ্গলী ফল। তিনদিন সে কিছু খেতে পায়নি।

আর কল্লা। পুতলীর কল্লা। কল্যাণ সিং। লাখনের একটা মাত্র ইশারায় রাইফেল তুলে গুলী করেছে সুলতানকে। তারপর সেই সুলতানের পুতলীকেই সে ভালোবেসেছে। লাখনের দল ছেড়ে তৈরী করেছে কল্লা-পুতলী দল। সাব-ইন্সপেক্টর ভাজেকার জানতেন কি সাংঘাতিক দল ছিল কল্লা-পুতলীর। অনেক চেষ্টা করেছে কল্লা পুতলীকে বাঁচাতে, কিন্তু পারেনি। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে গুলী লাগা পা নিয়ে পালিয়েছে 'আড়োলী' বেহড় থেকে। দু'মাস লেগেছে সারতে। তারপর? তারপর সে নিয়েছে ভয়ঙ্করভাবে বদলা।

অবশেষে কল্লারও দিন ঘনিয়ে এল। পুলিশ একাউণ্টারে মরল কল্লা নিজে, কিন্তু তার দলের বাকী সবাই বেঁচে গেল। এই তো সেদিনের কথা। ভিণ্ডের কাছেই হরগোবিন্দকা পুরা। হঠাৎ খবর এসেছিল সেক্টর কমাণ্ডার মাধোসিং-এর কাছে। তাড়াতাড়ি মাধোসিং তৈরি করলেন অ্যামবুশ। অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত। কিছুই দেখা যায় না। মনে হলো ১০।১৫টা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। একবার দু'বার তিনবার, পুলিশের লাইটিং ইকুইপমেণ্ট ফেল করল। চতুর্থবারে জ্বলে উঠল আলো, আর সেই আলোতে দেখা গেল একজন লোককে। সঙ্গে সঙ্গে

মাধোসিং-এর রাইফেল উঠল গর্জে। লাইটিং ইকুইপমেণ্ট আবার ফেল করল। সকালে উঠে দেখা গেল শুধু একটা মৃতদেহ—কল্লা। কল্লা হয়তো জীবনে কখনও এই রকম মৃত্যু আশা করেনি। একটা গুলীও সে ছুঁড়তে পারেনি। মোটে আট-ন' বছরের দস্যু-জীবন কলার শেষ হয়ে গেল। এই আট-ন' বছরের মধ্যেই তার মাথার দাম হয়েছেল ১০,০০০৲ টাকা।

এই তো ১৯৫২ সালেই কল্লা হয়েছিল "বাগী"। মেয়েমানুষ নিয়ে ঝগড়া হলো গোরমী গাঁয়ের গুলজারীর সঙ্গে। একদিন শেষই করে দিল গুলজারীকে, তারপর তারই বন্দুক নিয়ে লাফ দিল বেহড়ে। তারপরের ইতিহাস তো জানা। সুলতানকে মারতে তার একটুও হাত কাঁপেনি আর সেই সুলতানের পুতলীকে জড়িয়ে ধরতে কোনো দ্বিধাই সে বোধ করেনি। কিন্তু পুতলীর মৃত্যু তাকে কাবু করে ফেলেছিল। কলকাতায় একদিন তারই দলের দয়ারাম আর ছোটালোহারা ধরা পড়ল। এদের ধরা পড়াতে কল্লা বড় ঘা খেয়েছিল। হাতের অর্থ ফুরিয়ে এসেছিল। অর্থ চাই। কিছু অপহরণ করল, কিন্তু কই বেশি পয়সা তো এল না। তাই কল্লা একদিন অদ্ভুত সাহসের কাজ করে বসল। এত সাহসের কাজ অনেক বড় বড় ডাকাতও করেনি। গোয়ালিয়র শহর থেকে মোটে ৪ মাইল দূরে পিকনিকের জায়গা টিঘরা। দিনতুপুরে একদিন কল্লা টিঘরাতে এক পিকনিক পার্টির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচজন লোককে অপহরণ করে নিয়ে গেল। তিনজনকে ছেড়ে দিয়ে তু'জনকে ধরে রাখল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গোয়ালিয়রের সম্ভ্রান্ত কনট্রাক্টর, আরেকজন ইনকম-ট্যাক্স-অফিসারের পার্সনাল অ্যাসিস্টাণ্ট। কিছুদিন পরে তু'জনকেই ছেড়ে দিল কল্লা, কিন্তু কনট্রাক্টরকে বেশ কিছু র‍্যানসম দিতে হয়েছিল। কল্লার মৃতদেহ যখন গোয়ালিয়রে আনা হয়, তখন এদের তু'জনকেই ডাকা হয়েছিল সনাক্ত করতে।

পানা, বারেলাল, গব্বরসিং বাহাতুরা, বিজলী। আরো অনেক নাম। অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ। সব গিয়েছে শেষ হয়ে শুধু বাকী লাখন, পানা আর বাহাতুরা। এরাও হয়তো শেষ হবে, কিন্তু চম্বলের অভিশাপ কি শেষ হবে? কে জানে। লাখনসিং

ধূর্ত, কিন্তু পানা? হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। গুঢ়া গাঁয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কাটজু আসার আগের দিনই তো পানা রাতে গাঁয়ের ন'জন ব্রাহ্মণকে ঘর থেকে টেনে বের করে এনে বেহড়ের পেছনে নির্মমভাবে গুলী করে মেরেছিল ডাঃ কাটজুকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। যাবার আগে সে কথা বলেও গিয়েছিল। এই তো সেদিন পানার শেষই হয়ে এসেছিল, কিন্তু ভাগ্য ভালো। তারই গাঁয়ের কয়েকজন লোক গরুর গাড়ি করে চলেছিল সেই রাস্তা দিয়ে। গাড়ির মধ্যে মেয়েরা তাদের ঘাঘরা ছড়িয়ে পানাকে লুকিয়ে রাখে। তার কিছুদিন পরেই আচার্য বিনোবা ভাবের ক্যাম্পের তিন মাইল দূরেই তুঃসাহসিক ডাকাতি করল পানা।

বারেলালের দিন ঘনিয়ে এসেছিল। কিন্তু শেষ হবার আগে যে জঘন্য অপরাধ সে করল তার ফলই বোধহয় তাকে কিছুদিন পরেই পেতে হলো। রাতের আঁধারে খেড়িয়া গ্রামের দশজন যুবককে ঘুম থেকে উঠিয়ে একের পর এক গুলী করে মেরেছিল বারেলাল। সে রাতে গাঁয়ের কান্নার রোল শোনা গিয়েছিল অনেক দূর পর্যন্ত। কিন্তু কিছুদিন পরেই বারেলাল শেষ হলো, আর তার সঙ্গে শেষ হলো তার দলের ওরছা কাছী, শ্রীপালা আর গাদীপাল। মোরেনা শহরের ডাক-বাংলোর কিছু পেছনেই হয়েছিল সেই এনকাউণ্টার। মোরেনা জেলার সুপার মিঃ কদম সেদিন শোনাচ্ছিলেন সেই এনকাউণ্টারের কথা।

বারেলাল নিজেকে ভাবতো বিরাট কেউ কেটা। যখন দেখল সামনে টমিগান হাতে সুপার সাহেব নিজে, তখন বারেলাল ভাবল এ তো অপমানের ব্যাপার। সে এত বড় বাগী আর লড়বে মামুলী একটা পুলিশ সুপারের সঙ্গে! এ তো হতে পারে না। মহাভারতের যুদ্ধের মতো তখন কথাবার্তা শুরু হলো কদম সাহেব আর বারেলালের মধ্যে।

"তুম হট্ যাও কদম সাহাব। তুম সে ক্যায়া লড়েগা। তুম বাচ্চা হ্যায়।"—বারেলাল।

"চল চল। পিছে কিঁউ ছিপতা। আগে আনা। দেখতা হুঁ আজ তেরেকো।"—কদম।

"চল ভাগ যা। তেরে সে নহী লড়তা। বুলা আপনা আই-

জী. অউর ডি. আই-জী. সাহাবকো। বারেলাল উনসে লড়েগা।”— বারেলাল।

“আরে পহেলে মেরেসে তো লড়লে ফির লড়না আই-জী. ডি. আই-জীসে। তেরে লিয়ে ম্যায়হী কাফী হু”—কদম।

এরপর অবশ্য কদম সাহেব আর ডায়লগ বেশিক্ষণ এগোতে দেননি। ভাবলেন অত প্রোটোকলের মধ্যে না গিয়ে টমিগানটা কাজে লাগালেই ভালো হবে। হলোও তাই। আই. জী. আর ডি. আই-জীর সঙ্গে যুদ্ধ করার সাধ আর পূর্ণ হলো না বারেলালের।

কিন্তু পাণ্ডরী গাঁ অনেক দূরে ছেড়ে এসেছি। বলছিলাম পাণ্ডরী গাঁয়ের ঠাকুর সাহেবের বোন সোনচিড়ইয়ার কথা। তা তো এখনও বলা হলো না।

বাবুল গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। হরবিলাসের রক্তের দাগ কিন্তু আর নেই। অনেক দিন পর্যন্ত নাকি ছিল, লাল লাল, চাপ চাপ রক্ত গাছের গায়ে। কে যেন বলেছিল গাছটাকে কেটে ফেলতে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত সাহস আর কারোর হয়নি। ক'টা বাবুল গাছ আর কাটবে ? আরো কিছু বাবুল গাছ আছে পাণ্ডারীতে। দরকার হলে ঠাকুর সাহেব আবার সেগুলোও তো ব্যবহার করতে পারে। তারপর সেখানেও জমবে হরবিলাসের মতো লাল লাল চাপ চাপ রক্ত। একদিন আবার মুছে যাবে সেই দাগ, কিন্তু বাবুল গাছ নিশ্চল সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে থাকবে অনেক বছর। তারপর একদিন যখন সর্বনাশা অভিশপ্ত চম্বল মোড় নিয়ে ঘুরবে বাঁকা তলোয়ারের মতো, সেদিন বাবুল গাছগুলোও থাকবে না, আর থাকবে না পাণ্ডরী গাঁ। তারও অনেকদিন পরে হয়তো বা পাশের গাঁয়ের বৃদ্ধেরা কোনো কোনো দিন বিড়ি টানতে টানতে সন্ধ্যেবেলা ‘চৌপালে’ বসে গল্প করবে অতীত দিনের পাণ্ডরীর কথা। আর পাণ্ডরীর কথা উঠলেই কথা উঠবে ঠাকুর লাখনসিং আর হরবিলাসের কথা। সেই বিভ্রান্ত বৃদ্ধ বাপের কথাও উঠবে যার দুই ছেলেকে লাখনসিং ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর বাপ টাকা দেয়নি বলে তাদের খুন করে চম্বলের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকেই তখন হয়তো জোয়ান ছিল। অনেকে হয়তো

পাণ্ডরীতেই থাকত। পালিয়ে এসেছিল হয়তো, যখন চম্বল বেহড়ের মধ্যে দিয়ে শো শো করে ঢুকেছিল গাঁয়ের মধ্যে। তারা হয়তো শুনেছে রাতের বেলা বৃদ্ধ বাপের সেই বুক ভাঙা কান্না। বেহড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই কান্না ফিরে এসেছে গাঁয়ের ঘরে ঘরে। চিৎকার করেছে চম্বলের তীরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ বাপ আর ডেকেছে 'আজা মেরে লাল, আজা মেরে বেটে।' কিন্তু শুনেও কেউ শোনেনি। অনেক বাবুল গাছই ছিল পাণ্ডরী গাঁয়ে। বাবুল গাছ আর হরবিলাস। কেউ ভুলতে পারেনি। হয়তো পারবেও না। দিনের পর দিন চেঁচালেও বৃদ্ধের 'লাল আর বেটে' ফিরে আসেনি। সবাই জানতো কি হয়েছিল তাদের, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত কেউ তাকে বলেনি। যেদিন জানতে পারল বৃদ্ধ সেদিন থেকে আর কাঁদল না। বাবুল গাছটার সামনের রাস্তা ধরে গাঁয়ের আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে সোজা চলে গেল আরেকটা বাড়ির সামনে। দাওয়ার ওপর জুতোর লাথি মেরে থুতু ফেলে দিয়ে এল বাড়ির সামনে। লাখনের বোন সোনচিড়ইয়ার বাড়ি।

অনেকদিন পরে পাশের গাঁয়ের মেয়েরাও হয়তো বলবে সোনচিড়ইয়ার কথা। মাটির ঘড়া কাঁখে করে চম্বলে জল ভরতে যাবার সময় হয়তো তারা প্রগল্‌ভ হবে সোনচিড়ইয়ার আলোচনায়। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো পাণ্ডরী গাঁয়ে সোনাচিড়ইয়াকেও মাটির ঘড়া কাঁখে করে চম্বলে জল ভরতে যেতে দেখেছে। হেলে দুলে চলেছে সোনচিড়ইয়া। অহঙ্কারে মাটিতে পা যেন আর পড়ে না। কেনই বা পড়বে। ঠাকুর লাখনসিং-এর বোন সোনচিড়ইয়া। তার অহঙ্কার থাকবে না তো থাকবে কার? দু'বেলা জল ভরতে যেতে তাকে গাঁয়ের অনেক মেয়েই দেখেছে। আমিও তো দেখেছি। বাড়ি থেকে সবে পা বাড়িয়েছে আর আমি দাঁড়িয়েছি সামনে। প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল সোনচিড়ইয়া তারপরেই ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে চোখটা গোল গোল করে ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল—'কৌন হ্যাঁয় আপ। ক্যায়া চাহতে হ্যাঁয়। রাস্তা ছোড়িয়ে, মুঝে 'দের হো রহী হ্যায়।' দেরী হয়ে যাচ্ছিল সোনচিড়ইয়ার। রাস্তা ছেড়ে দিতে হুকুম দিয়ে প্রশ্ন করেছিল কে আমি আর কি চাই।

'কুছ বাতেঁ' করনা হ্যায়।' বললাম, কিছু কথা বলতে চাই।

আবার ঘাড়টা বেঁকিয়ে চোখটা গোল গোল করে ঝাঁঝালো গলায় সোনচিড়ইয়া জবাব্ দিয়েছিল—'আমার সময় নেই। আমি জল ভরতে যাচ্ছি।'

'আমি অপেক্ষা করব।'

হনহন করে চলে গিয়েছিল আমার সামনে দিয়ে। খানিকদূর গিয়েই পিছন ফিরে একবার তাকিয়েছে, তারপর তার অতি-নিজস্ব চলনভঙ্গিতে হেলে দুলে এগিয়ে গিয়েছে।

পাণ্ডরী যখন পৌঁছেছিলাম তখনও সকাল হয়নি। সবে পুবের আকাশটা লাল হয়ে এসেছে। এসে দাঁড়িয়েছিলাম বাবুল গাছটার নিচে। পাণ্ডরী গাঁয়ে আসতে হলে তো বাবুল গাছটাকে এড়ানো যায় না। আমার গা'টা ছমছম করে উঠেছিল যখন সঙ্গের লোকটা ফিসফিস করে কানের কাছে বলল—"এই গাছটাতেই তো।' গাছটাকে পেছনে রেখে সামনের রাস্তা ধরে গাঁয়ের আঁকা-বাঁকা গলি ধরে পৌঁছেছিলাম সোনচিড়ইয়ার বাড়ি। ঠিক সেই রাস্তা ধরে, সেই গলির বাঁক ঘুরে যেমন গিয়েছিল সেই বৃদ্ধ বাপ। সে দাওয়ার ওপর মেরেছিল লাথি আর ফেলেছিল থুতু। আমি চুপচাপ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম দাওয়ার সামনে। সোনচিড়ইয়া ঘর থেকে বেরিয়েই হকচকিয়ে গিয়েছিল। বেশ ছিপছিপে চেহারা, ফর্সা গায়ের রং। অনেক দিন আগে হয়েছিল বিয়ে। স্বামী থাকে কোনো অন্য শহরে। কোথায় কিসের মিলে চাকরি করে। কেই বা চেনে তাকে। যারা চেনে তারা বলে 'সোনচিড়ইয়া কা আদমী।' আর যারা চেনে না তারা বলে 'লাখন কি বহেন কা আদমী।' মাঝে মাঝে আসে গাঁয়ে, ক'দিন ঘুর ঘুর করে সোনচিড়ইয়ার আশে পাশে আবার বকুনি গালাগালি খেয়ে ফিরে যায় সেই কোন অন্য শহরে, যেখানে কিসের মিলে যেন চাকরি করে। তাকে না জানলেও, পাণ্ডরী আর তার কাছে কিনারায় সব গ্রামেই হাঁকডাক আছে সোনচিড়ইয়ার। থাকবে না-ই বা কেন। ঠাকুর লাখনসিং-এর বোন সোনচিড়ইয়া, তাকে না জানলে কেন চলবে। আর সোনচিড়ইয়া নিজেই কথাবার্তায় বেশ বুঝিয়ে দেয় তাকে না জানলে চলবে না। আঙুলের ইশারায় নাচিয়ে বেড়ায় সারা গাঁ'টাকে।

সঙ্গের লোকটা সোনচিড়ইয়ার বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছিল। আমার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও দাঁড়ায়নি। কে জানে বাইরের একটা লোককে তার বাড়ি নিয়ে গেলে সোনচিড়ইয়া হয়তো ক্ষেপে যাবে। কাজ কি? তার চেয়ে—'ব রহা মকান আপ্ যাইয়ে সাব।' ঐ রইল বাড়ি, আপনি যান বলে লোকটা অনেকটা ছুটেই পালিয়ে অনেকদূর গিয়ে আবার ফিরে এল।

'লাখন যদি পুলিশের গুলীতে মরে বা 'বাবা'র (বিনোবা ভাবে কাছে আত্মসমর্পণ করে আমি খুব খুশি হবো।' ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে লোকটা হঠাৎ বলে ওঠে। অবাক হয়ে যাই তার কথা শুনে। লোকটা বলে কি।

'তা তোমার খুশি হবার কি আছে। লাখন তো আর তোমার দুশমন না।' জিজ্ঞাসা করলাম।

'শুধু আমি কেন গাঁয়ের প্রত্যেকটা লোক খুশি হবে। যারা ঠাকুর সাহেবের বন্ধু, তারাও খুশি হবে।'

'তারাও খুশি হবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন।'

একেবারে কানের কাছে এসে লোকটা বলে ওঠে, ঠাকুর সাহেবের ওপর আমাদের অত রাগ নেই। কিন্তু সে গেলে অন্তত ঐ জাহাঁবাজ সোনচিড়ইয়ার প্রতিপত্তি গাঁয়ে শেষ হবে। আর সহ্য করতে পারছি না আমরা তার দেমাক আর অত্যাচার। কিছু হলেই নেকীর মতো কেঁদে ককিয়ে নিজের ভাইকে ইনিয়ে বিনিয়ে নালিশ করবে আর শুধু শুধু গাঁয়ের কয়েকটা লোকের ওপর লাখন করবে অত্যাচার। কতদিন আর সহ্য করা যায়। এক মিনিটও আর দাঁড়াল না লোকটা। ছুটে পালিয়ে গেল গাঁয়ের আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে, তারপর সোজা রাস্তা ধরে বাবুল গাছটার দিকে। পাণ্ডরী গাঁয়ের সবাইকে ঐ বাবুল গাছটা যেন টানে।

অনেকক্ষণ পরে সোনচিড়ইয়া জল ভরে ফিরে এসেছে। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্তি এসে গিয়েছিল। ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে পাতা উল্টোচ্ছিলাম। কখন যে সোনচিড়ইয়া এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করিনি। যখন সম্বিত ফিরে পেলাম

দেখি কাঁখে ঘড়া নিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সোনচিড়ইয়া। চোখাচোখি হতেই মুখটা গম্ভীর করে এগিয়ে এল সোনচিড়ইয়া।

অনেক দূর থেকে এসেছি। সোনচিড়ইয়ার মুখের গম্ভীর ভাব দেখে ভয় লাগল। যদি কথা না বলে। হয়তো বা আমাকে ভবেছে পুলিশের লোক। তাহলে কি ফিরে যেতে হবে? ঠাকুর সাহেবের বোন সোনচিড়ইয়ার সঙ্গে কিছু কথা না বলেই? ঠাকুর সাহেববের সেদিন তার বোনের কথা বললেই হতো। পরে ঠাকুর সাহেব হয়তো সোনচিড়ইয়াকে বোঝাতে পারত আমি পুলিশের লোক না। তাহলে হয়তো আবার কোনো একদিন পাণ্ডরী গাঁয়ে এলে, বাবুল গাছটার সামনের সোজা রাস্তা দিয়ে গাঁয়েব আঁকাবাঁকা গলি পথ ধরে চলে যেতাম দাওয়ার সামনে আর সোনচিড়ইয়া হেসে বলত—'আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে বাবুজী।' তা আর হয়নি, কিন্তু আমি পরে খবর পেয়েছিল। ঠাকুর সাহেব যখন আর একদিন এসেছিল পাণ্ডরীতে তখন সোনচিড়ইয়া আমার কথা বলেছিল। বলেছিল কে যেন এক 'আংরেজী আখবারওয়ালা' তার কাছে এসেছিল। অবশ্য ঠাকুর সাহেব কি জবাব দিয়েছিল তা আমি জানি না।

"ঘাবড়াইয়ে নহী"। ম্যায় পুলিশ কা আদমী নহী হুঁ"—মাথায় কি এল কথাটা বলে ফেললাম। ভেবেছিলাম আমাকে পুলিশের লোক মনে করে সোনচিড়ইয়া হয় ঘাবড়ে গিয়েছে, হয়তো তাড়িয়ে দেবাব ফন্দি খুঁজছে।

খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে সোনচিড়ইয়া হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল। ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো হাসি। সোনচিড়ইয়ার ছিপছিপে গড়নটা সেই হাসির ঝলকে দুলে উঠল। কাঁখের ঘড়া থেকে একটু জল ছলকে পড়ল। আবার হেসে উঠল খিল খিল করে সোনচিড়ইয়া।

দুম করে বইটা বন্ধ করে আমিও হেসে উঠলাম।

"আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে বাবুজী।" সোনচিড়ইয়া ঘরের ভিতর চলে গেল আর আমি দাওয়াতেই বসে রইলাম। সোনচিড়ইয়ার বাড়ির দাওয়াতে রোদের ঝলমলানি। পাণ্ডরী গাঁ

তখন জেগে উঠেছে। আমার দিকে আড়চোখে চাইতে চাইতে কয়েকজন লোক বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল। সব চলেছে সেই বাবুল গাছটার কাছেই যে স্কুল বাড়িটা আছে তার সামনের ছোট মাঠটাতে। আচার্য বিনোবা ভাবে আসবেন খানিক পরেই পাণ্ডরীতে।

ভালো দামী চা খায় সোনচিড়ইয়া। এক কাপ চা নিয়ে এল। নিজে হয় ভিতর থেকে খেয়ে এসেছে নয়তো পরে খাবে। জিজ্ঞাসা করিনি। হয়তো সোনচিড়ইয়া চা খায়ই না। তবে ঘরে দামী চা কেন? তাহলে কি ঠাকুর সাহেবের জন্য রাখা আছে চা? ঠাকুর সাহেব কি চা খায়? তা তো জানি না! হ্যাঁ, ফৌজদারসিংকে মারার আগের দিন ঠাকুর সাহেব জীবনে প্রথমবার মদ খেয়েছিল তা আমি জানি। সারারাত ধরে খেয়েছিল আর মুখে এক বুলি, "কিসিনে ধোকা কিয়া হ্যায়। কোন্ হ্যায় ওহ্?" অনেক এলোমেলো আজে বাজে চিন্তা মাথায় এসে জড় হয়ে উঠল। এক কাপ চা নিয়ে আবার, এত চিন্তা কি?"

"আপ নহী যায়েঙ্গে, বাবা (বিনোবা) কা দর্শন করনে?" আস্তে আস্তে বরফ ভাঙতে শুরু করি। সোনচিড়ইয়া যাবে না বিনোবাকে দেখতে? সারা গাঁ তো চলল তাঁকে দেখতে।

ঠোঁটটা উল্টে, চোখদুটো গোল গোল করে উত্তর দিল সোনচিড়ইয়া—"ক্যায়া ফয়দা?" কি লাভ? বেশি ঘাটিয়ে লাভ নেই। আমি জানতাম সে যাবে না। সারা গাঁ যখন গিয়েছে বাবুল গাছটার কাছেই স্কুল বাড়িটার সামনের মাঠটাতে "বাবা"কে দেখতে, পাণ্ডরীতে একা সোনচিড়ইয়া শুধু বসেছিল তার দাওয়াতে। সেদিন "বাবা"র প্রার্থনা সভায় আমারও যাওয়া হয়নি। আমিও বসেছিলাম দাওয়াতে। অনেকক্ষণ বসেছিলাম সোনচিড়ইয়ার সঙ্গে। অনেক কথা বলেছি। কথা বলতে বলতে কখন যে "আপ" থেকে "তুম" হয়ে গিয়েছে—নিজেই বুঝতে পারিনি। যখন ভুল বুঝতে পেরে "আপ" আর "তুম" নিয়ে একটা চরম গোলমাল বাধিয়ে বসেছি, সোনচিড়ইয়া আবার সেইরকম খিল খিল করে হেসে উঠেছে। ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো হাসি।

কেন যে সে "বাবা"র দর্শন করতে যায়নি তাও আমি জানতাম। সোনচিড়ইয়া নিজেও জানত। আমায় বলতে হয়নি কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম। "বাবা" এসেছে "ডাকু"দের হৃদয় পরিবর্তন করতে। সে এসেছে সবাইকে বলতে তাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন যদি ডাকাত থাকে তাহলে তাকে বোঝাতে, তার সামনে আত্মসমর্পণ করতে। বাবা পাণ্ডরীতে এসেছে লাখনের খোঁজে। তাকে না পেলে তার বোন সোনচিড়ইয়াকে। সে যেন তার ভাইকে পৌঁছে দেয় "বাবা"র বাণী। সে যেন আত্মসমর্পণ করে। "বাবা" কি করে বুঝবে যে, সে "ভাইয়া"র আদরের বোন হয়ে, লাখনকে কি করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। আত্মসমর্পণ মানেই তো ফাঁসি। কি করে বোন হয়ে সে তা পারবে। তাই তো পাণ্ডরীর সবাই যখন "বাবা"র প্রার্থনা সভায়, সোনচিড়ইয়া তখন আমার সঙ্গে দাওয়ায় বসে গল্প করছে। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার কথার মোড় ঘুরিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠছিল।

"বেশ নামটা তোমার। সোনচিড়ইয়া। সোনেকা চিড়িয়া। সোনার পাখি। ইংরিজিতে গোল্ডেন বার্ড। কে রেখেছিল নামটা?"

"কোন জানে। ভাইয়া বুলাত রহে কভু সোনচিড়ই, কভু সোনচিড়ইয়া।" একেবারে পাণ্ডরী গাঁয়ের ভাষায় জবাব দেয় সোনচিড়ইয়া, কে জানে? ভাই ডাকে কখনও সোনাচিড়ই কখনও সোনাচিড়াইয়া।

"বড় সুন্দর তোমার নাম। ভাইয়া তোমায় বুঝি খুব ভালোবাসে?" কথার ফাঁকে বলে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যায় সে। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে কি দরকার আমার এইসব জেনে। তার ভাই যে তাকে ভালোবাসবে এর মধ্যে আর জিজ্ঞাসা করবার কি আছে। আর সবাই তো জানে, লাখন পাণ্ডরীতে আসে আর প্রায়ই আসে। আমি নতুন "শহরীবাবু" বলেই এসব কথা জানি না। এই এলাকায় সবাই তো জানে।

"আমায় একবার দেখা করিয়ে দাও না তোমার ভাইয়ার সঙ্গে। আজ কাল পরশু যবে সে পাণ্ডরীতে আসবে, আমায় দেখা করিয়ে দাও একবার।"

সোনচিড়ইয়ার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"বাবুজী আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমায় এখন রুটি বানাতে হবে। তুমি যাও!"

একটাও কথা বলিনি আমি। জানতাম আমার প্রশ্নের উত্তর ঠিক এইরকমই কিছু পাব। ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে একটা খাম উঠিয়ে নিয়ে তার থেকে দুটো ফটো বের করে সোনচিড়ইয়ার সামনে ধরে বললাম—'দেখ তো এই ছবি দুটো তোমার ভাইয়ার কিনা?'

ইলেকট্রিকের শক লাগার মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিল সোনচিড়ইয়া। আমায় জিজ্ঞাসা করেনি কোথা থেকে আমি এই ফটো পেলাম। পাশে এসে অনেকক্ষণ ধরে বসেছে। মাঝে মাঝে আবার সেই খিল খিল করে হেসে উঠেছে। ভাইয়ার জন্যে দু'এক ফোঁটা জলও ফেলেছে আমার সামনে। রুটি বানাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে আর আমায় চলে যেতে বলেনি। যখনই উঠব উঠব করেছি, তখনই বলেছে, "বাবুজী রোটি খাকে যাও।" আবার অনেকক্ষণ সোনচিড়ইয়া আমার সঙ্গে গল্প করেছে। সব শুনেছে নিজের ভাইয়ার কাছে আর কিছু নিজেও জানে।

"আচ্ছা আপনে কভী বিজলী কা নাম শুনা?" বিজলী বলে কারোর নাম আমি শুনেছি কিনা জিজ্ঞাসা করে সোনচিড়ইয়া। বিজলীর কথাও জানতাম। কিন্তু সোনচিড়ইয়ার মুখ থেকে তা শুনবার জন্যেই বললাম, "না আমি তো বিজলীর নাম শুনিনি। আমি শুধু পুতলীর নাম শুনেছি।"

"তব তো আপ কুছ নহী জানতে"—আবার সেই খিল খিল করে হাসি। তারপর বিজলীর গল্প শোনালো সোনচিড়ইয়া। অনেকবার শোনা কিন্তু বেশ লাগল ওর কাছ থেকে শুনতে। পুতলীর পরই আরেক জনের ইচ্ছা হলো, সেও হবে দস্যুরাণী পুতলীর মতো একজন কেউকেটা। নিজের সাবেকী নাম পালটে রাখল বিজলীবাঈ। হঠাৎ একদিন নাম শোনা গেল নতুন এক ডাকাতের—বিজলীবাঈ। সাতদিনের মধ্যেই বিজলীবাঈ-এর "বাগী" জীবনের অন্ত হলো। না, বিজলীবাঈ নিজে একবারও গুলী ছোঁড়েনি আর পুলিশকেও ছুঁড়তে হয়নি। শুধু হাতে

হাতকড়ি পরিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল। ইন্সপেক্টর জেনারেল রুস্তমজী বলেন, "শী ইজ দি ক্লাউন ইন দি আদার-ওয়াইজ গ্রিম ড্রামা অব ব্যানডিট্রি।

"আরেকদিন কি হয়েছে জানো?" মন খুলে হাসতে হাসতে একটার পর একটা গল্প বলে চলেছে সোনচিড়ইয়া। "তোমাদের ভূপালে কে আছেন কাটজু সাহেব, তিনি সবাইকে বললেন কোথায় যেন খুব বন্যা হয়েছে তাই সবাই চাঁদা দাও। ঘুরতে ঘুরতে এখানকার নায়েব তহসীলদার চাঁদা চাইতে আমার কাছেও এলেন। আমি দিয়ে দিলাম দু'টাকা।"

"বাঃ খুব ভালো করেছ। খুব ভালো কাজ।"

"হ্যাঁ ভালো কাজ? ক'দিন পরেই ভাইয়া এল। আমায় সব জিজ্ঞাসা করল, কে কবে এসেছিল, কেন ইত্যাদি। আমি কথায় কথায় বলে ফেলেছি ঐ দু'টাকা চাঁদা দেওয়ার কথা। ভাইয়া তো রেগেই খুন।"

"কেন এতে আবার রাগের কি আছে?"

"তুমি আর কি বুঝবে। ভাইয়া বলল, আমার বোন হয়ে তুই মোটে দু'টাকা চাঁদা দিলি! লোকে শুনলে বলবে কি। আমার বেইজ্জতি হবে না? অন্তত পঁচিশ টাকা দেওয়া উচিত ছিল। ঝনাৎ করে পঁচিশটা টাকা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বলল, কালকেই দিয়ে আসবি। পরদিনই আমি অতদূর ভিণ্ড শহরে পঁচিশ টাকা নিয়ে যাই। কিন্তু কালেক্টর সাহেব বলল, চাঁদা নেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি তো টাকা ক'টা দিয়ে বলে এসেছি যাকে হয় দিয়ে দিতে। কে আবার ভাইয়ার কাছে জবাবদিহি করবে। ওরা আবার টাকাটা ক'দিন পরে ফিরিয়ে দিয়েছে। বল তো কি মুশকিল।"

ভিণ্ড জেলার সরকারী নথিপত্র খুঁজলে এখনও পাওয়া যাবে আসাম ও কাশ্মীর ফ্লাড রিলিফ ফাণ্ডে লাখনের বোন পাণ্ডরীর সোনচিড়ইয়ার নামে আগে দু'টাকা চাঁদা লেখা আছে।

আরো অনেক গল্প হয়তো বলতো সেদিন সোনচিড়ইয়া যদি না হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এক প্রেস ফটোগ্রাফার সেখানে উদয় হতেন। ফটো নিতে চাইতেই সোনচিড়ইয়া রেগে আগুন।

"কভী ভলে ঘরকে বহু বেটী আপনে ফোটো আখবারমে ছাপওয়াতে?" কখনও ভালো ঘরের বৌ মেয়েরা নিজেদের ছবি কাগজে ছাপায়? ভদ্রলোককে প্রায় তাড়া করতে করতে দাওয়া থেকে নামিয়ে দিয়েছিল সোনচিড়ইয়া। ভদ্রলোক তো পালিয়ে বাঁচলেন, কিন্তু আমার অনেক ক্ষতি করে গেলেন। যদিও খবরের কাগজে ফটো ছাপানোর বিষয়ে সোনচিড়ইয়ার মতের সঙ্গে আমার মিল নেই, তবুও তা বুঝিয়ে কোন লাভই হতো না। আলোচনার রেশে বাধা পড়েছে। সোনচিড়ইয়া চুপ হয়ে গেল।

দাওয়া থেকে নামতে নামতে তবুও একবার শেষ চেষ্টা করলাম। "আচ্ছা তোমার কি উচিত না তোমার ভাইয়াকে এই পাপের রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা? তুমি তো খুব ভালোবাসো তাকে আর তোমাকেও সে খুব ভালোবাসে। তাকে বল না ফিরে আসতে।"

চুপ হয়ে গেল সোনচিড়ইয়া। পাথরের মতো নিশ্চল দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর ধরা গলায় বলল, "বাবুজী কি পাপ আর কি পুণ্য, সে আমার চেয়ে আমার ভাইয়াই বেশি জানে। আর তাছাড়া যাকে তুমি আমি পাপ বলি, সে তো তার কাছে পাপ নাও হতে পারে। সে যদি তাকে পাপ না মনে করে, তাহলে আমি তুমি পাপ পাপ বলে চেঁচিয়ে কি করব বল! আর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে আনবার কথা বলছ? রাস্তা থেকে ফেরা মানেই তো পুলিশের কাছে 'হাজির' (আত্মসমর্পণ), করা। তার মানেই তো ফাঁসি। তুমি নিজেই তো বললে, আমি তাকে খুব ভালোবাসি। তাহলে বল কি করে আমি এত আদরের বোন হয়ে আমার ভাইয়াকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেব?"

আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সোনচিড়ইয়া নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙল—"বাবুজী, হামনে এক মাকা, দুধ পিয়া হ্যায়।" এক মায়ের দুধ খেয়েছে লাখন আর তার আদরের বোন সোনচিড়ইয়া। অকাট্য যুক্তি। আমার কাছে এর কোনো উত্তর ছিল না। ভিণ্ডের পুলিশ সুপার মিঃ পাহুজার ঘরে বসে লাখনের বড় ভাই মালখন সিংও আমায় বলেছিল, "এক মাকা দুধ পিয়ে হ্যায় হামনে।" টস টস করে সোনচিড়ইয়ার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আস্তে আস্তে সোনচিড়ইয়ার বাড়ির দাওয়া থেকে নেমে এসেছি। ঠাকুর সাহেবের মতো সেও আমায় বলেছে, "রাম রাম বাবুজী।" তারপর গাঁয়ের আঁকাবাঁকা গলি পেরিয়ে সোজা রাস্তায় এসে বাবুল গাছটার সামনে দিয়ে আর একটু এগিয়ে স্কুল বাড়ির কাছের মাঠটাতে দাঁড়িয়েছি। তখনও চলেছে বিনোবার প্রার্থনাসভা। সোনচিড়ইয়া আসেনি সেখানে। সন্ধ্যেবেলা বাবা নিজে গিয়েছিলেন সোনচিড়ইয়ার কাছে। কোনো ফল হয়নি। সোনচিড়ইয়ার হৃদয় পরিবর্তন হয়নি। কি করে হবে? তার হৃদয় যে তার ভাইয়ার ভালোবাসা আর স্নেহে ভরপুর। হৃদয় পরিবর্তন করে তো আর সে সেই স্নেহ আর ভালোবাসা ফেলে দিতে পারে না। নিরাশ হয়ে পাণ্ডবী গাঁ ছেড়ে পরদিন 'বাবা' চলে গিয়েছেন।

হয়তো সোনচিড়ইয়া জানে। আবার নাও জানতে পারে। কিন্তু আমি তাকে বলিনি। কি করে বলব যে, সুদূর জালোন জেলার আকবরপুরা গাঁয়ে তার ভাইয়ার রুগ্ন স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। শুধু একবার স্বামীকে দেখবার জন্যে কি আকুলিবিকুলি করছে। আর বেশি দূর তো নয়, কাছেরই ভাদাপুর গাঁয়ে লাখনের মা ছেলের জন্য রোজ সকাল সন্ধ্যা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। সে তো তারও মা। সেই মায়ের কথা নিয়েই তো আমায় বলেছিল, "বাবুজী এক মাকা দুধ পিয়ে হামনে।"

এ সব কথাই হয়তো সোনচিড়ইয়া জানে। কিন্তু একটা কথা সে জানে না। হয়তো তার ভাইয়াও তাকে কোনোদিন বলবে না। বিনোবার বাণী নিয়ে লাখনের সঙ্গে যখন একজন দেখা করতে যায় তখন ঠাকুর সাহেব কি জবাব দিয়েছিল আমি জানি। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল—"কোন হ্যায় ইয়ে বাবা। এয়সে বাবা বহোত সে ঘুমতে রহতে।" কে এই "বাবা"। এইরকম অনেক বাবা ঘুরতেই থাকে। তারপরেই বলেছিল, হ্যাঁ সে রাজি আছে হাজির হতে। কিন্তু এক শর্তে। হাজির হবার আগে তাকে যেতে দিতে হবে তার গাঁ নাগরাতে। গাঁয়ের সবাইকার সামনে সে কুকুরের মতো গুলী করে মারবে রঘুবীর সিংকে। তারপর "কুছ পরোয়া নহী ফাঁসি লাগ যায়ে।" আর যদি পারে, তাহলে কুইন সাহেবকেও।

এ তো হবে না। রক্তের লাল কালি দিয়ে লেখা এ শর্ত কেউ মানবে না। রুস্তমজী সাহেবের মন্টিক্রিস্টো লিস্টটা ছোটো হয়ে আসছে। তাঁর লাল পেন্সিলটা ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে একটা নামের ওপর—লাখন সিং। ঘুরতে ঘুরতে কবে যে হঠাৎ একবার থেমে নির্মমভাবে নামটার ওপর দিয়ে চলে যাবে কে জানে?

আর কমাণ্ডাণ্ট কুইন? সে তো বলেইছিল—"লেট হিম কাম টু নাগরা। আই উইল গেট হিম। আই উইল গেট হিম।" বৃদ্ধ রঘুবীর সিং তো শুধু বসে আছে তার লাশের ওপর থুতু ফেলবার জন্যে। যার রাইফেল আগে গর্জাবে সে জিতবে। কবে কার রাইফেল আগে গর্জাবে অভিশপ্ত চম্বলের "বেহড়ের" বুক বিদীর্ণ করে, কে জানে।

পনেরো

বদরী জীবনে শুধু একবারই রাইফেল চালিয়েছিল। শুধু একবার। প্রথমে বুঝতেই পারেনি কোথা থেকে কি হয়ে গেল। যখন বুঝতে পারল ছুটে পাঁচ মাইল দূরে পুলিশ থানায় গিয়ে রাইফেলটা সামনে ফেলে দিয়ে বলল—"আমি মেরেছি ওকে। গোলী সে উড়া দিয়ে ম্যায়নে উসকো।"

দারোগা সাহেব প্রথমে বুঝতেই পারেনি কে কাকে কেন মেরেছে।

'কিসকো মারা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল বদরীকে।

'অমৃতলাল কো আর মোতীরামকো'—নির্বিকারভাবে জবাব দেয় বদরী।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে গোপালপুর থানার দারোগা সাহেব। অমৃতলাল মারা গিয়েছে! কোথায়? দূরে জঙ্গলের দিকে দেখিয়ে দেয় বদরী। বলে চলো আমার সঙ্গে। ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। অনেক দূর যেতে হবে—চোরপুরার জঙ্গলের ভিতরে।

শুধু একবারই রাইফেল চালিয়েছিল বদরী জীবনে। ছোটোবেলায় এক আত্মীয়ের বিয়ের সময় আর একবার গাদা বন্দুক

চালিয়েছিল বটে কিন্তু সে কিছু নয়। এই প্রথম গুলী চালালো। শুধু একবার অমৃতলাল তার হাতে বন্দুক দিয়েছিল বিশ্বাস করে। সেই প্রথম আর সেই শেষবার। আর চাইও না বদরীর কোনো বন্দুক। বন্দুকটা দিয়ে সবে ঘুমে ঢলেছে অমৃতলাল আর তার ভগ্নীপতি মোতিরাম। কিছু না শুধু রাইফেলটা উঠিয়ে তাক করে একটা গুলী। মোতিরাম উঠতেও পারেনি। মোতিরামের বুকটা ফুঁড়ে গুলীটা লেগেছিল অমৃতলালের বুকে। উঠতে চেষ্টা করেছে অমৃতলাল। পাশে রাখা রাইফেলটা হাত দিয়ে চেপে ধরেছে কিন্তু পারেনি, সেখানেই ঢলে পড়েছে। খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়েছিল বদরী তারপরই ছুটে চলে গিয়েছে পাঁচ মাইল দূরে গোপালপুর থানায়।

কেউ বিশ্বাস করেনি প্রথমে। আমিও করিনি। শুধু আমি কেন, যখন প্রথম খবর আসে পুলিশের বড়কর্তারাও অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অমৃতলাল এত সহজে মারা পড়বে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। যে মরেছে সে অমৃতলাল তো? তাই তো কি করে হলো! কে মারল? এই প্রশ্নই দু'দিন ধরে সবাইকে উদ্বিগ্ন করেছে। কে এই বদরী? কেনই বা সে অমৃতলালকে মারল— এর কোনো সমাধান দু'দিন পর্যন্ত হয়নি। সাহস করে সঠিকভাবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে কাউকে কিছু জানানও হয়নি। দু'দিন পর যখন সব সন্দেহের ভার কমেছে তখন জানা গিয়েছে তার দলেরই বদরী দুর্ধর্ষ ডাকাত অমৃতলালকে মেরেছে। এত সাধারণভাবে অমৃতলালের শেষ হবে কেউ আশা করেন নি। এতবড় ধূর্ত ডাকাত, যে শুধু নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে প্রায় পনেরো বছর অবাধে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে এসেছে সে এত বড় ভুল করল কি করে? হয়। এমনিই হয়। শুধু একবার ভুল করেছিল অমৃতলাল আর তার মাশুল তাকে দিতে হয়েছে নিজের প্রাণ দিয়ে। কেন যে সে বদরীকে রাইফেল দিয়ে বিশ্বাস করল সে নিজেই হয়তো জানত না। ঐ একটা ভুল। কিন্তু বদরীর কাছে সেইটিই ছিল একটা আর শেষ সুযোগ। সে জানতো আর এইরকম সুযোগ জীবনে কোনোদিন সে পাবে না। তাই জীবনে প্রথম আর শেষবারের মতো রাইফেলটা তুলে ট্রিগারটা চেপে ধরেছিল।

হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়েছিল সেদিন শিবপুরী শহরে যখন পুলিশের ট্রাকে করে অমৃতলালকে আনা হয়েছিল। জীবনে অনেক লোককে সর্বস্বান্ত করেছে অমৃতলাল, তাই তার শেষ দেখতে এসেছিল দূর দূর থেকে অনেকে। বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি কেউ। দু'দিন পরে পচা গন্ধ বেরতে শুরু করেছিল। তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল লাশ। তারপর শহর থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে জ্বালানো হয়েছিল পুলিশের পাহারায়। চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল অমৃতলালের বৃদ্ধা মা আর চিতার আগুন যেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে অমৃতলালের বউ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছে। সঙ্গে তার কোলের ছোটো ছেলে। বৃদ্ধা মা আর বউ দেখতে পারেনি সে পচা শব। কেমন যেন চেহারাটা হয়ে গিয়েছিল অমৃতলালের। আমার কিন্তু এখনও চোখের সামনে ভাসছে অমৃতলালের সেই চেহারার কথা। বিরাট চেহারা, বড় বড় গোঁফ আর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো। অনেক দিন হয়ে গিয়েছে তবুও এখন মাঝে মাঝে চেহারাটার কথা মনে পড়ে। প্রথমবার গিয়েছি মধ্যপ্রদেশের দস্যু-অধ্যুষিত এলাকায়। অভিশপ্ত চম্বলের উপত্যকায় ঘুরতে ঘুরতে এসেছি শিবপুরী জেলাতে। দস্যু-সর্দার অমৃতলালের রাজত্ব শিবপুরীতে। সারা শিবপুরী জেলা অমৃতলালের আতঙ্কে কাঁপতো। পুলিশ হিমসিম খেয়েছে, তবু অমৃতলালের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। তার বুদ্ধি, তার ক্ষিপ্রতা আর তার ধূর্ততার সামনে প্রতিবারই পুলিশ হয়েছে নাস্তানাবুদ। খুন-জখমের দিকে অমৃতলালের ঝোঁক কমই ছিল। নেহাত দরকার না হলে সে রাইফেল ওঠায়নি। খুন যে করেনি তা নয়—১০।১২টা খুন সেও করেছে, কিন্তু হত্যার পক্ষপাতী সে ছিল না। বেকায়দায় পড়ে করতে হয়েছে বলেই করেছে, নয়তো কোনো শত্রুকে পথ থেকে সরাবার উদ্দেশ্যে বন্দুক চালিয়েছে। জীবনে তার শুধু ছিল এক লক্ষ—টাকা, টাকা, টাকা। লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেছে অমৃতলাল শুধু অপহরণ করে। এক-একজনকে অপহরণ করে র‍্যানসম পেয়েছে প্রচুর। কিছুদিন চুপচাপ। টাকা ফুরিয়েছে, আবার করেছে অপহরণ। আবার টাকা। টাকা উড়োতে গিয়েছে বম্বে, দিল্লী, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ—নাচ, গান, মদ আর মেয়েমানুষ।

ভারতবর্ষের কোনো শহরেই এমন কোনো নামজাদা হোটেল নেই, যেখানে অমৃতলাল কিছুদিন থাকেনি। কিন্তু সেই মদ-মেয়েমানুষই তার কাল হলো। একা শিবপুরী জেলাতেই এক সময় অমৃতলালের এগারোটা মেয়েমানুষ ছিল। শেষে ঐ বদরীই চরম প্রতিশোধ নিল। গুমরে গুমরে থেকেছে বদরী আর খুঁজেছে সুযোগ। মেয়েমানুষের নেশা পাগল করেছিল অমৃতলালকে, নইলে নিজের দলেরই লোকের বোনের ওপর কেউ কুনজর দেয়! সহ্য করতে পারেনি বদরী। শুধু একবার সুযোগ পেয়েছিল, আর সেই সুযোগ সে হারায়নি। কিন্তু অদ্ভুত চরিত্র এই অমৃতলালের। যাকে নিজে একবার বোন বলে ডেকেছে, তার গায়ে আঁচড়টা লাগতে দেয়নি। শিবপুরী জেলায় গেলেই শোনা যাবে অমৃতলালের সেই পাতানো বোনেদের কথা। প্রতি রাখীবন্ধনে সে শত বিপদ তুচ্ছ করে তাদের কাছে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের দিয়েছে প্রচুর উপহার আর রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি। নিজের মাকে চিরকাল ভয় করেছে আর ভালোবেসেছে ছোট্ট শিশুর মতো। প্রতি শ্রাবণ মাসেই এসেছে মা'র কাছে আর নিয়ে গিয়েছে তার আশীর্বাদ। সেদিনও হয়তো চলেছিল মা'র কাছে কিংবা ফিরে আসছিল মা'র আশীর্বাদ নিয়ে। কিন্তু বদরীর বোনের কথা ভুলতে না পেরে, তাকে পাবার আশায় পাগল হয়ে চলেছিল সেই গাঁয়ের দিকে। সঙ্গে ছিল বদরী নিজে। সন্ধ্যেবেলাতেই পোঁছে যেত সেই গাঁয়ে। দুপুরের ঘুমের লোভটাও ছাড়তে ইচ্ছে হয়নি। সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে একটু, অমনি বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠেছে। সামনে দেখছে রাইফেল-হাতে বদরী। তার চোখে আগুন—প্রতিশোধের আগুন। রাইফেলটা উঁচিয়ে শেষ করে দিতে গিয়েছিল 'বেইমান'টাকে, কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। গভীর বনের মধ্যে শোনা গিয়েছিল শুধু একটা গুলীর আওয়াজ। বদরীর জীবনের প্রথম ছোঁড়া গুলী—আর শেষও কারণ বদরী আর গুলী চালাবে না, আর তার চালাবার দরকারও নেই। তার প্রতিশোধ সে নিয়ে নিয়েছে। তারপর ছুটে গিয়েছে বদরী থানায়। বৃষ্টি এসেছে ঝম্‌ঝম্‌ করে। অনেক দূরে, শহর থেকে অনেক দূরে হয়েছিল সেই ঘটনা। বন-জঙ্গল পেরিয়ে, ঝড় জলের মধ্যে দিয়ে যখন অমৃতলালের লাশ

এসেছে শিবপুরী শহরে দু'দিন পরে, তখন পচা গন্ধ বেরোচ্ছে তা থেকে। কেউ দেখতে পারেনি সেই বিকৃত মৃতদেহ। অমৃতলালের মা-বউও পারেনি। কি ছিল চেহারা, আর কি হয়েছে। আমার চোখের সামনেও মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তার চেহারাটা। বেশি মনে পড়ে জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর কথা। মুহূর্তে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে সেই চোখের কোণে।

শক্ত হাত দুটো দিয়ে আমার একটা হাতে প্রবল ঝাঁকি দিয়ে জীপে উঠতে উঠতে বলেছিল—"আচ্ছা, ফির মুলকাত্ হোগী।" চললাম আবার দেখা হবে কোনদিন।

"পর আপকী তারিফ?"—আপনার পরিচয় তো জানতে পারলাম না, হঠাৎ-আসা আগন্তুককে বলেছিলাম।

"মুঝে অমৃতলাল কহতে হ্যাঁয়।" আমায় অমৃতলাল বলে সবাই ডাকে। হো-হো করে হাসতে হাসতে বিরাট শরীরটা দুলিয়ে অমৃতলাল জীপে গিয়ে উঠেছিল চোখের কোণে হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরেছিল।

আমার হাতের হুইস্কির গ্লাসটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল কাঁচের টুকরো। দৌড়ে গিয়েছি জীপের দিকে। স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুনতে পেয়েছি সেই হো-হো করে হাসি। আর দেখতে পেয়েছি পিছন থেকে, স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে আছে বিরাট একটা চেহারা। সে চেহারা আমি ভুলতে পারব না। সেই চেহারাই হয়েছিল বিকৃত, পচা গন্ধ বেরোচ্ছিল, আর সেই বিদ্যুতের ঝিলিক-মারা চোখ দুটো বুজে গিয়েছিল। সবে যে তন্দ্রা এসেছিল, তখনই তো বদরী রাইফেলটার ট্রিগার চেপে ধরেছিল। আর সেই গোঁফ জোড়া? ধনুকের ছিলার মতো কোণ দুটো উঁচিয়ে রাখত অমৃতলাল সব সময়। সেই গোঁফ নেমে গিয়েছিল নিচের দিকে আর নাক থেকে গড়িয়ে-পড়া বিন্দু বিন্দু কালো কালো রক্ত জমাট বেঁধেছিল তার ওপর। কিন্তু কপালের ওপরেই কয়েকগাছি সাদা চুল—পুলিশের আইডেন্টিফিকেশনের একমাত্র পরিচয় "a dash of white hair drooping on the forehead"—তেমনিই ছিল। বেশ মনে পড়ে আমার কয়েকগাছি সাদা চুল। ঘরে

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সাদা চুল ক'গাছিই আমার প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কপালের ওপর একটু তেরছাভাবে সাদা চুল ক'গাছি ঝুলে পড়েছে। আমি যখন দেখেছিলাম, তখন কালো ছিল বাকি সব চুল, শুধু ঐ ঝুলে-পড়া ক'গাছি "a dash of white hair" ছাড়া।

ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছেছিলাম শিবপুরী জেলার এক ফরেস্ট রেস্ট হাউসে। সবে টিফিন কেরিয়ারটা খুলে খেতে বসব, বাইরে শুনতে পেলাম জীপের আওয়াজ। জীপ থেকে নামল খাকী জামা-কাপড়পরা এক দীর্ঘকায় পুরুষ। কাঁধে ঝোলানো দামী রাইফেল। সঙ্গে আরেকজন লোক। খাকী-পরা আগন্তুক আমার ঘরে বসে খাবার অনুমতি চাইল। অনুমতি না দিয়েও কোনো উপায় ছিল না, মোটে একটাই ঘর। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে শুরু হলো কথাবার্তা। আগন্তুকের বাস্কেট থেকে বেরুলো দামী দামী মদের বোতল। "কেয়া শোখ্ করেঙ্গে আপ? হুইস্কি, জিন, ব্রাণ্ডি?" আমি তো থ। এই জঙ্গলের মধ্যে আবার জিজ্ঞাসা করে, কি খাব! অনেক আপত্তি জানানো সত্ত্বেও হুইস্কির বোতল খুলল। আলাপ জমে উঠল। প্রশ্ন হলো—আমি কেন এই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বললাম, মধ্যপ্রদেশের ডাকাতি সমস্যা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছি আর কি!

এক মুহূর্তের জন্যে আগন্তুকের চোখে বিদ্যুতের ঝলক দেখলাম। সেদিন খেয়াল করিনি। কিন্তু পরে সব মনে হয়েছিল সেই সাক্ষাতের টুকরো টুকরো ছোটো ছোটো প্রত্যেকটা ঘটনা। অনেকক্ষণ চলেছে আলোচনা। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছি আগন্তুককে অমৃতলাল ডাকাত সম্বন্ধে। আবার চোখের কোণে সেই বিদ্যুতের ঝিলিক। জবাব পেলাম অমৃতলালকে শিবপুরীর প্রায় সবাই জানে। গড়িয়ে গড়িয়ে কথা চলল অমৃতলালের।

"কিন্তু সবাই যদি তাকে চেনে, তাহলে কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার থাকা সত্ত্বেও সে ধরা পড়ছে না কেন?"

হো-হো করে বিরাট হাসি শুনতে পেলাম। জঙ্গলের নিস্তব্ধ পরিবেশে অদ্ভুত শোনাল সেই হাসি। "পুলিশকো আগর ইয়ে খেয়াল হ্যায় কি বিশ হাজার রুপয়াসে অমৃতলাল পাকড়া যায়েগা,

তো বেকুফ হ্যায় ওহ্।" যদি পুলিশ ভাবে যে, শুধু কুড়ি হাজার টাকায় অমৃতলাল ধরা পড়বে, তাহলে, তাদের বুদ্ধি নেই।

"পর কুঁ্য ?" কিন্তু কেন।

জবাব পেলাম না। আগন্তুক তার সঙ্গী নিয়ে উঠে পড়ল।

শুধু বুদ্ধি। শুধু বুদ্ধির জোরে অমৃতলাল অনেক কিছু করে গিয়েছে। শেষ মুহূর্তে শুধু একটা মাত্র ভুল করেছিল বদরীর হাতে রাইফেল দিয়ে তাকে পাহারা দিতে বলে, নিজে ঘুমতে গিয়ে। বদরীর কোনো ভুলই হয়নি। তার মাথায়ও বুদ্ধি এসেছিল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আর সে সুযোগ সে হারায়নি। বড় গর্ব করে বলেছিল অমৃতলাল, কুড়ি হাজার টাকায় তাকে পাওয়া যাবে না। এখন বদরীই হয়তো সেই কুড়ি হাজার টাকার ইনাম পাবে অন্তত পুলিশের তাই মত। কানুনী পণ্ডিতরা এখন মধ্যপ্রদেশে মাথা ঘামাচ্ছেন বদরীকে ইনামটা দেওয়া যায় কিনা ? কেউ বলেন, বদরী খুনী—একটা না, দুটো খুন করেছে সে—অমৃতলাল আর তার ভগ্নীপতি মোতিরামকে। মনে হচ্ছে মতটা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াবে যে, অমৃতলালকে "dead or alive", জীবন্ত বা মৃত যে এনে দেবে সেই পাবে কুড়ি হাজার টাকার পুরস্কার; তা হোক না সে সে তার দলেরই লোক। আর বদরীর নিজের বিরুদ্ধে তো আর কোনো অপরাধ পুলিশের রেকর্ডে নেই। কিন্তু শিবপুরীর কিছু লোকে বলবে পুলিশই বদরীকে অমৃতলালের দলে ঢুকিয়েছিল ইচ্ছে করে (Plan)। রুস্তমজী সাহেবের নাকি এই ছিল মাস্টার স্ট্র্যাটেজী (Master Strategy)।

বদরী কিন্তু মাথা মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে আমায় বলেছিল—"ঝুট্ বাত।" মিথ্যা কথা। আমি পুলিশের লোক না। সে বদলা নিয়েছে। তার বোনের ওপর কুদৃষ্টি দিয়েছিল অমৃতলাল। সে সহ্য করতে পারেনি। তার সামনে অমৃতলাল তার বোনের ইজ্জত নষ্ট করবে আর সে ভাই হয়ে তা সহ্য করবে! ভেবে ভেবে অনেক কষ্টে সে অমৃতলালের বিশ্বাস অর্জন করেছিল। অমৃতলাল তাকে বিশ্বাস করে ভুল করেছিল। কিন্তু বদরী কোনো ভুল করেনি।

মধ্যপ্রদেশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও অমৃতলালের সঙ্গে তাঁর নিজের সাক্ষাতের কথা বলতে পারতেন। শিকারে গিয়েছিলেন নিজের স্ত্রী-কন্যা নিয়ে। হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল অমৃতলালের দলের সঙ্গে।

"হাউ ডু ইউ ডু। আই অ্যাম অমৃতলাল", বলেছিল সে।

তার পরেই সে দেখতে চেয়েছিল সাহেবের দামী রাইফেলটা। সাহেব তখন ভাবছেন, এখনও হাতে রাইফেলটা আছে, বিপদে হয়তো কাজে আসতে পারে, কিন্তু একবার যদি অমৃতলালের হাতে চলে যায়, তাহলে কোনো উপায়ই থাকবে না। কি করবেন, স্থির করতে দেরী হচ্ছিল। বেশি দেরি কিন্তু অমৃতলালের হয়নি তাঁর মনোভাব বুঝতে। নিজের দামী রাইফেলটা সাহেবের হাতে দিয়ে বলে, "ততক্ষণ আপনি আমারটা নিজের কাছে রাখুন আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? রাখুন। রাখুন। আমার রাইফেলটাও বেশ দামী।"

নিজে যেচে তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে আর নিয়েছে সাহেবের গুলী-লাগা আহত যে হরিণটা পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে মারবার অফার। সাহেবের স্ত্রীকে নিজের বোন বলে সম্বোধন করেছে আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিপদে-আপদে রক্ষা করার।

যে অমৃতলাল মদ-মেয়েমানুষের জন্যে পাগল ছিল, সেই অমৃতলালই যাকে ভালে লেগেছে, তাকেই বোন বলে ডেকেছে। আবার কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে, তারও ইয়ত্তা নেই। নিজের দলের লোক বদরীর বোনের সর্বনাশ করতেই তো উদ্যত হয়েছিল! সেই হলো তার কাল।

আর তার সঙ্গে শেষ হলো তার নিজের ভগ্নীপতি মোতিরাম। নিজের বোনের 'ইজ্জত' বাঁচাতে গিয়ে বদরী অমৃতলালের বোনেরই করল সর্বনাশ। বদরীর বোনের সর্বনাশ করতে গিয়ে অমৃতলালের নিজের বোনই হলো বিধবা।

এই হলো শিবপুরী জেলার গণেশখেড়া গ্রামের অমৃতলাল কিরার।

গণেশখেড়া গাঁয়ের কাছেই পোহরী। পোহরীর আদর্শ

বিদ্যালয়ে আট ক্লাস পর্যন্ত পড়ে অমৃতলাল যখন হঠাৎ একদিন ঘরে বসে রইল, বাপ ভগবানলালের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আবার যখন সে হঠাৎ স্কুল-মাস্টারী শুরু করল, ভগবানলাল তখন খুশিই হলো। আদর্শ জীবিকা নিতে চলেছিল তার ছেলে। কিন্তু এই সুখও একদিন উবে গেল কর্পূরের মতো। অমৃতলাল মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে আবার ঘরে ফিরে এল আর কিছুদিন পরেই সাধারণ চুরির অপরাধে ধরা পড়ল। বৃদ্ধ ভগবানলাল চোখে অন্ধকার দেখল।

জীবনের প্রথম অপরাধ অমৃতলালের সেই চুরি। আজ থেকে প্রায় ২১ বছর আগেকার কথা। ত্ব'-এক মাস জেল খেটে হয়তো সেই তার শেষ অপরাধ হতো, কিন্তু অদ্ভুত বুদ্ধি অমৃতলালের, জাগীর লক্-আপ থেকে একদিন গরাদ ভেঙে পালাল আর সঙ্গে নিয়ে গেল তুটো মাজ্‌ল্-লোডিং বন্দুক। তারপরই উত্তরপ্রদেশের কুখ্যাত ডাকাত গোপীর দলে অমৃতলালের খোঁজ পাওয়া গেল। গোপীর কাছে নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দিতে গিয়ে অমৃতলাল ইটাওয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে করল তুঃসাহসিক ডাকাতি।

সেদিন যখন ইন্সপেক্টর-জেনারেল রুস্তমজী সাহেব তাঁর মস্টিক্রিস্টো লিস্ট থেকে লাল পেন্সিল দিয়ে অমৃতলালের নামটা কেটে দিলেন, তাঁর মুখ দিয়ে যে কথাটা বেরিয়েছিল, তা আমার আজও মনে আছে "দি কানিং ফক্স"। শুধু ধূর্ততা আর সাহসের উপর নির্ভর করে অমৃতলাল অবাধে চালিয়ে গিয়েছে দস্যুবৃত্তি। ইটাওয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির ডাকাতির পরেই অমৃতলাল কানপুরের এক মিল থেকে কিছু বন্দুক নিয়ে উধাও হলো। কিছুদিন পরে গোপী ধরা পড়ল গোয়ালিয়রে। অমৃতলালের তখন নাম হয়েছে "বাবু দিল্লীওয়ালা"। গোপীর দলের নেতা হয়ে সে একটার পর একটা অপরাধ করে চলল বিনাবাধায়। কিন্তু বেশিদিন চালাতে পারল না অমৃতলাল—ধরা পড়ল আগ্রায় আর ২৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো। আবার সে এক তুঃসাহসিক কাজ করল। কোলারস জুডিশিয়াল লক্-আপ থেকে সে পালাল। তু'বছর পরে আবার ধরা পড়ল অমৃতলাল। এবারে

গোয়ালিয়র শহরে। আবার পালাল অমৃতলাল গোয়ালিয়র সেণ্ট্রাল জেল থেকে।

জেল থেকে পালিয়ে এসে অমৃতলাল দেখল তার দলে ভাঙন ধরেছে। তার মদ আর মেয়েমানুষের নেশা দলের কারোরই পছন্দ না। এদেরই একজন একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে গুলী মারল, কিন্তু অমৃতলালের নসীব ভালো, সে বেঁচে গেল। দলের সেই লোকটার মৃতদেহ অবশ্য পরদিনই পাওয়া গেল মাঠের মধ্যে। সেই ঘুমন্ত অবস্থায়ই এই ঘটনার প্রায় দশ-বার বছর পরে অমৃতলালের ইহলীলা শেষ হয়েছে বদরীর হাতে। অমৃতলাল সাবধান হলো, দল থেকে উত্তরপ্রদেশের সব লোকদের বেছে বেছে তাড়াল।

অমৃতলালকে ধরবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন শিবপুরীর এস. পি. মিঃ চুনীলাল। কয়েকবার হলো এনকাউণ্টার। অমৃতলাল বেশ ঘা খেল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। অমৃতলাল ভাবল, পথের কাঁটা চুনীলালকে সরাতে হবে। সেদিন চুনীলালের আসার কথা ছিল কোলারস পুলিশ স্টেশন ইন্সপেকশনে। অমৃতলাল দেখল এই সুযোগ। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল থানার উপর দলবল নিয়ে। চুনীলালকে কিন্তু কিছুই করতে পারল না অমৃতলাল। বরাত জোর, তিনি মোটে পাঁচ মিনিট আগে থানা ছেড়ে গিয়েছিলেন। কে যেন খবর দিয়েছিল কাছেই কোথায় বাঘ এসেছে। শিকারের নেশা কাটাতে না পেরে চুনীলাল থানার দারোগাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাঘের খোঁজে। বলেছিলেন থানার ইন্সপেকশন পরে হবে। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে যখন বাঘ মেরে ফিরে আসেন, কোলারস থানা তখন রক্ত গঙ্গায় ভাসছে। ক'জন পুলিশ কনস্টেবলকে মেরে রেখে অমৃতলাল থানার সব বন্দুক আর কার্তুজ নিয়ে পালিয়েছে।

অমৃতলালের মাথার ওপর ঘোষিত হলো ২০,০০০৲ টাকার পুরস্কার।

> "In the succeeding years he managed to establish a reign of terror. His strategy was one of extreme cunning and each of his crimes was planned with a deliberation

and foresight which could have matched a military operation. Every detail was worked out. Every move of the authorities was known to him through a net-work of spies and informers, that was wide-spread and lucratively paid".

—পুলিশের রেকর্ডে অমৃতলালের একের পর এক অত্যাচারের কথা উঠতে লাগল।

কিছুদিন চুপচাপ অমৃতলাল। কর্তারা সবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন, অমনি অমৃতলাল আরেকটা দুঃসাহসিক ডাকাতি করল। বিজয়া দশমী রাজপুতদের শুভদিন। উমরীর রাজাসাহেবও সেদিন নিজের প্রাসাদের সব অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রেখে পুজো করছিলেন অনেকদিনের রীতি বজায় রেখে। হঠাৎ তাঁর প্রাসাদে আগমন হলো এক সম্ভ্রান্ত খয়েরের ঠিকাদার সাহেবের। খয়েরের ব্যবসাদাররা ওদিকে নামী লোক আর তাঁদের প্রতিপত্তিও প্রচুর। প্রাসাদের প্রহরীরা সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দিলে ঠিকাদার সাহেবকে। তিনি সোজা গিয়ে উঠলেন পুজোর ঘরে, যেখানে অস্ত্র পুজোয় ব্যস্ত ছিলেন রাজাসাহেব। খয়েরের ব্যবসাদার শুধু পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে সবাইকে ভয় দেখিয়ে প্রত্যেকটি অস্ত্র দখল করল। একটা গুলীও ছুঁড়তে হলো না। এক ফোঁটা রক্তের দাগও কোথায় পড়ল না। তারপর এক ঘণ্টা ধরে প্রাসাদ তছনছ করে ঠিকাদাররূপী অমৃতলাল ৭৫,০০০৲ লুঠ করে বিনা বাধায় উমরী ছেড়ে চলে গেল।

নূতন মধ্যপ্রদেশ তৈরী হলো। এইবার সবাই ভাবল, অমৃতলালের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথায়। মোরেনা জেলার পালিঘাট গাঁয়ের কাছে হঠাৎ একদিন অমৃতলাল এক বাসভর্তি বরযাত্রীর দলকে আটক করে ৪০,০০০৲ টাকা লুঠ করল। শুধু তাই না, বরযাত্রী দলের মধ্যে ধনী এক শেঠজীকেও ধরে নিয়ে গেল অমৃতলাল। শেঠজী ছাড়া পেলেন কিছুদিন পরে ৬০,০০০৲ টাকা খেসারত দিয়ে।

সারা প্রদেশে অমৃতলালের চাঞ্চল্যকর অপরাধের আলোচনা। পুলিশ আর গভর্নমেণ্টকে দিনের পর দিন মন্তব্য শুনতে হয় খবরের

কাগজ আর বিধান সভায়। উপ-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নরসিং রাও দিক্ষীত ডাকলেন বড় কর্তাদের মিটিং! তৈরী হলো "অপারেশন অমৃতলাল"। "অপারেশন অমৃতলাল" যোজনার কালি বোধহয় তখন শুকিয়েও ওঠেনি—অমৃতলাল আবার মোক্ষম ধাক্কা দিল পুলিশ আর গভর্নমেণ্টের "প্রেস্টিজে"। কিন্তু এর কিছুদিন আগেই অমৃতলাল হাত পাকাল ধামারের ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে ডাকাতি করে। ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে ছিল উৎসব সেদিন। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো কুড়িজন লোক নিয়ে অমৃতলাল উৎসবের বাতি নিবিয়ে দিয়ে অস্ত্র আর প্রচুর টাকাকড়ি নিয়ে গেল আর সঙ্গে নিয়ে গেল ঠাকুর সাহেবের তু'জন আত্মীয়কে। এর কিছুদিন আগে দিনত্বপুরে গোয়ালিয়রের কাছেই বম্বে-আগ্রা রোডের ওপর থেকে তু'জন লোককে অমৃতলাল তুলে নিয়ে গেল।

"অপারেশন অমৃতলাল"-এর তোড়জোড় চলছে। সেদিন ছিল দোল। শিবপুরী থেকে বম্বে-আগ্রা রোডে হনুমান মন্দিরে দোল উৎসব করতে গিয়েছে একদল লোক ট্রাকে করে। দোলের উৎসব তখনও শেষ হয়নি, অমৃতলাল ঘিরে ফেলল সবাইকে। শিবপুরীর নামকরা ধনী পরিবারের ১১ জন লোককে ধরে, নিজে ট্রাক চালিয়ে তাঁদের নিয়ে গেল গভীর জঙ্গলে। তিনজন লোককে পরে ছেড়ে দিয়ে বাকী আটজনকে চার মাস পরে বেশ কিছু অর্থের বিনিময়ে অমৃতলাল রেহাই দেয়। অবশ্য অমৃতলাল যাদেরই যখন অপহরণ করেছে, তাদের নাকি রাজার হালেই রাখত। টাকা না পেলে অবশ্য তারা পেত স্বর্গের সুখ।

বম্বে-আগ্রা রোডের হনুমান মন্দিরের অপহরণই অমৃতলালের জীবনের শেষ বড় ক্রাইম। কিছুদিন অমৃতলাল চুপচাপ। খবর পাওয়া গেল সে নাকি ঠাকুর লাখনসিংকে ৫০,০০০৲ টাকা ধার দিয়েছে—"A Banker among bandits" বললেন রুস্তমজী সাহেব। লণ্ডন টাইমস নাম দিল "the scholarship boy gone wrong" কেউ কেউ আবার বলত, the elusive pimpernel"।

মধ্যভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নরসিং রাও দিক্ষীত মানসিংকে মারবার বর চাইতে গিয়েছিলেন অমরনাথ। দিক্ষীতজী এবার গেলেন

সুদূর নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে। বর চাইলেন অমৃতলালের "মৌত" (মৃত্যু)।

অমৃতলালের পতন শুরু হলো। অনেক টাকা জমেছে। খরচ করতে হবে তো? ভেসে চলল অমৃতলাল মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে। একটুর জন্যে বেঁচে গেল বুধানাহার আর নাওলপুরার এনকাউণ্টারে। সন্দেহ করল অমৃতলাল দলের দৌলতসিং-এর ভাই মঙ্গলসিংকে। নির্মমভাবে সেই রাত্রেই অমৃতলাল গুলী করে মারল দৌলতসিংকে। জীবনে আর একটা ভুল করল অমৃতলাল। পরের দিন সকালে দলের লোকেরা করল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সুলতানসিং আর দেবীশিকারী দল ছেড়ে তৈরি করল আলাদা দল। অমৃতলালের কাছে রইল শুধু দু'জন লোক। বিপদ ঘনিয়ে এল অমৃতলালের উপর। কার কাছে পাবে সাহায্য, কোথায় পাবে লোক, কে দেবে সময়-অসময়ে আশ্রয়। ছুটে গেল অমৃতলাল অতীতের স্মৃতিবিজড়িত পোহরী গাঁয়ে। ভগ্নীপতি মোতিরাম থাকে পোহরীতে। গাঁয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি মোতিরাম—কেন্দ্র পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ। ছোটোখাটো একটা ডাকাতি কেসে ফেঁসে আছে। তখন জামিনে খালাস। সে হয়তো সাহায্য করতে পারে। আর করবে না-ই বা কেন। ডাকাতি কেসের ছ'জন সাক্ষীকে তো ভগ্নীপতির কথায় অমৃতলাল এক রাতেই সাবাড় করেছে। মোতিরাম রাজী হয়ে গেল এক কথায়। অমৃতলাল ভগ্নীপতির সাহায্যে আবার গড়ে তুলল দল। আশা ছিল, সুলতানসিং হয়তো আবার দলে ফিরে আসবে। সুলতানসিংকে তার দরকার। সব এনকাউণ্টারেই সুলতানসিং করত নেতৃত্ব। সব কিছু জানত সুলতানসিং, আগে পুলিশে কাজ করত তো। অমৃতলালের আপসের শর্ত নিয়ে যেদিন তার লোক সুলতানের কাছে পৌঁছল, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আগের দিন রাতে পুলিশ শেষ করেছে সুলতান আর তার ছোট দলকে। হতাশায় বুক ভেঙে গেল অমৃতলালের। কুছ পরোয়া নেই। সব ভুলতে সে পারে, যদি সে পায় মদ আর মেয়েমানুষ। নতুন মেয়েমানুষ চায় অমৃতলাল। পয়সা খরচ করে বম্বে-কলকাতা-দিল্লী গিয়ে গতানুগতিক এক-ধাঁচে গড়া মেয়েমানুষ আর সে চায়

না। মেজাজ হয়ে উঠল খারাপ। সন্দেহ তাকে করে তুলল পাগল। দলের তুলা গড়রিয়াকে শুধু সন্দেহের বশে গুলী করল। রামপ্রসাদ আর লোমু ভয়ে পালাল দল থেকে। রামপ্রসাদ ধরা পড়ল পুলিশের হাতে আর দলের অনেক কথাই হলো ফাঁস।

উঁচীবারোদ গাঁয়ে হঠাৎ খোঁজ পেল অমৃতলাল নতুন মেয়েমানুষের। শক্ত ব্যাপার কিছুই না দলেরই এক পুরনো লোকের স্ত্রী। কিন্তু অমৃতলালকে পালাতে হলো গাঁ থেকে যখন হঠাৎ পুলিশ এসে পৌঁছল গাঁয়ে। তার পর দিনই গোপালপুর থেকে বদরী এসে তার দলে ভর্তি হলো। এক শর্তে রাজী অমৃতলাল তাকে দলে নিতে। যদি সে তার 'খুবসুরত' বোনকে তার কাছে এনে দেয়। বদরীর বোন তো আরো নতুন মেয়েমানুষ। দলেরই—সেই উঁচীবারোদ গাঁয়েরই সেই পুরনো লোকটা—তারই তো দ্বিতীয় স্ত্রী বদরীর বোন। তার প্রথম স্ত্রীকে পেতে গিয়ে পুলিশের ভয়ে পালাতে হয়েছে। যাক, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী, সে তো আরো নতুন মেয়েমানুষ। অমৃতলালের জিভ্ লকলক করতে লাগল।

"আগর আপনী বহেন কো নহী লায়া তো জান সে মার ডালুঙ্গা।" বদরীকে ধরে অমৃতলাল ভয় দেখায়, যদি তার বোনকে সে না আনতে পারে, তাহলে শুধু তাকেই না, তার সব ভাই ক'টাকেও শেষ করে দেবে।

বদরীর গায়ে যেন আগুন লেগে গেল। ঢোক গিলতে গিয়ে মনে হলো যেন একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো নেমে আসছে তার গলা দিয়ে। "খুন কা ঘুঁট পিকে" (রক্তের ঢোক খেয়ে) বলেছিল "আচ্ছি বাত হ্যায়।" কিন্তু অমৃতলালও হারবার পাত্র নয়। বুঝতে পেরেছিল বদরীটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। এর হাতে বন্দুক দেওয়া এখন চলবে না। ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে বদরী। অনেক মিনতি, অনেক সেবা করেছে অমৃতলালের, তবুও বন্দুক সে পায়নি। এদিকে অমৃতলাল আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। তাগিদ দিচ্ছে বদরীকে "বহেন কো লাও, জলদী লাও।"

অবশেষে বদরী কথা দিয়েছে। আজ নয় কাল, কাল নয়

পরশু করতে করতে তার কথা রাখার দিন কাছে এসে গিয়েছে। রাখী বন্ধনের পরব উদযাপন করতে অমৃতলাল গিয়েছে নিজের বোনের কাছে আর রাখী পরেছে অনেক পাতানো বোনদের কাছ থেকে। তারপর রাখী বেঁধে সর্বনাশ করতে বেরিয়েছে আর একজনের বোনের—গোপালপুরের বদরীর বোনের। বদরীর বোন তখন গোপালপুরে। সারারাত হেঁটে বর্ষার মধ্যে ক্লান্ত শরীর আর দল নিয়ে অমৃতলাল বিশ্রাম নিতে থেমেছে গোপালপুর গাঁ থেকে তিন মাইল দূরে মহুয়া গাছের নিচে। গাঁ থেকে এসেছে মদ আর এসেছে আস্ত একটা পাঁঠা। আজ অমৃতলালের উৎসবের দিন। নতুন মেয়েমানুষকে পাবার লোভে অমৃতলাল সেদিন দেশী মদই খেয়ে ফেলল একগাদা। একে দেশী মদ তারপর একরাশ পাঁঠার মাংস। ঘুমে ঢলে পড়েছে সবাই। বদরী কিন্তু কিছুই খায়নি। বলেছে, "তবিয়ত ঠিক নেহি"। আজ তার বোনের বলিদান আর সে কি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মদ আর মাংস খাবে। এতদিন সে কোনো রকমে নিজের বোনকে অমৃতলালের কামনার আগুন থেকে বাঁচিয়েছে, আজ বুঝি আর সে পারল না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বদরী।

ঘুম এসেছে অমৃতলালের। ঘুম এসেছে, বাকী সবাইকার। শুধু ঘুম নেই বদরীর। ঘুম থেকে উঠেই অমৃতলাল বিজয় গর্বে ঢুকবে গোপালপুর গাঁয়ে আর তারপরই যাবে তার বোনের কাছে। বদরী ভাবতে পারে না। তার মাথা থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে। চোখ দুটো জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। ব্যস তারপরই তার আদরের বোনের ওপর ঐ অর্থপিশাচ, মাতাল, ব্যাভিচারী লোকটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়বে। বদরীর মাথা ঘুরতে লাগল।

"আরে বদরী শো যা"—শুয়ে পড়তে বলে অমৃতলাল বদরীকে।

"মুঝে নীদ নহী আতি"—ঘুম আসছে না বদরীর। সে ঘুমবে না।

জীবনের প্রথম, আর শেষ মারাত্মক ভুল করে বসল অমৃতলাল।

জীবনের প্রথম, আর শেষ অপূর্ব সুযোগ এল বদরীর হাতের মুঠোর মধ্যে।

"আচ্ছা ইয়ে লে রায়ফেল। প্যাহারা দে।" এই নে রাইফেল। তুই পাহারা দে আমাদের। অমৃতলাল ঢুলতে ঢুলতে রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল বদরীকে।

কালো কালো ঘন জমা মেঘ মহুয়া গাছটার দিকে ছুটে আসছে। ভীষণ জোরে বৃষ্টি আসবে। মোতিরাম পাশ ফিরে শুলো। অমৃতলাল নিজের হাঁটুটা মোতিরামের গায়ে তুলে দিল। বদরীর হাতে রাইফেল। অমৃতলালের দামী রাইফেল। রাজা সাহের উমরীর প্রাসাদ থেকে চুরি করা রাইফেল। মেঘটা আরো কালো হয়ে আসছে। বদরীর হাতে রাইফেল। অমৃতলালের প্রথম, শেষ ও মারাত্মক ভুল আর বদরীর প্রথম, শেষ ও অপূর্ব সুযোগ।

সুঁই—।

জঙ্গলের নিস্তব্ধতা চিরে রাইফেলের গুলীর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো। কখন যে ট্রিগারটা চেপেছে বদরী নিজেই জানে না। জীবনে প্রথম আর শেষবারের মতো সে চালিয়েছে গুলী।

অমৃতলাল উঠছে, আস্তে আস্তে। বদরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। তার হাতটা যেন পাথরের হয়ে গিয়েছে। মাথার আগুনটা নিবে গিয়েছে। তারও ঘুম পাচ্ছে। অমৃতলাল ঝাপটে ধরেছে পাশে রাখা নিজের রাইফেলটা, তারপরই ধুপ করে তার বিরাট দেহটা পড়ে গেল। আর উঠল না।

বিরাট জোরে মেঘ ডেকে উঠল।

ছুটে চলে গেল বদরী গোপালপুর থানার দারোগার কাছে। ধপাস করে রাইফেলটা ফেলে দিয়ে জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "হামনে উসকো মার ডালা। অমৃতলালকো।"

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল।

রুস্তমজীর মন্টিক্রিস্টো লিস্টটার ওপর আরেকবার লাল পেন্সিল চলে গেল সর সর করে। রেকর্ডে শেষ প্যারাগ্রাফ লিখে বন্ধ করে দেওয়া হলো।

"Thus ended the crime career of a man who starting from thieving committed almost every serious crime known to law. In his active career of 23 years he

committed hundreds of serious offences in U. P. Rajasthan and M. P. and collected an enormous sum of money. His death will relieve people of large tract of central India from the fear of dacoity".

রুস্তমজী সাহেবের দুটো দায়িত্ব বেড়ে গেল। "খুন কা বদলা খুন" থেকে বদরীকে রক্ষা করা আর অমৃতলালের ছেলে বালোকে বাপের ঘৃণিত অপরাধ-জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া। বালোর বয়স কম। বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করার প্রবৃত্তি তার মনে মনে জেগেছে অনেকবার। "হি মাস্ট নট ফলো হিজ ফাদার।" আই. জি. সাহেব লাল পেন্সিলটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন।

"বাট হি হ্যাজ টু মাচ মনি টু বি এ ক্রিমিনাল।" বললাম রুস্তমজী সাহেবকে।

"আই উইশ ইউ আর রাইট"—চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা আই. জী-র প্রশস্ত ললাটে। অমৃতলাল তৈরি করছিল শিবপুরীর কাছে বিরাট বাড়ি। সেই বাড়ির কি হবে। বালো কি বাড়ি সম্পূর্ণ করবে? আর যদি করে তা কোথা থেকে করবে? বাপের লুকনো অজস্র টাকা দিয়ে! না সে নিজেই অর্থ উপার্জন করবে? "হি মাস্ট নট, হি মাস্ট-নট"। আর বদরী? তাকে কতদিন পুলিশের পাহারায় বাঁচিয়ে রাখা যায়!

"জানো একটা কথা? অমৃতলালের কাছে শেষ সময়ে কি ছিল? তার বুক পকেটে রাখা ছিল গভর্নমেণ্টের সেই ঘোষণা-পত্র যাতে অমৃতলালকে "জীবিত বা মৃত" ধরার জন্যে ২০,০০০৲ টাকা পুরস্কারের কথা উল্লেখ ছিল। "ফানি, ইজন্‌ট্‌ ইট?"—আই. জী. সাহেবের লাল পেন্সিলটা ঘোরাফেরা করে মন্টিক্রিস্টো লিস্টের ওপর। একটা নামের কাছে এসে থেমে গেল পেন্সিলটা—শংকর গুজর। অমৃতলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শংকর বৃদ্ধ কিন্তু অমৃতলালের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে হয়তো এবার তৈরি হবে। "হাউ টু গেট হিম?"

শংকরকে পাওয়া কঠিন হলো না। নসীবের অদ্ভুত চক্রান্তে কিছুদিন পরেই শংকর মারা পড়ল তার নিজের জন্মভূমি "পাওয়া"

গ্রামে। অনেকদিন আগে—অনেকদিন আগে শংকরের ঠাকুর্দা জানবেদ সিং আর কাকা জালিম সিংকে এই গাঁয়েরই এই মাঠের মধ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ডাকাতি আর নরহত্যার অভিযোগে। শংকর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। একদিন রাতের আঁধারে সেও মিশে গেল চম্বলের বেহড়ে।

মানসিং, সুবেদার সিং, রূপা, সুলতান, বাবু লোহারী, পুতলী, বারেলাল, গব্বর সিং, অমৃতলাল, শংকর, লাল সিং, কল্লা—অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ একে একে সব মিশে গিয়েছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। রুস্তমজী সাহেবের মন্টিক্রিস্টো লিস্ট ছোট হয়ে এসেছে। অভিশপ্ত চম্বলের বেহড় আর জল লাল হয়েছে এদের আর পুলিশ বাহিনীর লাল রক্তে। তবু চম্বলের তৃষ্ণা এখনো মেটেনি। লাখন সিং, পানা, বাহাদুরা এখনও বাকি। আর লুক্কা? মহুয়া গাঁয়ের কাছে যখন রূপা মহারাজ গুলী লেগে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে পড়েছে, পাশে দাঁড়িয়েছিল লুক্কা—পণ্ডিত লুকমন শর্মা। রূপা পড়েছে, ছুঁড়ে ফেলেছে তার টেলিস্কোপিক রাইফেল, লুফে নিয়েছে সেই রাইফেল লুক্কা। চম্বল সাঁতরে পালিয়েছে উত্তরপ্রদেশে—সঙ্গে গিয়েছে রূপার ভাই কানহাই। রূপা মহারাজের মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়েছে অনেক দূর, তারপর আর পারেনি। ফেলেছে দু'ফোঁটা চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস। সেই দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত হয়েছে চম্বলের বেহড়ে বেহড়ে। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে সুদূর উদিতপুরা গাঁয়ে রুক্মিণী। তার স্বামী মানসিং-এর নামের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল টিমটিম করে লুক্কা। দাউ ডাকতো "লুক্কে"।

ষোলো

আকাশের বুকে টিমটিম করে জ্বলছে শত সহস্র তারা। ওপার থেকে সিরসির করে ভেসে আসা হাওয়ায় লাগছিল শিহরণ। আধো-আলো আধো-আঁধারে দূর থেকে অভিশপ্ত চম্বলকে দেখাচ্ছিল যেন ঘুমন্ত একটা বিরাট অজগর বালুরাশি ভেঙে ধীরে

ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ছায়ামূর্তির মতো। যখন দাঁড়ালাম তখন মধ্যপ্রদেশের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছি। অভিশপ্ত চম্বল বয়ে চলেছে সামনে। শান্ত, ধীর, নিজস্ব, অতি নিজস্ব গতি তার। এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে অনেক দূর, তারপরই বেহড়ের পাশে বাঁক ঘুরে হয়েছে অদৃশ্য।

উসেটঘাট। মধ্যপ্রদেশের সীমানা। চম্বলের এপারে মধ্যপ্রদেশ ওপারে উত্তরপ্রদেশ। সোজা বাঁ দিক ধরে চম্বলের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলে মাইল পাঁচেক দূরেই শুরু রাজস্থান।

"হ্যালো ম্যান", কখন যে চুপচাপ পাশে এসে কমাণ্ডাণ্ট কুইন দাঁড়িয়েছে জানতেও পারিনি। তারপর ধীরে ধীরে অনেকেই ভিড় করেছে উসেটঘাটে, অভিশপ্ত চম্বলের তীরে। খানিক দূরে বালির ওপর আগুন জ্বালিয়ে তার চার পাশে ভিড় করেছে আরেকটা ছোটো দল। নিস্তব্ধ রাতের বুকে আগুনের শিখা মাঝে মাঝে লক্‌লক্‌ করে উঠছিল আর কানে ভেসে আসতে লাগল—"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান। জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম, জানকীবল্লভ সীতারাম। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম।" মৃদু হাততালির সঙ্গে তাল মিলিয়েছে অভিশপ্ত চম্বল, ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল। সবাইকার দৃষ্টি ওপারে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা বেহড়। হঠাৎ গুঞ্জন ধ্বনি উঠেছে এপারে। দাঁড়িয়ে উঠেছে এপারের লোকেরা। বেহড়ের বাঁকে দেখা গেল দুটো লণ্ঠনের আলো আর শোনা গেল অনেক লোকের পদধ্বনি। এপারের দুটো নৌকায় পড়ল টান আর ধীরে ধীরে চলতে লাগল ওপারে। রুস্তমজী সাহেব আর কমাণ্ডাণ্ট কুইন আমার দু'পাশে। রাতের অন্ধকারের বুক চিরে ওপার থেকে শোনা গেল "জয় জগৎ"। শাঁখ আর ঘণ্টা ধ্বনিতে মুখরিত হলো নিঝুম রাত।

শান্তিদূত আচার্য বিনোবা ভাবে প্রেমের বর্তিকা হাতে নিয়ে শান্তি অভিযানে আসছেন নরহত্যায় কলুষিত, রক্ত ও ধূলিকণায় ভরা অভিশপ্ত চম্বলের উপত্যকায়; অভিশপ্ত চম্বলের শতাব্দীর অভিশাপ মুছে ফেলতে! হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, নির্মম পাষাণ-হৃদয় দস্যুদের হৃদয় পরিবর্তন করতে।

সঙ্গের আমেরিকান সাংবাদিক বন্ধু বলে ওঠে—"দি গড হ্যাট গিভস অ্যাওয়ে ল্যাণ্ড, নাও কামস্ টু চেঞ্জ দি হার্টস অব হার্টলেস ব্যাণ্ডিটস"। হৃদয়হীন ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তন করতে এসেছেন ভুমিদানের দেবতা বিনোবা।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম বিনোবার অভ্যর্থনা। তাঁর সঙ্গে এসেছে অগুনতি সর্বোদয় কর্মী আর এসেছেন মেজর জেনারেল যত্নাথ সিং, কাশ্মীরের ঝাঙর, রাজৌরী আর নৌশেরা যুদ্ধের বীর সেনানী ভারতবর্ষের "সাধু জেনারেল"। সুখের জীবন ছেড়ে এসেছেন বিনোবার সঙ্গে অভিশপ্ত চম্বলের বেহড়ে-বেহড়ে ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তনের "মিশনে"। আজ মেজর জেনারেল যত্নাথ সিং নেই। কিছুদিন আগে হঠাৎ তিনি হার্ট এ্যাটাকে মারা যান। মনে পড়ছে অনেক টুকরো টুকরো ছোটো ঘটনা। বিনোবার প্রায় এক মাসের ওপর পদযাত্রায় যখন ঘুরেছি তখন সব সময়ই "সাধু জেনারেল"কে সঙ্গে পেয়েছি। যখন পদযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে জীপের খোঁজ করেছি, ৫৪ বছরের যত্নাথ সিং মুচকি হেসে দ্বিগুণ উৎসাহে "বাবার" (বিনোবা) হাতে হাত দিয়ে পা চালিয়েছেন। অনেক ঝগড়া-বিবাদ তার সঙ্গে করেছি কিন্তু তাঁর সরলতার কথা আজও মনে পড়ে। মদ-মাংস-সিগারেট তিনি জীবনে ছোঁননি। স্যাণ্ডহার্স্ট শিক্ষিত যত্নাথ সিংকে দেখে অবাক হয়েছি। নিজের একমাত্র শিক্ষিত মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন বিলাতে নার্সিং পড়তে। ডাকাতদের আত্ম-সমর্পণের 'মিশনে'র তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। একদিনের কথা আমার এখনও মনে আছে। জরুরী কাজে চলে গিয়েছিলেন তিনি কোথায় যেন। ফিরে এসে দেখেন বিনোবা শুয়ে পড়েছেন। তাঁকে খবরটা দেওয়া দরকার অথচ তাঁর ঘুম ভাঙাতে রাজী নন। বিনোবার ক্যাম্পের কঠিন মাটির ওপর সারারাত শুয়ে রইলেন। ভোর তিনটেয় যখন বিনোবা জেগে বাইরে এসেছেন দেখেন যত্নাথ সিং তাঁকে খবর জানাবার জন্যে জেগে বসে রয়েছেন।

আমাকে ডাকতেন "মিশচিভাস নিউজ-হাউণ্ড" বলে। সকাল বিকেল সেই চির-পরিচিত ম্যালেশিয়ার বুশ-শার্ট, প্যান্ট আর মাথায় বিরাট টুপী পরে সাইকেলে চড়ে তাঁর প্রায়ই হঠাৎ বেহড়ে

অন্তর্ধানের কথা ভুলব না। মাইলের পর মাইল ভীষণ গ্রীষ্মের রোদে তিনি ঘুরেছেন বেহড়ে-বেহড়ে, গাঁয়ে গাঁয়ে ডাকাতদের সঙ্গে দেখা করতে আর তাদের "বাবা"র শান্তির বাণী শোনাতে। তাঁর চেষ্টা যদি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সফল না হয়ে থাকে, দোষ তাঁর না। দোষ অভিশপ্ত চম্বলের শতাব্দীর অভিশাপের আর দোষ ইতিহাসের। হাজার বছরের পুরনো রক্তে লেখা অভিশপ্ত চম্বলের ইতিহাস। পদযাত্রার শেষে তিনি যেদিন শ্রীনগর যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "জনারেল সাহেব, নো মোর সারেণ্ডার্স অব ব্যাণ্ডিটস? হ্যাভ ইউ সারেণ্ডার্ড অ্যাণ্ড এ্যাক্সেপটেড ডিফিট?"

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার দিকে মেজর জেনারেল যদুনাথ সিং। চাঁদির তারের মতো শুভ্র চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে মৃদু হেসে বললেন, "ইউ আর মিশচিভাস। আই টেল ইউ ইয়ং ম্যান আই নো নো ডিফিট। আই উইল কাম ব্যাক এগেন অ্যাণ্ড এগেন টু ক্যারী অন মাই মিশন ইফ নেসেসারী অল অ্যালোন।"

"সাধু জেনারেল" আজ আর নেই। তাঁর 'মিশন' পূর্ণ করতে তিনি আর আসবেন না। পদযাত্রার সময় তুমুল তর্ক করেছি তাঁর সঙ্গে। তিনি আমায় বোঝাতে পারেননি আর আমিও তাঁকে বোঝাতে পারিনি। তাঁর চিন্তাধারা আর আমার চিন্তাধারায় অনেক তফাত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আর আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য অনেক। অভিশপ্ত চম্বলের উপত্যকায় বিনোবার শান্তি আর হৃদয়-পরিবর্তন অভিযান তাঁর মতো আমার হৃদয়কে অভিভূত করেনি। সাংবাদিক বলে কিছু "সিনিসিজম" আমার আছে তা মানতে কোনো বাধা নেই কিন্তু অনেক বিষয়ে অনেকবার খটকা লেগেছে আমার। কখনও কখনও মনে হয়েছে আইন-কানুন আর সংবিধান জলাঞ্জলি দিয়ে এই যে "মিশন", তার পরিণাম কি "রুল অবদি ল"তে লোকের আস্থা ভেঙে দেবে না? হয়তো ইতিহাসই আজ থেকে অনেক বছর পরে বলবে আচার্য বিনোবা আর "সাধু জেনারেলে"র এই "মিশন"-এর সার্থকতা কতটুকু আর ব্যর্থতাই বা কতখানি। আমি সাংবাদিক। উপদেশ, জ্ঞান বা "সারমন"

দেওয়া আমার কাজ নয়। যেখানে যা দেখি তাই লিখি। নিজের অভিজ্ঞতার আর চাক্ষুষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে আমার নিজের অভিমত। তাই জেনারেল সাহেবকে বলেছিলাম হৃদয়হীন ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তন হবে না, হবে না, হবে না। তাহলে কি করে সমাধান হবে এই ডাকাতি সমস্যার জানতে চেয়েছেন যদুনাথ সিং। কোনো সমাধান আমার কাছে নেই। কোনো উত্তরই আমার কাছে সেদিনও ছিল না আজও নেই। উদিতপুরায় রুক্মিণীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি আমি, আর মোরেনার পুতলীর মা আসগরীবাঈ বা তার নাতনী তান্নোর প্রশ্ন বা সমস্যার কোনো উত্তর বা সমাধান আমার কাছে নেই। অভিশপ্ত চম্বলের বেহড়ে বেহড়ে ঘুরেছি, অনেক ঘুরেছি—একা ঘুরেছি, পুলিশের সঙ্গে ঘুরেছি, সাধারণ লোকের সঙ্গে ঘুরেছি, বিনোবা ও "সাধু" জেনারেলে"র সঙ্গেও ঘুরেছি, হয়তো আরো ঘুরব। বেহড়ের বাঁকে বাঁকে অনুভব করেছি হাজার বছরের পুরনো রক্তাপ্লুত সেই ইতিহাসের অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস। বেহড়ের বাঁকে যখন মোর ঘুরেছি, আমার জীপ দাঁড়িয়ে গিয়েছে অন্য একটা বেহড়ের সামনে। প্রতিটি বেহড়ের প্রতিটি পয়েণ্টই মনে হয়েছে—"পয়েণ্ট অব নো রিটার্ন।"

উত্তেজিত হয়ে "সাধু জেনারেল" আমার সামনে হাজার হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস তুলে ধরেছেন। "কেন, তথাগত গৌতম বুদ্ধের শান্তির বাণী শুনে কি দুর্ধর্ষ ডাকাত অঙ্গুলীমালের হৃদয় পরিবর্তন হয়নি? কেন দস্যু রত্নাকর কি বাল্মীকি হয়ে রামায়ণ সৃষ্টি করেনি?"

আমি এ প্রশ্নেরও উত্তর দিইনি কারণ উত্তর আমার কাছে নেই কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম "সাধু জেনারেল"কে। "যদি অভিশপ্ত চম্বলের দস্যুদের পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে কেন লাখন সিং, পানা, বাহাদুরা আত্মসমর্পন করল না। তাহলে "বাবা"র ক্যাম্প থেকে ৪ মাইল দূরে পানা কেন দু-দুটো ডাকাতি করল। যদি সত্যি হৃদয় পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে তহসীলদার সিংকে ফাঁসির সাজা থেকে বাঁচাবার জন্যে কিছু ডাকাত কেন এত আগ্রহশীল? আর আপনিও কেন চান তহসীলদারকে বাঁচাতে?"

এর উত্তর আমিও জেনারেল সাহেবের কাছ থেকে পাইনি। তিনি আর নেই তার উত্তরও হয়তো পাবো না। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে হৃদয় পরিবর্তন আর আত্মসমর্পন দুটো আলাদা জিনিস। "বাবা" চেয়েছিলেন হৃদয় পরিবর্তন। আত্মসমর্পণ তার "বাইপ্রোডাক্ট"। শান্তির বাণী শুনিয়ে তিনি চেয়েছিলেন হৃদয় পরিবর্তন করতে। যদি কেউ আত্মসমর্পণ করে করুক। তারা আত্মসমর্পণ করলে তিনি তাদের সরকারের হাতে সঁপে দেবেন আইনের বিচারের জন্যে—জাস্টিস টেম্পার্ড উইথ মার্সি। দয়া মেশানো বিচার। পুলিশের কাছেও তো অনেক ডাকাত আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের সংখ্যাও তো কম না—প্রায় ২০০। তারা কি এই দয়া মেশানো বিচারের এক কণাও পেতে পারে না? জেনারেল সাহেব উত্তর দেননি। "কিন্তু পুলিশের পন্থাতেই কি এই অভিশাপ শেষ হবে?" জেনারেল সাহেব প্রশ্ন করেছেন আবার।

"না। কিন্তু আপনাদের পন্থাতেও হবে না। আপনি নিজে এই এলাকার লোকদের জানেন। আপনি নিজেই তো এই এলাকার লোক?"

আবার জেনারেল সাহেব চুপ। আমিও চুপ। তাঁর কাছে এই সমস্যার সমাধান ছিল কিনা জানি না। আমার কাছে নেই। অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ যে কবে শেষ হবে আমি বলতে পারব না। বোধ হয় সময়ই এর সমাধান করবে। কালের গতি একদিন হয়তো নিজের প্রবাহে অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ ধুয়ে মুছে দেবে। লাখন, পানা, বাহাদুরা আর কিছু অবশিষ্ট ছোটো ছোটো দল শেষ হলেও হাজার বছরের এই অভিশাপ শেষ হবে না আর "বাবা"র হৃদয় পরিবর্তন মিশনে অভিভূত হয়ে ১৫।২০ জন ডাকাত আত্মসমর্পণ করলেও এই অভিশাপ শেষ হবে না। অভিশাপ শেষ হবে সেদিন, যেদিন "খুন-কা-বদলা-খুন" যে সভ্যজগতের আওতায় পড়ে না, এই কথাটা চম্বল উপত্যকার বীর, সাহসী কিন্তু ভুলপথগামী লোকেরা বুঝবে। সেও সময়ের আর কালের গতির প্রবাহের কথা।

"অলরাইট উই অ্যাগ্রি টু ডিফার"। সাধু জেনারেল আমার

হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমার ভিন্ন মতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে উঠে পড়েছিলেন। অভিশপ্ত চম্বল হাতছানি দিয়েছিল তাঁকে। অভিশপ্ত চম্বল হাতছানি দিয়েছিল আমাকেও। তার উত্তর দিয়েছিলাম, "ইয়েস জেনারেল সাহেব। উই মে বোথ লিভ টু সি হু ইজ কারেক্ট"। কার কথা সত্য হয় দেখতে আমরা দু'জনেই হয়তো বেঁচে থাকব।

যেতে যেতে জেনারেল সাহেব বলেছিলেন, "আবার দেখা হবে চম্বলের বেহড়ে।" তিনি আবার আসবেন হৃদয় পরিবর্তন অভিযানে "ইফ নেসেসারী অল অ্যালোন।" আর আমি আমার কাজে। "কল অব দি র‍্যাভাইন্‌স ইজ ইরেসিস্টিবল।" বেহড়ের ডাক তো উপেক্ষা করা যায় না, বলেছিলেন যদুনাথ সিং।

"ফর বোথ অব আস্"। আমাদের দু'জনের কাছেই।

"ইয়েস ফর বোথ অব আস্।" হো হো করে হেসে উঠেছিলেন সাধু জেনারেল। গট্‌গট্‌ করে আমার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই চিরপরিচিত ম্যালেশিয়ার বুশ-শার্ট-প্যাণ্ট আর বিরাট টুপী পরে সাইকেলে চড়ে। হয়তো ফেরার আগে একবার শেষ চেষ্টা করতে গেলেন আরো কিছু ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তনের।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম তাঁর সেই যাওয়া। তখন কি জানতাম এই আমার শেষ দেখা। তখন কি জানতাম আমি সাইকেলে চড়া বুশ-শার্ট-প্যাণ্ট-টুপী-পরিহিত জেনারেল সাহেবের সেই সুন্দর চেহারা আর দেখতে পাব না। তখন কি জানতাম সেইদিনকার তর্কই আমাদের শেষ তর্ক। তখন কি জানতাম যে, "সাধু জেনারেল", "মিশচিভাস নিউজ হাউণ্ড" আর ক্রমাগত সিগারেট খাওয়ার জন্যে আমায় "চিমনী" বলে আর ডাকবেন না। সেদিন যখন তাঁর মৃত্যুর খবর পেলাম, নিজের অজান্তেই দু'ফোটা চোখের জল পড়েছে গড়িয়ে গড়িয়ে গাল বেয়ে। তাঁর সঙ্গে আমার মতে মিল ছিল না। আজও নেই, হয়তো কোনদিন হবেও না কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা আর একাগ্রচিত্ততা আমায় করেছে মুগ্ধ। তাঁর আশা, তাঁর বিশ্বাস, ইতিহাসে সত্য প্রমাণ

হলে আমি খুশী হবো। হেরে গিয়ে জীবনে আমি প্রথম আর শেষবার আনন্দিত হবো।

"কল অব দি র‍্যাভাইন্‌স" হয়তো আমায় আবার ডাকবে। আমি হয়তো উপেক্ষা করতে না পেরে আবার যাবো। কিন্তু জেনারেল সাহেব তো তাঁর অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আর কথা রাখতে পারবেন না। সেদিন যে তিনি সাইকেল করে আমার সামনে দিয়ে চলে গেলেন বেহড়ের মোড় ঘুরে, সেই হলো তাঁর "পয়েন্ট অব নো রিটার্ন"। তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করবেন "বাবা" নিজে। মাইলের পর মাইল বেহড়ের উঁচু নীচু পথে যার কাঁধে হাত দিয়ে তিনি পদযাত্রা করেছেন তাঁকে তো আর তিনি পাবেন না। হৃদয় পরিবর্তন অভিযানের তাঁর "সাধু জেনারেল", তাঁর শান্তিদূত এখন চিরশান্তিতে ঘুমুচ্ছেন। "বাবা" নিজেও রাত তিনটার সময় ঘুম থেকে উঠে কোনোদিন কাউকে হয়তো আর ক্যাম্পের বাইরে কঠিন মাটির ওপর ঘুমুতে দেখবেন না। আর তাঁকে খুঁজে পাবে না সেই সব অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ দুর্ধর্ষ দস্যুরা যারা তাঁর কথায় করেছে আত্মসমর্পণ, তা সে যে কোনো কারণেই হোক না কেন। কারাপ্রাচীরের কঠিন ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে শুয়ে তার কথা ভাববে লুক্কা, বিদ্যারাম কানহাই, বদন সিং, পতিরাম, মোহরমনিয়া, শ্রীকিষেন, কাছেরা রামঅবতার আর লচ্ছী। লুক্কা আর কানহাই হয়তো দু'ফোটা চোখের জলও ফেলবে।

আরেকজন ফেলবে চোখের জল জেনারেল সাহেবের জন্যে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে হয়েছে অন্ধ। উদিতপুরায় মানসিং-এর বৃদ্ধা স্ত্রী রুক্মিণী। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে সে জেনারেল ঠাকুর যদুনাথ সিংকে। অনেক করেছে সে। অনেক। মানসিং-এর দুর্ধর্ষ দলের সমস্ত ঘৃণিত অপরাধ আর তার পাপের সব প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব হয়েছে শুধু জেনারেল সাহেবের জন্যেই। তিনি না চেষ্টা করলে মানসিংহ আর রূপার নামের দীপশিখা নিয়ে বেঁচে ছিল যে "লুক্কা কানহাই"-এর দল তারা আত্মসমর্পণ করতো না কোনোদিন "বাবার" কাছে।

আরো একজন হয়তো নৈনী সেণ্ট্রাল জেলের এক নিভৃত সেলে বসে চোখের জল ফেলেছে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে

হয়তো চোখের জল ফেলবে। ফাঁসির নিশ্চিত মৃত্যু থেকে, আপ্রাণ চেষ্টা করে তাকে বাঁচিয়েছিলেন জেনারেল সাহেব। তহসীলদার সিং-এর ফাঁসি রাষ্ট্রপতির হুকুমে পরিণত হয়েছিল আজীবন কারাবাসে। মানসিং-এর শেষ প্রদীপ তহসীলদার সিং।

নৈনীর কঠিন কারাপ্রাচীরের অন্ধকার 'সেলে' বসে তহসীলদার সিং জীবনের শেষ ক'টা দিন গুনছিল। 'দাউ' মানসিং-এর চোখের মণি, দুলারা বেটা তহসীলদার সিং। আর ক'টা দিনই বা বাকী? আজ নয় কাল, ফাঁসি হয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে মানসিং-এর নাম মুছে যাবে অভিশপ্ত চম্বলের বুক থেকে। থাকবে শুধু তার অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাস আর রুক্মিণীর চোখের জল। একদিন রুক্মিণীর চোখের জলও শুকিয়ে পাথর হয়ে যাবে আর মানসিং-এর স্মৃতি রয়ে যাবে চম্বলের অভিশাপ হয়ে। আজ থেকে অনেক বছর পরে, অনেক বছর পরে, অভিশপ্ত, সর্বনাশা চম্বল যখন ভাঙনের গান গাইতে গাইতে আরো অনেক "বেহড়" তৈরি করবে, তাঁরাও বলবে চম্বলের সেই অভিশাপ মানসিং-এর কথা, শোনা যাবে শত শত সেই ক্ষুধিত, অতৃপ্ত, পাষাণ "বেহড়ে"র দীর্ঘশ্বাস। কান পেতে শুনলে সেই দীর্ঘশ্বাসেও শোনা যাবে সেই অভিশাপের রক্তমাখা কাহিনী। বৃদ্ধা রুক্মিণী উদিতপুরা গাঁয়ে বাড়ির সামনের কুয়োটার কাছে এসে দাঁড়াবে আর দূরে, অনেক দূরে দৃষ্টি দিয়ে দেখবে! আগেও দেখতো, এখনও দেখে, পরেও হয়তো দেখবে। হয়তো কোনোদিন তার "দুলারা বেটা" তহসীলদার ফিরে আসবে। 'দাউ' মানসিং-এর ঘরের শেষ প্রদীপ জ্বলছে টিমটিম করে নৈনীর কঠিন কারাপ্রাচীরের অন্ধকার 'সেলে'। একদিন ভোরে হয়তো দপ্ করে নিবে যাবে আর তারপর—"উসকে বাদ্—উসকে বাদ্ ক্যায়া সব খতম্"।

কিন্তু এমনি করেই কি সব খতম্ হয়ে যাবে? গলার রুদ্রাক্ষের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে তহসীলদার ভাবে। ভাবতে ভাবতেই একদিন অন্ধকার 'সেল' থেকে চিঠি লিখল আচার্য বিনোবা ভাবেকে। "বাবা" তখন সুদূর কাশ্মীরে। "বাবা"র সঙ্গে মরবার আগে দেখা করতে চায় তহসীলদার। "বাবা" নিজে যদি আসতে না পারেন তাহলে তাঁর কাছে থেকে কেউ যদি আসে, তহসীলদার তার বুকের

বোঝা হাল্কা করে কিছু বলতে চায়। তারপরে সব ঘটনা দ্রুত ঘটেছে আর "বাবা" এসেছেন অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ মুছে দিতে, "বাগী"দের হৃদয় পরিবর্তন করতে।

আগ্রার সর্বোদয় নেতা ডাঃ ললিত গেলেন নৈনী কারাগৃহে তহসীলদার সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে। লাঠিতে ভর দিয়ে তহসীলদার এগিয়ে এসে ডাঃ ললিতকে জড়িয়ে ধরল। সব কিছু শুনতে রাজী আছে তহসীলদার কিন্তু সে সহ্য করতে পারে না তাকে যদি কেউ "ডাকু"—ডাকাত বলে। "হমে খুনী কহো, কাতিল কহো, হত্যারা কহো, পর হমে ডাকু মত কহো"—বলে ওঠে তহসীলদার সিং। অনুতপ্ত তহসীলদার সব ভুলে যেতে চায়। "দাউ"-এর জন্যে যারা "বাগী" হয়েছে তাদের সে মিনতি জানাতে চায়। কেউ যেন তাদের গিয়ে বলে তার কথা। তাদের যেন বলে, "দাউ"-এর ঘরের শেষ প্রদীপ তহসীলদার চায় তারা যেন "হাজির" হয়ে যায়। তারা যেন বাবার পায়ে আত্মসমর্পণ করে। "ইস্‌কে বাদ্ তহসীলদার কো অগর ফাঁসি লগ যায়ে তো উসসে অচ্ছী মৌত তহসীলদার কে লিয়ে দুসরী নহী হো সকতী।" এর পরে যদি ফাঁসি হয়ে যায়, তার চেয়ে ভালো মৃত্যু তহসীলদার আশা করতে পারে না।'

শান্তির বাণী নিয়ে হৃদয় পরিবর্তনের অভিযানে তাই এলেন বিনোবা। উসেটঘাটের তীরে আধো-আলো-আধো-আঁধারে সেদিন শোনালেন তাঁর প্রথম বাণী। "ম্যায় ডাকুক্ষেত্র নহী, সাধুক্ষেত্র মে আয়া হুঁ। ইয়ে লোক ডাকু নহী, ইয়ে সব বাগী হ্যাঁয়। ম্যায় ভী বাগী হুঁ। আরে ডাকু কহাঁ নহী হ্যাঁয়। সব জগা ডাকু হ্যাঁয়। দিল্লীমে ভী ডাকু হ্যাঁয়।" আমি তো দস্যু-অধ্যুষিত এলাকায় আসিনি, আমি এসেছি সাধুদের পুণ্যভূমিতে। এরা তো ডাকাত নয়, "বাগী" (বিদ্রোহী)। আমিও "বাগী"। আর ডাকাত কোথায় নেই? সব জায়গাতেই তো ডাকাত আছে। দিল্লীতেও তো ডাকাত আছে। দুনিয়ায় ভালো বা মন্দ কেউ নেই। সব মানুষের মধ্যে রয়েছে "সুমতি" আর "কুমতি"। হৃদয় পরিবর্তন করে, প্রেমের অমৃত বাণী শুনিয়ে "কুমতি" সরিয়ে দিলেই থাকবে শুধু "সুমতি," তখন সব মানুষই সাধু।

"বাবা" এসেছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে চম্বল পার হয়ে সঙ্গে এসেছে সব "শান্তি" সৈনিকরা। সুদূর কেরালা থেকে এসেছেন পাদ্রী মিশনারী ফাদার গ্রিফিৎস আর ব্রাদার স্টিফেন হৃদয়-পরিবর্তনের এই যাদু দেখতে। আরো এসেছে অনেকে। আর এসেছে উত্তর-প্রদেশের "বাবা"র হৃদয়-পরিবর্তনের প্রথম জ্বলন্ত উদাহরণ ডাকাত রামঅবতার। রূপা মহারাজের দলের সভ্য ছিল রামঅবতার। উত্তরপ্রদেশের ফতেহাবাদে "বাবা"র সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় আত্মসমর্পণ করলো রামঅবতার। ঐতিহাসিক ফতেহাবাদে—এইখানেই আউরঙ্গজেব তাঁর ভ্রাতা দারাকে পরাজিত করেন—বিংশ শতাব্দীর নতুন ইতিহাস লেখা হলো, রামঅবতারের আত্মসমর্পণে। "কুমতি"র ওপর রামঅবতারের "সুমতি"র জয় হলো। দু'দিন পরেই রাম-অবতার কিন্তু হয়ে গেল নেতা। উসেটঘাটে সেদিন যখন রামঅবতারকে দেখলাম, রামঅবতার খদ্দরের পাজামা, পাঞ্জাবি আর টুপি পরে "বাবা"র পদযাত্রীদের মধ্যে রীতিমতো একজন হোমরা-চোমরা কর্তা হয়ে পড়েছে।

কিন্তু শুধু রামঅবতারই এল আত্মসপর্পণ করতে "বাবা"র কাছে উত্তরপ্রদেশে। অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রম করলেন সাধু জেনারেল যদুনাথ সিং কিন্তু হৃদয়-পরিবর্তনের বাণী শুনে আর কেউ এগিয়ে এল না। কিছুদিন আগেই হয়েছিল ভয়ঙ্কর এনকাউণ্টার। রূপা মহারাজের দলের নেতা লুক্কা। রূপা মহারাজের দল মানেই মানসিং-এর দল। চম্বলের সবচেয়ে পুরনো দল। দল ভাঙতে শুরু হয়েছিল রূপা মহারাজের মৃত্যুর পরই। কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে রেখেছিল লুক্কা। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ হয়েছিল এনকাউণ্টার। বাছা বাছা তিনজন লোক মরল। তাদের মধ্যে ছিল দলের দুর্ধর্ষ রামনাথ—মেওয়ারামের ভাই রামনাথ। হাতের আঙুলে গুলী লেগে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে লুক্কার সঙ্গে পালাতে পেরেছিল মটরা আর বাকী লোকেরা।

লুক্কার কাছে এই সময় পৌঁছে দেওয়া হলো নৈনী কারাগারের অন্ধকার "সেলে" ফাঁসির অপেক্ষারত তহসীলদারের কথা। সাধু জেনারেল যদুনাথ সিং-এর শুরু হলো সাইকেলে চড়ে দুর্গম বেহড়ের

মধ্যে অবিরাম যাত্রা। "বাবা"র শান্তিদূতরা (Em ssary) ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে "বাগী"দের হৃদয়-পরিবর্তনের বাণী শোনাতে। লুক্কার জীবনে এল ভীষণ সঙ্কট। সে ভাবতেই পারে না, পনেরো কুড়ি বছরের দস্যু-জীবনের ওপর কি করে সে হঠাৎ যবনিকা টেনে দেবে। আত্মসমর্পণ তো না হয় করল, তারপর? তারপর তো নির্ঘাত ফাঁসি। এর চেয়ে তো ঢের ভালো পুলিশের হাতে গুলী খেয়ে মরা। কিন্তু আরেকটা চিন্তাও মনের মধ্যে আনাগোনা করে। "দাউ"-এর ঘরের শেষ প্রদীপ তহসীলদার সিং তো এই চেয়েছে। কিন্তু লুক্কা কি করে ভুলতে পারে "দাউ"-এর মৃত্যুর কথা। কি করে ভুলতে পারে ডুনডান-কা-পুরার সেই ভীষণ সংঘর্ষের কথা, যখন আহত তহসীলদারকে ফেলে সবাইকে পালাতে হয়েছিল। আর রূপা মহারাজ? তার মৃত্যু তো ধোকা? এসবের বদলা তো নেওয়া হয়নি? "খুন কা বদলা খুন" যে এখনও বাকী? সব কিছু অসমাপ্ত রেখে কি করে সে "হাজির হবে? কি মুখ নিয়ে দলের বাকী সবাইকে বলবে এ কথা। কিন্তু তহসীলদারের কথাও তো ফেলা যায় না, আর কতদিনই বা এইভাবে পালিয়ে বাঁচা যায়? প্রতিপত্তি, অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র সবই তো ফুরিয়ে আসছে। তা যতদিন রূপা মহারাজের টেলিস্কোপিক রাইফেল—'দূরবীনওয়ালী বন্দুক" হাতে আছে তার কে কি করতে পারে! কিন্তু উদিতপুরায় "মাজী" যে তহসীলদারের জন্যে রোজ কাঁদে? সেও নাকি চায় লুক্কা সবাইকে নিয়ে "বাবা"র চরণে আত্মসমর্পণ করে। সবকিছু ঠেলে ফেলতে পারে লুক্কা কিন্তু "দাউ"-এর স্ত্রী রুক্মিণীর কথা তো ফেলতে পারে না। সে যে সবাইকার "মাজী" (মা)। ভীষণ ধর্ম-সঙ্কট লুক্কার সামনে। আর রূপার ভাই কানহাই, সে তো সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে লুক্কার হাতে। লুক্কা মহারাজ যা বলবে তাই হবে। "দাউ"-এর প্রিয়পাত্র ছিল রূপা। জেলে কথা দিয়েছিল "দাউ" রূপার বাবা ছাবরামকে। কথা রেখেছিল "দাউ" কিন্তু "কসম্" পুরো করবার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। আর রূপা মহারাজ? তার প্রিয়পাত্র ছিল লুক্কা। শুধু তো তাই না, "দাউ"-এর দুই হাত ছিল রূপা আর লুক্কা। আদর করে "দাউ" ডাকতো রূপে আর লুক্কে।

বিনোবার হৃদয়-পরিবর্তন অভিযান কিছুদিন আলোড়ন তুলেছিল সারা দেশে। ইন্সপেক্টর জেনারেল রুস্তমজী সাহেব হঠাৎ একদিন দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে বিনোবার মিশনের তীব্র সমালোচনা করলেন। কাগজে-কাগজে শুরু হয়ে গেল তর্ক-বিতর্ক। আজ হয়তো এই তর্কের শেষ জবাব দেওয়ার বা অভিমত জাহির করার সময় আসেনি। ইতিহাসই হয়তো এর জবাব দেবে। একমাস "বিনোবা"র সঙ্গে পদযাত্রা করেছি অভিশপ্ত চম্বল উপত্যকায়। অনেক সময় মনে হয়েছে হয়তো জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না কেউ যদি আজও আমায় জিজ্ঞাসা করে, আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এই হৃদয়-পরিবর্তনে বিশ্বাস করি কিনা আর আমি কি সত্যই ভাবি যে দুর্ধর্ষ ডাকাতদের হৃদয়-পরিবর্তন হয়েছে, আমি নিঃসঙ্কোচে বলব, হৃদয়-পরিবর্তন হয়নি-হয়নি-হয়নি। যাদের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য কিছুই না, যাদের জীবনের মন্ত্র হলো "খুন কা বদলা খুন" তাদের হৃদয় পরিবর্তন হবে না—হবে না—হবে না। যেমন বিনোবার শান্তি-মিশনের অনেক জিনিসই আমার ভালো লাগেনি, তেমনি পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গীও আমার অনেক সময় ভালো লাগেনি। পুলিশের অনেক বড়কর্তারাও স্বীকার করেন যে, অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ শুধু পুলিশ অভিযানেই শেষ হবে না। কিসে হবে তাহলে? এর উত্তর আমার কাছে নেই। কালের গতির স্রোতেই একদিন হয়তো মিটে যাবে, ধুয়ে যাবে, মুছে যাবে এই শতাব্দীর অভিশাপ।

প্রথম যখন বিনোবা শান্তি-মিশনে এলেন, হৈ-চৈ হলো সারা দেশে। বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা বিনোবাকে পাঠালেন তাঁদের শুভেচ্ছা। পুলিশের হোমরা-চোমরা অফিসাররা জানালেন বিনোবাকে অভ্যর্থনা আর অভিনন্দন। মধ্যপ্রদেশের এক বড় পুলিশ অফিসার তো এই পর্যন্ত বলে বসলেন যে, তিনি অনেক বছর আগেই সরকারকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যদি বিনোবাকে চম্বল উপত্যকায় "ডাকু"দের শান্তির বাণী শোনাতে আনা যায় সমস্যার সমাধান হয়তো হবে। নিজের চোখেই দেখলাম অনেক। দেখলাম আত্মসর্পন করা "বাগী"দের সঙ্গে হাত ধরে ঝাকুনি দিচ্ছেন সব হোমরা-চোমরা পুলিশ অফিসাররা। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে

ফটো তোলাচ্ছেন তাঁরা ডাকাতদের সঙ্গে। হঠাৎ যেন ভোজবাজীর মতো সবাইকার হৃদয় পরিবর্তন হয়ে গেল। সব "ভাই, ভাই" হয়ে গেল।

পুলিশের জীপে করে ডাকাতরা সব ঘুরে বেড়াল, আরো কত কি সব কাণ্ড। ভালো লাগেনি, ভালো লাগেনি আমার এসব। আবার বিনোবার সাঙ্গপাঙ্গরাও যা সব করল, তাও ভালো লাগেনি আমার। ডাকাতরা সব হয়ে পড়ল নেতা। প্রার্থনা-সভায় বসে রামধুন গাইলে। হাজার হাজার লোকের কৌতূহল মেটাবার জন্যে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে জনতাকে তাঁরা 'দর্শন' দিলেন। কেউ কেউ আবার ছোটো খাটো বক্তৃতাও ঝাড়লেন। বিনোবার সঙ্গে তারাও পদযাত্রা করলেন কয়েকদিন কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে। ফুলের মালা পরে শহরে বড় বড় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন আর যেদিন শেষ পর্যন্ত তাদের পুলিশের হাতে সঁপে দেওয়া হলো, বিনোবার আশ্রমের মেয়েরা তাদের 'ডাকু' ভাইদের কপালে টিকা লাগিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে, হাতে রাখী বেঁধে দিল। ডাকাতরা বোনদের আশীর্ব্বাদ করল টাকা দিয়ে। পুলিশের জীপে উঠে মালা পরে ডাকাতরা 'মহাত্মা -গান্ধীকি জয়,' 'ভারতমাতা কী জয়', 'সন্ত বিনোবা কী জয়' বলতে বলতে জেলে গেল। জেলে বসল 'বাবা"র প্রার্থনা-সভা। ডাকাতদের দাবি হলো, হাতকড়া পরানো চলবে না, তারা জেলের বাইরে শোবে, আরো কত কি? ডাকাতদের কোর্টে বিনা পয়সায় ডিফেণ্ড করার জন্যে এলেন উকিলরা। চাঁদা ওঠানো হলো, আরো কত কি হলো। ডাকাতদের আত্মীয়দের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন অনেকে আর মৃত ডাকাতদের পরিবারের লোকের জন্যে আশ্রম তৈরী করার কথা হলো। মৃত, জীবিত বড় বড় ডাকাতদের বাড়ি বাড়ি গেলেন বিনোবা আর তাঁর সাথীরা। কিন্তু কেউ একটা কথাও তাদের বিষয়ে বললে না—যারা ডাকাতদের অত্যাচারে আজ জর্জরিত, যাদের নিঃশেষ করেছে ডাকাতরা। যাদের বাপ, ভাই, স্বামীকে গুলী করে উড়িয়ে দিয়েছে ডাকাতরা। সেই সব মা যার ছেলে, সেই সব বোন যার ভাই, সেই সব স্ত্রী যার স্বামী, সেই সব ছেলেমেয়ে যাদের বাপ ডাকাতদের হাতে প্রাণ দিয়েছে, তাদের কথা কেউ ভাবলে না, তাদের জন্যে আশ্রম

খোলার কথা তো কেউ চিন্তাও করল না। আর অগুনতি সেই সব পুলিশের লোক যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের নাম কারুর মুখেও শুনলাম না। কে জানে, কে খবর রাখে, আজ গোবিন্দবাহাদুর থাপার বিধবা স্ত্রী আর সেই ফুটফুটে ফুলের মতো মেয়েটার। কোথায় তারা, কেমন আছে—বেঁচে আছে কিনা, কেউ জানে?

পুলিশের দাম্ভিকতা আর হামবড়াই ভাব যেমন ভালো লাগেনি, তেমনি আবার শান্তি-মিশনের শান্তিদূতদের ডাকাতদের 'হিরো' তৈরি করার চেষ্টা, 'লায়নাইজ (Lionise) করাও আমার ভালো লাগেনি। পুলিশ জানে, শুধু তাদের দ্বারা ডাকাতি-সমস্যার শেষ হবে না, কিন্তু ২০।২১ জন ডাকাত যে 'বাবা'র কাছে আত্মসমর্পণ করল, তা-ও তাদের অনেকের পছন্দ হয়নি। অনেক পুলিশ অফিসার ঈর্ষায় জ্বলে মরেছেন, এ-ও আমি জানি। কিন্তু এ-ও সত্যি যে, ক্রমাগত দিনের পর দিন বিনোবা, পুলিশের লোকদের, যারা বছরের পর বছর নিজের প্রাণ হাতে করে রোদ-বর্ষা-শীত উপেক্ষা করে, ডাকাতদের অত্যাচার থেকে অভিশপ্ত চম্বল উপত্যকাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে, করেছে ও করবে তাদের কটুবাক্য শুনিয়েছেন, হেয় করেছেন। অহিংসার পূজারী বিনোবা, তাঁর কাছে পুলিশের মূল্য হয়তো কম, কিন্তু বিনোবার কল্পিত সর্বোদয় সমাজ থেকে আজ আমরা অনেক দূরে। যেমন বিনোবার আন্তরিকতায়ও আমার কোনো সন্দেহ নেই, তেমনিই ডাকাত-অধ্যুষিত অভিশপ্ত চম্বল এলাকায় মোতায়েন পুলিশ ফৌজের আন্তরিকতায়ও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু হঠাৎ ২০।২১ জন দুর্ধর্ষ ডাকাত আত্মসমর্পণ করল কেন? এর উত্তর দিতে গেলে আরেকটা দেশব্যাপী বিতর্ক উঠবে। অন্য ডাকাতদের সম্বন্ধে বলতে পারবো না, কারণ তাদের আত্মসমর্পণ করা না করাতে লাভ-লোকসান বেশি নেই—তারা অনেকেই যাকে বলে 'ছুট্ ভাইয়া' বা স্মল ফ্রাই'। কিন্তু লুক্কা আর তার দল যে আত্মসমর্পণ করল, তার দাম আছে বইকি। কিন্তু কেন লুক্কা আত্মসমর্পণ করল? বিনোবা আর তাঁর সাথীরা বার বার

ঘোষণা করেছেন, তাঁরা ডাকাতদের কোনো প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দেননি। কিন্তু এই কথা অস্বীকার করা বৃথা যে, লুক্কার দলকে বলা হয়েছিল—যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তহসীলদার সিংকে ফাঁসি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হবে। যথেষ্ট এই প্রতিশ্রুতি। লুক্কা, কানহাই, এদের কাছে এই প্রতিশ্রুতির অনেক দাম। তাদের আত্মসমর্পণে যদি 'দাউ'-এর ঘরের শেষ প্রদীপ তহসীলদারের প্রাণ বাঁচে, তাহলে তারা তা করতে কোনো দ্বিধাই করবে না। শুধু তাই না, তাদের প্রাণ দিয়েও যদি তহসীলদারের প্রাণ বাঁচানো যায়, তারা হাসতে হাসতে প্রাণ দিতেও পারতো, আর তাদের হাসতে হাসতে প্রাণ দেবার বদলে তহসীলদার বেঁচে গিয়ে যদি উদিতপুরায় 'মাজী'র মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তাহলে তারা তা করতে কখনই পেছপা হতো না। 'মাজী' আজ কত বছর হাসেনি। 'দাউ' মানসি-এর নামে তারা সব কিছু করতে পারে। এর নাম হৃদয়-পরিবর্তন নয়, এর নাম আনুগত্য আর সেই আনুগত্যের জন্যে চরম মূল্য দেবার জন্যে এদের প্রস্তুতি। এই তো অভিশপ্ত চম্বলের কাহিনী। যুগ যুগ ধরে এই তো হয়ে আসছে। সভ্য সমাজের আওতায় হয়তো এই রকম বীরত্বের কোনো দাম নেই, কিন্তু তাদের কাছে এই হলো বীরত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিশ্বাস করতে মন চায় না। অনেক সময় আমারও কষ্ট হয়েছে বিশ্বাস করতে, কিন্তু না করে উপায় নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই তো হয়ে আসছে। এই তো অভিশপ্ত চম্বলের ভাঙনের গান। বেহড়ের প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে এই কাহিনীই তো শোনা যাবে—প্রাণ-দেওয়া, প্রাণ-নেওয়ার রক্তাপ্লুত কাহিনী।

তহসীলদারের ফাঁসি হবে না। 'দাউ' মানসিং-এর ঘরের শেষ প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলবে নৈনী কারাপ্রাচীরের অন্ধকার 'সেলে'। তার ফাঁসি মকুব হয়ে গিয়েছে রাষ্ট্রপতির হুকুমে। নিজেদের জীবন তুলে দিয়েছে—লুক্কা, কানহাই, আরো অনেকে অনির্দিষ্টের হাতে। তাদের বিচার হবে। সভ্য সমাজের কানুনে যদি তাদের জীবন যায় যাবে। তহসীলদারের জীবন যদি বাঁচে, যদি 'মাজী'র মুখে হাসি ফোটে, এর চেয়ে ভালো ঋণ পরিশোধের চেষ্টা আর কি হতে পারে? 'দাউ'-এর ঋণ তো প্রাণ দিয়েও শোধ করা যায় না।

ঐতিহাসিক, নেতা, দার্শনিক বা নীতিবিদ্—এর কোনোটাই আমি নই। আমার নেশা ও পেশা সাংবাদিকতা। জ্ঞান দেওয়া আমার কাজও না কর্তব্যও না। নিজের চোখের সামনে যা ঘটে যায়, তা তুলে ধরি। নিজের যা অভিজ্ঞতা হয়, তাই লিখি। কে ভালো বা কে মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই আর গুণও হয়তো নেই। বিনোবা মিশন নিয়ে অনেক প্রশ্ন অনেকে আমায় করেছে, আজও করছে। উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কঠিন হয়েছে। যা আমার সামনে ঘটেছে আর সেই সব ঘটনা আমার মনে যেসব চিন্তা এনেছে, তাই আমি তুলে ধরেছি।

"ভাই তরুণ" কলকাতা থেকে বৌদির কুপিত চিঠি এল, "এদিকে ডাকাতদের দল যে সাধু হয়ে গেল। এমন দুর্ধর্ষ নৃশংসতা, ভালোমানুষের মতো ল্যাজ গুটিয়ে নুয়ে পড়ল? অহিংসার বাহাদুরী আছে!···যত ডোবালো কিন্তু ডাকাতদের সাধু হওয়াটা। তুমি তো খুনীকে দিব্যি 'হিরো'র আসনে তুলে দিয়েছ—ভালো লাগছিল—সহ্য হচ্ছিল—সাধু হওয়াটা কেমন যেন মিনমিনে··· ।"

বৌদিকে কি জবাব দিয়েছিলাম, ঠিক মনে নেই, কিন্তু এই ভয়ই আমি করেছিলাম। আমি কাউকেই 'হিরো', 'ভিলেন' কিছুই করিনি। আমি শুধু দুর্ধর্ষ দস্যুদের, অভিশপ্ত চম্বলের সেই সব অভিশাপদের জীবনের অনেক জানা, না-জানা ছোট-বড় দিকটা তুলে ধরেছি। তারাও যে মানুষ, তাদেরও যে দোষ-গুণ, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ আছে—আমি তাই বলতে চেয়েছি, আর বলতে চেয়েছি, অভিশপ্ত চম্বলের সেই অভিশপ্ত রক্তমাখা ইতিহাসের কথা। "ক্রাইম ডাজ নট পে" বা "ইজ দেয়ার ক্রাইম ইন দি ব্লাড?" এই সব বড় সমস্যার সমাধান বা কারণ অনুসন্ধান আমি করিনি। রক্তে-মাংসে-গড়া অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ এই সব দস্যুদের চরিত্রই শুধু তুলে ধরেছি বাস্তবভাবে। যদি মানসিং, রূপা বা লাখনসিং-এর জন্যে কেউ দু'ফোঁটা চোখের জল আমার লেখা পড়ে ফেলে বা অন্য কেউ তাদের প্রতি ঘৃণায় আর ধিক্কারে থুতু ফেলে, আমার বলার কিছুই থাকবে না।

চম্বল পার হয়ে উসেটঘাটে এলেন 'বাবা'। আমার পাশে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে কমাণ্ডাণ্ট কুইন। আরো খানিকটা দূরে রুস্তমজী সাহেব। কুইনের দৃষ্টিটা যেন কেমন নিষ্প্রভ, জ্যোতিহীন। রুস্তমজী সাহেবকে মনে হচ্ছে যেন একটা স্ট্যাচু। তাঁর সেই মন্টিক্রিস্টো লিস্টটার কথা ভাবছেন বোধহয়। তাদের মধ্যে কেউ কি আসবে 'হাজির' হতে।

"কাম অন ম্যান্"—কনুইয়ে টান দেয় কুইন। 'বাবা'র পদযাত্রা শুরু হয়েছে। অনেক দূর যেতে হবে, অনেক দূর। 'বাবা' চলেছেন, সঙ্গে সাধু জেনারেল এবং আরও অনেকে। রামঅবতারও আছে। আমরাও রয়েছি।

গাঁয়ের পর গাঁ ঘুরেছি বাবার সঙ্গে। উসেটঘাট, উসেটঘাট থেকে রাছেড়, তারপর অম্বাহ, পোরসা, নাগরা, কানহেরা, কাডোরা, স্থরপুরা, ভিণ্ড, নয়াপুরা, পাগুরী এবং আরো অনেক গ্রামে। দিনের পর দিন গিয়েছে আর মনে হয়েছে, এই বুঝি এল সব আত্মসমর্পণ করতে। সকাল বেলা যাত্রা শুরু হয়েছে আশা আর উৎসাহ নিয়ে। সাধু জেনারেল ক্রমাগত সাইকেল নিয়ে ঘুরেছেন বেহড়ে বেহড়ে। সন্ধ্যে বেলায় আবার নিরুৎসাহ, কই কিছুই তো হলো না।

কে যেন কানে কানে সেই উসেটঘাটে ফিসফিস করে বলেছিল, 'বাবা' এপার দিয়ে এলেন পিনহাট থেকে উসেটঘাটে আর সেই রাতেই প্রায় বোধহয় সেই সময়েই 'ঠাকুর সাহেব' ডাকাতি করে চম্বল পার হয়ে চলে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের দিকে। আবার বাবার ক্যাম্প থেকে ক'মাইল দূরেই পানা করল দু-দুটো ডাকাতি।

কেন পাগুরীর সোনচিড়ইয়াই বলেছিল, তার ভাই 'হাজির' হতে কখনও আসবে না। সে কখনই আসবে না। যদি আসে তার 'লাশ' আসবে। আর ঠাকুর সাহেবই নাকি কাকে যেন বলেছিল, 'আত্মসমর্পণ করলেই আজ নয় কাল ফাঁসি হবেই। না করলে আরো দু-দশ বছর তো বেঁচে থাকবো।'

"কিংবা পুলিশের গুলীতে কাল মারা পড়তেও তো পারো?" সেই কে যেন জিজ্ঞাসা করেছিল।

"হো সক্‌তা হ্যায়।"

"ফির খতরা কুঁ্য মোল লেতে হো?" তাহলে এই বিপদ কেন জেনে শুনে মাথায় নিয়ে ঘুরছো?

ঠাকুর সাহেব নাকি জবাব দিয়েছিল, "খতরা তো হামারী জিন্দগী হ্যায়।" বিপদই তো আমার জীবন।

ঠাকুর সাহেব আসেনি আত্মসমর্পণ করতে। পানা আসেনি* বাহাদুররাও আসেনি, আরো অনেকে আসেনি। হঠাৎ মাঝ রাতে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো কানহেরা গাঁয়ে এসেছিল লুক্কা, কানহাই আর তাদের দলের কিছু লোক। মেওয়ারাম আসেনি। তার ভাই রামনাথের মৃত্যুর বদলা তার নেওয়া হয়নি। তাকে বোঝাতে পারে নি লুক্কা।

সতেরো

আবার নাগরা এসেছি। কমাণ্ডাণ্ট কুইনের সঙ্গে আবার বসেছি অতি পরিচিত সেই নিম গাছটার ছায়ায়। আমার সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ রঘুবীর সিং আর তার জামাই ভীকম সিং। রঘুবীর সিং আবার কর গুনে গুনে সব নামগুলো শুনিয়েছে আমায়—তিলক সিং, মথুরী সিং, জবরসিং, আরো অনেক। ভীকম সিং আবার শার্টের হাতাটা কনুই পর্যন্ত উঠিয়ে দেখিয়েছে গুলীর দাগ। কুইনের আর্দালি মাঝে মাঝে দিয়ে গিয়েছে কোল্ড ড্রিংক। কিন্তু নাগরার হাওয়ায় সেদিন ছিল কিছু-একটা-ঘটার ইঙ্গিত। ভোর বেলায় ছোটো নাগরা গাঁ জেগে উঠেছিল উৎসবের আনন্দে। ছোটো ছোটো নিশান ঝুলছে চারদিকে, আমের পাতা দিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক তোরণ। শাঁখ, ঘণ্টা বেজেছে ঘরে ঘরে।

লাখন সিং-এর গাঁ নাগরাতে এসেছিলেন বিনোবা ভাবে সেই রাস্তা দিয়ে পোরসা থেকে এঁকে বেঁকে "বেহড়ে"-এর মধ্যে দিয়ে। বৃদ্ধ রতনলাল জানে সেই রাস্তা, এখন যেমন হয়েছে সেই রকম না, আগে যে রকম ছিল সেই রকম যখন সেখান দিয়ে উট চুরি করে নিয়ে যেতো পোরসা থেকে নাগরা, আর নাগরা থেকে

* ছাপার কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে খবর পেলাম ১৯ ১১-৬ তারিখে পুলিশের এনকাউণ্টারে পানা মারা গিয়েছে।—লেখক।

চম্বল পার করে বেহড়ের মধ্যে দিয়ে ওপারে উত্তরপ্রদেশে। এখানকার আঁকা-বাঁকা রাস্তা অনেকেই জানে। আমি জানি, কুইন জানে, আরো অনেকেই জানে। ঠাকুর লাখন সিংও জানে। সেই রাস্তা দিয়েই এসেছে "বাবা"। "বাবার" ক্যাম্পে হতাশার ছায়া। "সাধু জেনারেল" দমে আছেন। উসেটঘাট থেকে রাছেড়, রাছেড় থেকে অম্বাহ, অম্বাহ থেকে পোরসা আর পোরসা থেকে নাগরা। কৈ, কেউ তো এলো না আত্মসমর্পণ করতে। তবে কি সব চেষ্টা, সব পরিশ্রম বৃথা হবে। ম্যালেশিয়ার বুশশার্ট, প্যাণ্ট আর মাথায় মস্ত বড় টুপি পরে সাইকেলে চড়ে বেহড়ের মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন যত্নুনাথ সিং।

কুইনের তাঁবুর ভিতরে লাঞ্চে সেদিন ভিড় হয়েছিল অনেক সাংবাদিকের। হেঁটে হেঁটে "বাবার" সঙ্গে পদযাত্রা করতে করতে শ্রান্ত ক্লান্ত সব সাংবাদিকরা আতিথ্য স্বীকার করেছে কমাণ্ডাণ্ট কুইনের। কাঁটা-ছুরির টুং-টাং মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেছে আর কুইনের হো হো করে হাসি আর সাদর অনুরোধ, "কাম অন ম্যান হ্যাভ ওয়ান মোর চিকেন পিস", দূর করেছে সব শ্রান্তি।

আজ লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে সেদিনকার দুপুর বেলার সব কথা। লাঞ্চ সেরে নিজের তাঁবুতে গিয়ে সবে গা ঢেলেছি এমন সময় আস্তে আস্তে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়িয়েছে কুইন। হ্যাঁচকা টান মেরে বিছানা থেকে উঠিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেছে 'কাম অন ম্যান'। চুপচাপ উঠে কুইনের সঙ্গে গিয়েছি। ফোর্থ ব্যাটালিয়নের হেড কোয়ার্টারে ঢুকে আরেকটা তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়েছে কুইন। তাঁবুর পর্দা তুলে ধরে ভিতরে বসা তিনজন লোককে দেখিয়ে বলেছে 'হ্যাভ এ লুক'।

"বাট হু আর দে।" কারা এরা ?

হো হো করে হেসে উঠেছে কুইন। চুপচাপ আবার তিনজন লোককে তাঁবুর ভিতর থেকে বের করে নিয়ে বসিয়েছে সেই নিম গাছটার নিচে। কুইনের চোখে মুখে হাসি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই বলে "আস্ক দেম," এদেরই জিজ্ঞাসা করো। ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে এসেছে। চিৎকার করেই বলেছি নিজে "কাম অন

ম্যান, লেট আস হ্যাভ ইট"। আবার হেসে ধীরে সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কুইন যখন জবাব দিয়েছে, চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছি। ছুটে গিয়েছি তাঁবুর দিকে টাইপরাইটার আনতে। পেছনে শুনতে পেয়েছি কুইনের প্রাণখোলা মনমাতানো হাসি।

মোহরমনিয়া, পাতিরাম আর শ্রীকিষেণ—মধ্যপ্রদেশের অভিশপ্ত চম্বলের তিন দুর্ধর্ষ ডাকাত। এসেছে চম্বল সাঁতরে, বেহড় পার করে লাখন সিং-এর গাঁ নাগরাতে "বাবা"র কাছে আত্মসমর্পণ করতে। পাতিরামের হাতে বন্দুক।

"বোলো ম্যান সাহেবকো সব বোলো"—কুইন হুকুম দেয় মোহরমনিয়া, পাতিরাম আর শ্রীকিষেণকে আমায় সব বলতে। তারপর দু'ঘণ্টা ধরে বসে কথা বলেছি এদের সঙ্গে। মোহরমনিয়া বলেছে কল্লার মৃত্যুর কথা। কি করে শুধু কল্লা ছাড়া তারা সবাই অন্ধকারে পালাতে পেরেছিল। "সাব গোলী, গোলী, গোলী, দনাদ্দন দনাদ্দন। কুছ নহী দেখা। খালি গোলী। হাম সব ভাগা"। কল্লা মরেছে। পুতলীর কল্লা। তারপর দল গিয়েছে ভেঙে আর মোহরমনিয়া এসেছে আত্মসমর্পণ করতে। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে নির্বিকারভাবে শ্রীকিষেণ বলেছে রূপার দলের কথা। খুব কম দিনই ছিল রূপার দলে। পালিয়ে এসেছে দল ছেড়ে।

এবার পাতিরামের পালা। বন্দুকটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছে লুক্কার কথা। রূপার মৃত্যুর পরে সেও পালিয়েছে দল ছেড়ে। ক'টা খুন করেছে জীবনে? মনে নেই। "কিসকো ইয়াদ সাহাব"। খুন করতে কেমন লাগতো। কে জানে। "ক্যায়া মালুম। ব্যস, খুন কিয়া ইতনা মালুম"।

সন্ধ্যেবেলায় প্রার্থনা-সভায় হাজার হাজার লোকের সামনে পাতিরাম শ্রীকিষেণ আর মোহরমনিয়া আত্মসমর্পণ করল 'বাবা'র কাছে। 'বাবা' জড়িয়ে ধরলেন এদের বুকের মধ্যে। সাধু জেনারেল আমার পাশে এসে টিপ্পনি কাটলেন, "ওয়েল ওয়েল"।

ভোর বেলায় আবার শুরু করেছি বিনোবার সঙ্গে পদযাত্রা। সঙ্গে চলেছে রামঅবতার, মোহরমনিয়া, পাতিরাম আর শ্রীকিষেণ।

দশ মাইল হেঁটে পৌঁছেছি কানহেরা গাঁয়ে। 'বাবা'র পদযাত্রা যখন চলেছে মাঝের উদ্বৃতগড় গাঁয়ে আশী বছরের বৃদ্ধ পঞ্চম সিং দাঁড়িয়েছে জোড় হাত করে 'বাবা'র দর্শন করতে। অভিশপ্ত চম্বল উপত্যকার প্রাচীন অভিশাপ পঞ্চম সিং। যখন 'দাউ' মান সিং-এর নামও কেউ শোনেনি তখন দস্যু পঞ্চম সিং-এর আতঙ্কে কেঁপেছে সারা উপত্যকা। গোয়ালিয়রের মাধোরাও সিন্ধিয়ার কাছে পঞ্চম সিং একদিন প্রাণভিক্ষার বদলে আত্মসমর্পণ করেছিল। পঞ্চম সিং আজ বৃদ্ধ, চোখে দেখতে পায় না। ময়লা, ছেঁড়া কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিল গাঁয়ের এক কোণে। পঞ্চম সিংকে আজ ত্ব'বেলা ত্ব'মুঠো অন্নের জন্যে চিন্তা করতে হয়।

পঞ্চম সিং অতি তুঃখের মধ্যে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি কেন? চারজন ডাকাতের নাম শুনে পঞ্চম সিং হেসে উঠেছে। বলল, এরা আবার ডাকাত নাকি? সব ছিঁচকে, কাপুরুষ। সব বেটা ইঁতুর পঞ্চম সিং-এর কাছে এইসব ডাকাতদের কোনো দাম নেই। নিজের হারানো দিনের দস্যুবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করে আজকের ডাকাতদের। পঞ্চম সিং-এর সময় না ছিল এত বন্দুক, না ছিল এত গোলাগুলী। নিজের বুকের ওপর হাত চাপড়ে বলল, "সাহেব, আমাদের সময় লাগত হিম্মত, কলিজা আর গায়ের জোর"। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারিনি পঞ্চম সিং-এর কাছে, চলে যেতে হয়েছিল কানহেরা গাঁয়ে। কানহেরা পৌঁছেই আবার চলে যেতে হয়েছিল অনেক দূরে জসমেরা আর খিশোনী গাঁয়ের কাছেই একটা জায়গায়। সেখান থেকে ফিরেছি অনেক রাতে। 'সাধু' জেনারেল অনেক চেষ্টা করেছিলেন যাতে আমি না যেতে পারি। কিন্তু তাঁর আর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সেদিন আমি যা করেছিলাম আমার সাংবাদিক জীবনে তা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, এক বিস্ময়কর অনুভব। গুছিয়ে বলা যায় না সে অনুভব। হঠাৎ কানে এসেছিল সংবাদটা আর হঠাৎই জায়গাটার নামটা শুনতে পেয়েছিলাম। এক মুহূর্ত দেরি করিনি। পড়ি কি মরি করে জীপ নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম।

রূপা মহারাজের টেলিস্কোপিক রাইফেল ক্ষিপ্রগতিতে চেপে ধরেছিল লুকা আর কানহাই রাইফেল তুলে ধরেছিল তাক্ করে।

আমার এই অযাচিত হঠাৎ আবির্ভাব তাদের করেছিল বিস্মিত আর ক্রুদ্ধ। কিন্তু বেশি সময় আমার লাগেনি এদের বোঝাতে। লুক্কা মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছে বারবার কি করে আমি এই জায়গার খোঁজ পেয়েছি আর বারবার আমি লুক্কাকে বলেছি—এ ছাড়া তার বাকী যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজী আছি। হার মেনেছে মহারাজ। আর জিজ্ঞাসা করেনি। আমিও বেশি প্রশ্ন করিনি। করলেও উত্তর হয়তো পেতাম না। সন্ধ্যেবেলা কিন্তু নিজে হাতে করে আমাকে খাবার আনিয়ে দিয়েছে। তারপর রাতে যখন শুয়েছি তখন আমার এক পাশে কানহাই আর এক পাশে লুক্কা মহারাজ। ঘুম আসেনি সে রাতে। বেহড়ের সেই নিস্তব্ধ ভয়াবহ রূপ আমায় করেছে বিচলিত আর চম্বলের জলের ওপর থেকে ভেসে আসা বাতাস মনে জাগিয়েছে অনেক অজানা ভয়। ক্রমাগত একটার পর একটা সিগারেট খেয়েছি আর আমার জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছে লুক্কা মহারাজ।

"কুঁ্যা সাহাব, ডর লাগতা হ্যায়"? ভয় লাগছে কিনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে মহারাজ।

"নহী, ডরকি ক্যায়া বাত হ্যায়" ভয় লাগলেও কাঁপা গলায় উত্তর দিয়েছি কৃত্রিম সাহস দেখিয়ে।

রাতের আঁধারে তারপর এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা জীপ। চিৎকার করে উঠেছেন আমায় দেখে সাধু জেনারেল—"ইউ, ইউ থিফ্"! জীপ ক'টা রওনা হবার আগেই তাড়াতাড়ি উর্ধ্বশ্বাসে জীপ চালিয়েছি আর পৌঁছেছি আবার কানহেরা গাঁয়ে। রাত তখন তিনটে। বসেছিলাম কানহেরা গাঁয়ের পাঠশালার সামনেই একটা কূয়োর ওপর। অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে এসেছে দূর থেকে একটা কুকুরের আর্তনাদ আর গাছের ওপর থেকে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠেছে একটা ময়ুর। দুটো জীপ এসে দাঁড়িয়েছে পাঠশালার সামনে আর তার থেকে নেমেছে বারোটা ছায়ামূর্তি। দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। ধীরে ধীরে ছায়ামূর্তিগুলো চলল পাঠশালার দিকে—লুক্কা, কানহাই, ভূপসিং মটরে, বিদ্যারাম, তেজাসিং, ভগবানা, দুর্জনা, জংগে, মালহা, রামসানহাই, দরল্লা আর সাধু জেনারেল। পাঠশালার বারান্দায় লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয়

বসে আছেন 'বাবা'। ধীরে ধীরে 'বাবা'র সামনে হাতজোড় করে বসল সবাই। সাধু জেনারেল দড়াম করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজায় কান লাগিয়ে শুনতে লাগলাম আর মাঝে মাঝে ভাঙা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে দেখছিলাম মাঝরাতের সেই নাটকীয় দৃশ্য।

"বাবা ইয়ে হ্যায় লুক্কা—পণ্ডিত লুকমন্ শর্মা। আউর ইয়ে হ্যায় ইনকী দূরবীনওয়ালী বন্দুক"—সাধু জেনারেলের গলা। লুক্কা মহারাজ এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল বাবাকে। লণ্ঠনের আলোতে লুক্কাকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত। ফর্সা রং হয়েছে লাল টকটকে আর নীল চোখ দুটো জ্বলছে নীল কাচের মতো।

"আউর ইয়ে হ্যায় কানহাই, রূপাকে ভাই"—আবার বলল সাধু জেনারেল। এবার কানহাই এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল বাবাকে। সাধু জেনারেলের ধাক্কা খেয়ে এরপর সরে আসতে হয়েছে দরজার কাছ থেকে, আর বেশি কিছু দেখতে পাইনি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সবাই বেরিয়ে এসেছে আর লুক্কা আমায় দেখে এগিয়ে এসেছে। "কেয়া লিখোগে সাহাব হামারে বারেমে"—জিজ্ঞাসা করেছে কি লিখব তাকে নিয়ে।

"আচ্ছা তোমাদের কাছে যে টি. এম. সি. আর প্রচুর হ্যাণ্ড গ্রিনেড ছিল সে সব গেল কোথায়?"

"বেচ দিয়া"—বিক্রি করে দিয়েছি—অম্লানবদনে বলে লুক্কা।

"কিসকো"? কাকে?—এবার লুক্কা শুধু হাসল। কোনো উত্তর নেই আর আশাও করিনি। আমার আরেকটা প্রশ্নের উত্তর লুক্কা দেয়নি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম মেওয়ারাম কেন আত্মসমর্পণ করল না। চুপচাপ ছিল মহারাজ। কিন্তু আমি জানি মেওয়ারাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছে আত্মসমর্পণের কথা। রাগ করে চলে গিয়েছে দল ছেড়ে। তার ভাই রামনাথের মৃত্যুর বদলা তার এখনও যে নেওয়া হয়নি।

আর মট্রে। তার হাতে তখনও গুলীলাগা ক্ষত। যে এনকাউন্টারে রামনাথ মরে সেখান থেকেই গুলী লেগে পালিয়েছিল মট্রে কাতরাতে কাতরাতে। বুঝতে পারে না এ কিরকম লড়াই —যখন সে হাত তুলে দাঁড়িয়েছিল কেন পুলিশ তার হাত লক্ষ্য

করে গুলী করল। যুদ্ধে তো হাত তুলে দাঁড়ালেই "সারেণ্ডার" হয়ে যায়। গুলী লেগে সে পালিয়েছিল আর বেহড়ের মধ্যে এসে লুক্কা মহারাজ তাকে দিয়েছে টিটেনাস ইঞ্জেকশন আর করেছে ব্যাণ্ডেজ।

আশেপাশের গাঁ আর শহর ভেঙে পড়েছে ছোট্টো কানহেরা গ্রামে। হাজার হাজার লোক দেখতে এসেছে 'বাগী'দের। সেই ভিড়ের মধ্যে এসেছে লচ্ছী আর তার সঙ্গী প্রভু ডাকাত। চুপচাপ তারাও আত্মসমর্পণ করেছে 'বাবা'র কাছে। ধূর্ত, নিষ্ঠুর লচ্ছী। বম্বে দিল্লী কলকাতা করে বেরিয়েছে। টাকা ফুরিয়েছে আবার করেছে অপরাধ। বম্বেতে খবরের কাগজে 'বাবা'র শান্তির বাণী শুনে এসেছে আত্মসমর্পণ করতে।

ভোরবেলা আবার শুরু হয়েছে 'বাবা'র পদযাত্রা। সে দৃশ্য আমি ভুলব না। পুলিশের গাড়িতে চলেছে 'বাগী'রা কাঁধে বন্দুক আর বুকে ঝোলানো গুলীর বেল্ট। হাজার হাজার লোক জয়ধ্বনি করতে করতে চলেছে তাদের পিছনে। 'হিরো'র মত রাস্তায় রাস্তায় ডাকাতদের হয়েছে অভ্যর্থনা। সে দৃশ্য দেখলে ফিল্মস্টারদেরও রীতিমতো ঈর্ষা হতো। সেই উত্তেজিত হাজার হাজার জনতার সঙ্গে 'বাবা' চলেছেন আগে আগে। এসে পেঁাচেছেন কাডোরা গাঁয়ে, সেখানেও অপূর্ব দৃশ্য। রাস্তার মোড় থেকে গাঁ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। আমপাতা দিয়ে সাজানো তোরণের মধ্যে দিয়ে গাঁয়ে ঢুকছেন 'বাবা' আর পেছনে এসেছে— 'বাগী'দের দল।

কাঁধে বন্দুক নিয়ে একের পর এক সবাই ঢুকছে গাঁয়ের মধ্যে, দু'পাশে জনতার ভিড়। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে জীপ থেকে বেরিয়ে এলেন পুলিশ অফিসারেরা। ডি. আই. জি কোহলী আর কামাণ্ডাণ্ট কুইন সবার আগে। বাগীদের সঙ্গে করমর্দন করছেন তাঁরা। কোহলী সাহেব হাত বাড়িয়ে দেন আর বলেন, "সাবাস্ সাবাস্ আচ্ছা হুয়া, আচ্ছা হুয়া।" তারপরই হঠাৎ ঘটনাটা হয়ে গেল। প্রথমে কেউ বুঝতেও পারেনি। সবাইকার সঙ্গে হয়ে গিয়েছে করমর্দন্। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল কমাণ্ডাণ্ট কুইন লুক্কার সঙ্গে হাত মেলাতে। এক লহমার জন্যে লুক্কা থেমে গেল। তার নীল

চোখ দিয়ে যেন হঠাৎ আগুনের ফুলকি ছুটে বার হলো। ঝট করে হাতটা সরিয়ে নিল। কুইনের মুখের সবসময়ের হাসি মিলিয়ে গেল এক নিমেষে। "হঠ্ যাও হামারে সামনেসে" লুক্কা চিৎকার করে গালাগালি দেয় কুইনকে। সহ্য করতে পারছে না সে কুইনকে। সে ভুলতে পারেনি তার রূপা মহারাজকে মরতে হয়েছিল কুইন সাহেবের হাতে। কি করে সে ভুলতে পারবে সেই ঘটনা আর সেই কথা। ভুলে গিয়ে কি করে সে হঠাৎ হৃদয়-পরিবর্তন করে কুইন সাহেবের সঙ্গে হাত মেলাবে। অসম্ভব। লুক্কার পেছনেই ভূপসিং হঠাৎ বন্দুকটা চেপে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে বিষিয়ে উঠল সমস্ত আবহাওয়াটা। একটা চাপা উত্তেজনা, একটা অজানা অশুভ আতঙ্ক ছেয়ে গেল সারা কাডোরা গাঁয়ে। কে যেন হঠাৎ টেনে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল কুইনকে।

সারাদিন কাডোরা গাঁয়ে সেদিন সকাল বেলার ঘটনার কালো ছায়া সবাইকে করেছে চিন্তিত। মাঝে মাঝে কে বা কারা যেন খুঁজে খুঁজে পুলিশ ক্যাম্পের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছে বারবার, কে কুইন সাহেব? কোথায় সে? তারা তাকে দেখতে চায়। বড় কর্তারা কুইন সম্বন্ধে উদ্বিগ্নে কাটিয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যদি কিছু হয়। যদি লুক্কা বা আর কেউ হঠাৎ কুইনকে……? সাধু জেনারেল বলেছিলেন 'বাগীরা' শুধু আত্মসমর্পণই করেনি তারা তাদের হৃদয়ও সঁপে দিয়েছে বাবার চরণে—"দে হ্যাভ সারেণ্ডার্ড দেয়ার হার্টস্ টু"। কিন্তু তাহলে এসব কি?

এই ঘটনার পর সরকারী মহলে হয়েছে অনেক জল্পনা কল্পনা। 'বাবা'কে আর সাধু জেনারেলকে বুঝিয়ে অনেক করে রাজী করানো হয়েছে যাতে 'বাগীরা' তাদের অস্ত্র-শস্ত্র তুলে দেয় কর্তৃপক্ষের হাতে। আবার দেখা দিয়েছে একটা থমথমে ভাব। সেই কয়েক ঘণ্টা মনে হয়েছে—কয়েক যুগ। অস্ত্র-শস্ত্র ছেড়ে দিতে কেউই রাজী না। অনেক কষ্টে তাদের রাজী করালেন সাধু জেনারেল। ঠিক হলো সন্ধ্যে বেলা হবে 'আর্মস্ সারেণ্ডার'। ছোটো একটা তাঁবুর মধ্যে বসলেন ভিণ্ড জেলার কালেক্টার, গোয়ালিয়রের

কমিশনার, পুলিশ সুপার পাহুজা, আরো অনেকে। একে একে 'বাগীরা' এল আর তাদের বন্দুক আর কার্তুজ রেখে গেল। সব চেয়ে শেষে এল লুক্কা। রূপা মহারাজের টেলিস্কোপিক রাইফেল তার হাতে। একবার করে দেখে রাইফেলটার দিকে আর তার ওপর হাত বুলায় লুক্কা। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। লুক্কা আবেগে চেপে ধরে রাইফেলটা শেষবারের মতো। তাঁবুর মধ্যে আবার সেই গুমোট ভাব। মুখটা একপাশে ঘুরিয়ে হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লুক্কা রাইফেলটা তুলে দিল কালেক্টর সাহেবের হাতে। ছুটে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কুঁ্য মহারাজ?"

লুক্কার নীল কাঁচের মতো চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে চলে গেল খানিকদূর এগিয়ে। খানিক পরে আবার ফিরে এল তাঁবুর কাছে এসে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল রাইফেলটার দিকে। আবার চলে গেল আবার ফিরে এল। যখন পুলিশের গাড়ি করে সব রাইফেল আর প্রায় ৯০০ রাউণ্ড কার্তুজ চলে গেল, মহারাজ একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল গাড়িটার দিকে।

আর কিছু তো নেই মহারাজের কাছে! হ্যাঁ আছে। থলী থেকে বের করে দিল লুক্কা একটা হ্যাণ্ডগ্রিনেড। কুইন তখনও কাডোরা গ্রামে। এক ঘণ্টা পরে আর একটা হ্যাণ্ডগ্রিনেড নিয়ে এল লুক্কা। বলল, সকালে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। রাতে আবার একটা হ্যাণ্ডগ্রিনেড নিয়ে এল—বলল আর কিছু নাই আমার কাছে।

সে রাতে কাডোরা গ্রামে দু'জন ঘুমোতে পারেনি। আমি আর লুক্কা মহারাজ। নাগরা ফিরে গিয়ে কমাণ্ডাণ্ট কুইনও বোধহয় ঘুমুতে পারেনি। যখন 'বাবা'র ক্যাম্পের সব গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আমি ঘুরে বেড়িয়েছি ক্যাম্পের আশেপাশে। গাছের নীচে বসে সিগারেট নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তার অনেক এলোমেলো জট ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। ছায়ামূর্তির মতো তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল লুক্কা। চুপচাপ এসে থামল গাছটার কাছে।

"ক্যুঁ মহারাজ নীদ নহী আতী ?"—জিজ্ঞাসা করি লুক্কাকে।

ভরা গলায় জবাব দিয়েছিল মহারাজ "নহী"। অদ্ভুত এই শান্ত পরিবেশে তার ঘুম আসছে না। হঠাৎ কি যেন সব হয়ে গেল। বছরের পর বছর, রাতের পর রাত সে পালিয়েছে। অজনা ভয় আর আশঙ্কা সব সময় তাকে করেছে বিচলিত আর আজ অনেক বছর পরে এই শান্ত পরিবেশে জীবনে প্রায় প্রথমবার শান্তিতে ঘুমোবার অবসর পেয়ে তার ঘুম হচ্ছে না। আর কি হচ্ছে? লুক্কার হাতের মুঠো বন্ধ হচ্ছে না। কেন? হাতের রাইফেলটা যে নেই। এই ১৫।২০ বছর প্রতি মুহূর্তে মুঠোর মধ্যে চেপে রেখেছে রাইফেল আর আজ সেই মুঠো হঠাৎ খালি হয়ে গিয়েছে। তাই তার মুঠো বন্ধ হচ্ছে না। কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি। পুলিশের ভয়ে পালাতে হচ্ছে না। ফেলে আসা রক্তমাখা দিনগুলো যেন কেমন বহুযুগের পুরনো ইতিহাসের মতো মনে পড়ছে। রূপা মহারাজ, 'দাউ' মানসিং, সুবেদার সিং, তহসীলদার সিং সবাইকার কথা যেন আজ মনে পড়ছে।

হঠাৎ বলে ওঠে লুক্কা—"আজ আর আমি কি? আমার হাতে আজ রাইফেল নেই। আজ ছোটো একটা শিশু যদি এসে আমায় লাথি মারে আমি কি-করতে পারি? কি আমার শক্তি? মনে হচ্ছে আমার কলিজাটা কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছে। আমি তো আজ একটা "জিন্দা লাশ"।" আমি বেশি কথা বলিনি। চুপচাপ অন্ধকারে বসে মহারাজের কথা শুনেছি। সিগারেটের আভায় লুক্কার নীল চোখ দুটো জ্বলছিল নীল কাঁচের মতো।

তারপরের ঘটনাগুলো ঘটেছে সাধারণভাবে। ইতিহাসে বা সাংবাদিকতায় তাদের কোনো দাম নেই। 'বাবা'র পদযাত্রা চলেছে—গাঁয়ের পর গাঁ। সঙ্গে চলেছে সব বাগীরা। সুরপুরায় এসেছে আরো তিনজন। করম সিং, বদন সিং আর রামদয়াল। মেওয়ারামের দল ছেড়ে চলে এসেছে এরা। গাঁয়ের পর গাঁয়ে হাজার হাজার লোক এসেছে এদের দেখতে। 'বাবা'র অনেক প্রার্থনা-সভা ভেঙে গিয়েছে জনতার ডাকাত দেখবার কৌতূহলে। আর টুকরো টুকরো ছোটোখাটো অনেক ঘটেছে। একদিনের কথা আমার মনে পড়ে। গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সেই ছোটো

হাস্যরস মন্দ লাগেনি। লুক্কা আর কানহাই তখন হয়ে উঠেছে বিরাট 'হিরো'। তাদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। প্রেস ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টাররা ঘুরছে তাদের পেছনে পেছনে সারা সময়। কানহাই-এর ফটো তুলতে গেলেই সে বলত 'দাঁড়াও'। তারপর নিজের গোঁফজোড়াতে তা দিয়ে, চুমরী পাকিয়ে ঠিক 'অ্যাঙ্গেলে' রেখে বলতো "হ্যাঁ আব লেও"। এক পুলিশ ফটোগ্রাফারের নাম দিয়েছিল কানহাই, জনীওয়াকার। হেসে আর বাঁচি না আমরা।

সেদিন লুক্কাকে বাগে পেয়ে তাকে ঘিরে ধরলো কয়েকজন রিপোর্টার। যে গুরুগম্ভীরভাবে লুক্কা সেদিন রিপোর্টারদের 'ম্যানেজ' করল, অনেক হোমরা চোমরা নেতাও তা বোধহয় পারবেন না। বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল মহারাজ, "তোমরা বড় বিরক্ত করছ আমায়। তোমাদের জ্বালায় আমি অস্থির। একবার এ আসে তো একবার ও আসে। ভালো লাগে না কেবল এক কথা বলতে। আমার হাতে সময় বেশি নেই। তার চেয়ে এক কাজ করো। সবাই একসঙ্গে এসো। যার যা জিজ্ঞাসা করবার জিজ্ঞাসা করে নিয়ে লিখে নাও। বারবার ভালো লাগে না।"

রিপোর্টাররা তো থ।

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই লুক্কা বলে উঠল, "তোমাকে তো সব বলেছি। তুমি বলে দাও না এদের। তুমি কি লিখেছ— দেখিয়ে দাও না এদের। সব লেঠা চুকে যায়।"

কি করে মহারাজকে বলি এক খবরের কাগজের সঙ্গে আরেক কাগজের কি গলাকাটা-প্রতিযোগিতা। চুপচাপ পালিয়ে এসেছিলাম ভিড় থেকে। সেই প্রেস-কন্‌ফারেন্সের পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিনি। শুধু এইটুকু জানি গোমড়া মুখ করে হোমরা চোমরা রিপোর্টাররা সব ফিরে এসেছিলেন।

কয়েকদিন বাদেই সভ্যজগতে বাগীদের ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা হয়েছে শেষ আর তাদের সঁপে দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের হাতে। বেহড়ের স্বাধীনতাও এর সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে শেষ। আবার হয়েছিল সেই চাপা উত্তেজনা, একটা অজানা অশুভ আতঙ্ক আর থমথমে আবহাওয়া। ভিণ্ড শহরের লোকেরা বোধহয় কখনও

সেরকম দৃশ্য দেখেওনি, দেখবেন না। যেমন 'হিরো'র অভ্যর্থনা বাগীরা পেয়েছিল তেমনি আবার তাদের হলো 'হিরো'র মতো বিদায় —'হিরো'স সেণ্ড অফ্। আবার হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়েছিল বিনোবার প্রার্থনা-সভার। সভার এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশের ব্ল্যাকমারিয়া। 'বাবা'র আশীর্বাদ নিয়ে এরা চলল জেলে। আশ্রমের মেয়েরা পরিয়ে দিল কপালে রক্তচন্দন, হাতে বেঁধে দিল রাখী। লুক্কা রাখীর বদলে দিল টাকা। 'বাবা'র চরণে প্রণামী দিল। বিদ্যারাম শুরু করল রামধুন "রঘুপতি রাঘব রাজারাম"। এককালে পুলিশের কাজ করত বিদ্যারাম। রাইফেল চুরির অপরাধে ছ'বছর জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে হয়েছিল 'বাগী'। সুমধুর কণ্ঠে গাইল বিদ্যারাম আর করতালি দিয়ে জনতা তার সঙ্গে গেয়ে উঠল 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম।' ছাদের উপর দাঁড়িয়ে কৌতূহলী জনতার কৌতূহল নিবৃত্ত করল ডাকাতরা. তারপর জয়মাল্য পরে চলে গেল জেলে। পুলিশের গাড়ির পিছনে পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত দৌড়েছে জনতা আর ডাকাতদের সঙ্গে গলা ছেড়ে চেঁচিয়েছে "ভারত মাতা কী জয়" "মহাত্মা গান্ধীকী জয়।"

পরদিন 'বাবা' ভিণ্ড ছেড়ে চলে গেলেন পাণ্ডরীর দিকে। জনতার ভিড় কমে এল আর কমে এল ক'দিনের উৎসাহ, উত্তেজনা আর উদ্দীপনা। যাবার আগে গেলেন ভিণ্ড জেলে। জেলের প্রাঙ্গণে আবার হলো প্রার্থনা সভা। বিদ্যারাম আবার ধরল রামধূন। লুক্কা বাবাকে অনুরোধ জানাল—সে শুধু একবার নেহরুজীর সঙ্গে দেখা করতে চায়। 'বাবা' বলিলেন তিনি পণ্ডিতজীকে বলে দেখবেন।

আরেকটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়েছে। জেলে যাবার আগে ডাকাতদের সঙ্গে তাদের আত্মীয় স্বজনদের কয়েক মুহূর্তের মিলন। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছি সেই অদ্ভুত দৃশ্য। কান্নার রোলে সেদিন 'বাবা'র ক্যাম্প ভরে উঠেছিল। কারুর মা, কারুর ভাই, কারুর স্ত্রী-পুত্র। কারো চোখে জল, কেউ চিৎকার করে কাঁদছে আর কেউবা আনন্দের আতিশয্যে ছুটোছুটি করছে। সে দৃশ্য ভোলা যায় না, ভুলবার কথা নয়।

কিন্তু আরেকদিনের কথা তো বলা হলো না। আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি। বলেছিলাম কোনোদিন যাব না সেই গাঁয়ে। কিন্তু আমায় আবার যেতে হয়েছিল সেই গাঁয়ে। জানতাম সেখানে গেলেই আমায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সে প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে ছিল না, আজও নেই। কিন্তু তবুও আমায় যেতে হয়েছিল উদিতপুরায় আবার।

বাড়ির দরজায় হাত রেখে ঝাপসা চোখে দাঁড়িয়েছিল রুক্মিণী। 'বাবা' আসছেন তার গাঁয়ে আর আসছে তার স্বামীর আদরের লুক্কা। আরো বৃদ্ধা হয়েছে রুক্মিণী। চোখের দৃষ্টি আরও ক্ষীণ হয়েছে।

"আও বেটা। বড়েদিন বাদ আয়ে"—ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল রুক্মিণী যখন "মাজী" বলে ডেকে তার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম।

আঠারো

কেঁদে কেঁদে পাথর হয়ে গিয়েছে রুক্মিণী। আর কত সে কাঁদবে! বছরের পর বছর শীর্ণ আঙুলের কর গুনেছে—"সুবেদার সিং, যশবন্ত সিং, ধম্মন সিং, উনকে বাপ আউর তহসীলদার"—আর অঝোরে কেঁদেছে। সব গিয়েছে—"উসকে বাদ সব খতম।" টিম টিম করে স্বামীর ঘরের প্রদীপ জ্বলছে নৈনী কারাগৃহের অন্ধকার সেলে। আজ নয় কাল, হয়তো দপ্ করে নিভে যাবে। তারপর, তারপর আর রুক্মিণীর নিজের বাঁচার কোনো দরকার নেই। এখনও নেই। তবুও বেঁচে আছে যদি, যদি "ভগবান কি কৃপা"য় তার চোখের মণি তহসীলদার ফিরে আসে। দিনের পর দিন সে ভোর বেলায় উঠে দাঁড়িয়েছে গাঁয়ের মোড়ে, অনেকদূরে দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে—কৈ সে, কে যেন বলেছিল, কোথা থেকে এক "বাবা" আসবেন, তিনি তো এলেন না। তহসীলদারের ছেলে শ্যাম সিংকে জিজ্ঞাসা করেছে বারবার "বাবা" তো এল না। বুঝিয়েছে শ্যাম সিং, "বাবা" ঠিক দিনেই আসবে। রুক্মিণীর সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা ঐ "বাবা"র ওপর। যদি, যদি তহসীলদার ফিরে

আসে। তাহলে, তাহলে কি করবে সে। ভাবতে পারে না রুক্মিণী। অঝোরে আবার কেঁদে ফেলে। কে তাকে বোঝাবে তহসীলদার বেঁচে গেলেও তার কাছে ফিরে আসবে না। যেদিন ফিরে আসবে সেদিন হয়তো রুক্মিণী থাকবে না।

তারপর "বাবা" এসেছেন সুদূর উদিতপুরায়। ছুটে গিয়েছে বাবার দর্শন করতে। বাবা নিজেও এসেছেন তার বাড়িতে। বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়েছেন সে নিজে। তহসীলদারের বউ আর রুক্মিণীর নাতি-নাতনীরাও 'বাবা'র পা জড়িয়ে ধরেছে। "বাবা" এত লোকের এত করছে আর তার ছেলের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তার স্বামীর সম্পত্তি খেড়া-রাঠোরের সেই "গড়হী" সে কি আর দেখতে পাবে না। তারপর 'বাবা' চলে গিয়েছে উদিতপুরা ছেড়ে। তার ছেলে, "দাউ"-এর চোখের মণি তহসীলদারের জীবন বেঁচে গিয়েছে কিন্তু সে তো তার কাছে ফিরে আসেনি। কই রুক্মিণীর চোখের জল তো এখন শুকোয়নি। পাথর সে অনেকদিনই হয়ে গিয়েছে কিন্তু সময়-ভারাক্রান্ত অগুনতি নির্মম দাগ-কাটা লোল চর্ম গাল বেয়ে তো অবিরাম ধারায় বয়েই চলেছে জল।

হ্যাঁ সেদিন, অনেকদিন পরে রুক্মিণী হেসেছিল। খুশির জোয়ারে মন ভরে উঠেছিল। হাসতে হাসতে কেঁদেই ফেলেছিল। তার জীবনে এমন দিন আসবে রুক্মিণী কোনোদিন ভাবতে পারেনি। সবাই এসেছে—সবাই। লুক্কা, কানহাই আরো সবাই। উদিতপুরায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে তারা গিয়েছে রুক্মিণীর বাড়ি। "মাজী" বলে লুটিয়ে পড়েছে তার পায়ে। লুক্কা আর কানহাইকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে রুক্মিণী, তারপর কেঁদেছে অঝোরে। নাতি-নাতনীদের ডেকে দেখিয়েছে, "লুক্কে, কানহাই"—"দাউ"-এর আদরের "বেটারা"। কানহাইকে কাছে টানতে গিয়ে রূপার কথা মনে হয়েছে আর "রূপে"র জন্য হাউ-হাউ করে কেঁদেছে বৃদ্ধা রুক্মিণী। "দাউ"-এর কথা বলেছে সবাই। মাজীর সঙ্গে কেঁদেছে লুক্কে আর কানহাই। অনেকক্ষণ থেকেছে "মাজী"র কাছে। কেন লুক্কাই তো বলল, "এ বাড়ি আমাদের তীর্থ"। তারপর বৃদ্ধা রুক্মিণী সবাইকে বসে খাইয়েছে। যখন তারা উদিতপুরা ছেড়ে

চলে গিয়েছে—তার বুকটা হু হু করে উঠেছে। মনে হয়েছে—সব বুঝি আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

দীর্ঘ পনেরো বছর পর আবার একদিন বৃদ্ধা রুক্মিণী সুদূর খেড়া-রাঠোড়ে গেল, সঙ্গে নাতি শ্যাম সিং, তহসীলদার-এর ছেলে। গাঁয়ে ঢোকবার সময় আর সে ঠিক থাকতে পারেনি। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে। কত বদলে গিয়েছে তার অতি পরিচিত খেড়া-রাঠোড়। সব কিছুই বদলে গিয়েছে। রাস্তায় লোকে ভিড় করেছে তাকে দেখতে—মানসিং-এর স্ত্রীকে দেখতে। সব জানতে পেরেছে রুক্মিণী, সব সে শুনেছে। পনেরো বছর পরেও আগুন নেবেনি। গাঁয়ের ব্রাহ্মণরা এখনও ভুলতে পারেনি সব কথা। কত প্রায়শ্চিত্ত আর সে করবে। কোনোদিন রুক্মিণী ভাবতে পেরেছে তাকে খেড়া-রাঠোড়ে আসতে হবে মাথা নীচু করে ভয়ে ভয়ে, যাতে তার আসার জন্যে গাঁয়ে আবার কোনো গণ্ডগোল না হয়। শুধু সে কেন, কেউ কি ভাবতে পারতো যে, রুক্মিণী নিজে যেচে পণ্ডিত তল্‌ফীরামের বাড়ি গিয়ে তার বংশধরদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের অনুরোধ করবে পুরনো কথা সব ভুলে যেতে। সব সে করেছে লোকের কথায়। কিন্তু কেউ কি ভুলতে পারে পুরনো কথা! সে নিজেও তো ভুলতে পারেনি। লোক দেখানো লৌকিকতা গাঁয়ের কিছু লোকে করেছে কিন্তু রুক্মিণী বেশ বুঝতে পেরেছে, তাকে আর কেউ চায় না এখানে। আজ থাকতো যদি সে বেঁচে তাহলে কি হতো। সব ঘটনা তার মনে আবছা আবছা ভেসে ওঠে। বদলে গেলেও খেড়া-রাঠোড় তাকে চিনিয়ে দিতে হয় না। এখানকার প্রতিটি গাছ, পাথর, প্রতিটি ধূলিকণা সে যে চেনে।

যখন তাকে এসে সবাই বুঝিয়েছিল সে খেড়া-রাঠোড়ে ফিরে যাক তার সম্পত্তি সে ফেরত পাবে, রুক্মিণী আনন্দের আবেশে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। সে বোধ হয় শুধু এই দিনটা দেখবার জন্যেই বেঁচে ছিল। এতদিন পরে, কি তার দুঃখের অবসান হলো। কিন্তু রুক্মিণী তো জানতো না যে, খেড়া-রাঠোড় আর সে খেড়া-রাঠোড় নেই।

ধক্ করে উঠেছিল বুকটা তার। আজ থেকে অনেক বছর আগে রুক্মিণী যখন প্রথম খেড়া-রাঠোড়ে এসেছিল সেই দিনটার

কথা তার মনে পড়ে যায়। এসেছিল উদিতপুরা থেকে বধূরূপে। গাঁয়ে এসেছিল নতুন "দুলহন্"—বিহারী সিং-এর ছেলে মানসিং-এর "আউরত"। গাঁয়ে হয়েছিল ধূমধাম, বেজেছিল বাজনা, পুড়েছিল বাজী। আর আজ সে এসেছে সেই খেড়া-রাঠোড়ে আবার সেই সুদূর উদিতপুরা থেকে—ডাকু মানসিং কি বুঢ্‌টি "বেওয়া" (বিধবা)। কোনো ধূমধাম হয়নি, কোনো বাজনা বাজেনি, কোনো বাজী পোড়েনি। শুধু পুড়েছে তার কপাল। কোথায় তাহার সম্পত্তি কোথায় সেই "গড়হী"? কই "গড়হী"র সামনের সেই বড় ফটকটা তো নেই। আর এই কি তার সেই "গড়হী"? হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে বৃদ্ধা রুক্মিণী। "গড়হী"র কাছেও কেউ আজ যায় না। হাড়-পাঁজরা বের করা মড়ার মতো রয়েছে শুধু ইট-পাথর-কাঠের একটা বিরাট জর্জর কাঠামো। থাকতে পারেনি রুক্মিণী, আছড়ে পড়েছে "গড়হী"র সামনে। আর তার ক্ষেত-খামার তো সরকারী আইনের মারপ্যাঁচে ডুবে কবে তলিয়ে গিয়েছে।

ফিরে এসেছে রুক্মিণী আবার উদিতপুরায়। আর হয়তো কোনো দিন সে ফিরে যাবে না খেড়া-রাঠোড়ে। একদিন সেও থাকবে না আর থাকবে না খেড়া-রাঠোড়ের স্মৃতি। অনেক বছর পরে যখন মাটি খুঁড়ে খেড়া-রাঠোড়ের বুক থেকে একদিন 'গড়হী' আবার খুঁজে পাওয়া যাবে, কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদ তো তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, কারণ ইতিহাসে খেড়া-রাঠোড়ের 'গড়হী' বা মানসিং-এর কোনো দাম নেই। 'গড়হী'র জর্জর কাঠামোটা দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু অভিশপ্ত চম্বলের অভিশপ্ত সাক্ষীর মতো! চম্বলের পাড় থেকে ভেসে আসা দুরন্ত হাওয়া যখন সেই প্রেতপুরীর ওপর দিয়ে বয়ে যাবে, মনে হবে হাজার হাজার বুভুক্ষু অতৃপ্ত প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস—মানসিং, সুবেদার সিং, তল্‌ফীরাম, ছাবরাম, নেতারাম, রূপার দীর্ঘশ্বাস। হয়তো বা রুক্মিণীর দীর্ঘশ্বাস মেশানো ফোঁপানো কান্না।

বলেছিলাম আর কোনোদিন উদিতপুরা যাব না কিন্তু যেতে আমাকে আবার হয়েছিল। আবার দাঁড়িয়েছিলাম রুক্মিণীর বাড়ির সামনে। মুখটা একেবারে আমার কাছে এনে রুক্মিণী বলেছিল 'আও বেটা।'

"কৈয়সী হো মাজী" জিজ্ঞাসা করেছিলাম রুক্মিণীকে।

কেঁদে ফেলেছিল রুক্মিণী। আরো বয়স হয়েছে। দৃষ্টি হয়েছে আরো ক্ষীণ। জীবনের সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে, অভাব-অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রুক্মিণী শ্রান্ত। সে হেরে গিয়েছে। অনেকক্ষণ সেদিন বসেছিলাম তার কাছে। আদর করে রুক্মিণী আমায় কাছে বসে খাইয়েছে। আমার পাশে বসে খেয়েছে লুক্কা, কানহাই আরও সবাই। ওরা চলে গিয়েছে আমি বসে থেকেছি বৃদ্ধার পাশে। শতচ্ছিন্ন ময়লা শাড়ি পরনে—"রাজা" মানসিং-এর স্ত্রী রুক্মিণী আমায় কেঁদে কেঁদে আবার বলেছে তার দুর্দশার কথা।

"জানো বেটা" রুক্মিণী যেন সেই আবার অনেক দূরের মানুষ। "একদিন ছিল যখন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে এক্কা, আর গরুর গাড়ির লোকেরা ডেকে আদর করে আমায় বসিয়ে যেখানে চেয়েছি পৌঁছে দিয়েছে। এই তো বেশিদিনের কথা নয়। হ্যাঁ এই উদিতপুরায়ই।"

"কেন, এখন কি হয়েছে ?"

"এখন ?" রুক্মিণী হাসতে চেষ্টা করে।

"এখনও তারা বসায়। কিন্তু বসাবার আগে শুধু হেসে জিজ্ঞেস করে, "তেরে পাস পয়সা হ্যায় বুঢ্টী ?"

"আমার কিছু চাই না। আমি "জিন্দগী"তে পয়সা, ইজ্জত সব পেয়েছি। আজ নয় কাল আমি মরব। যেদিন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে সেদিন আমি মরব। কিন্তু এই যে ছোটো ছোটো নাতি-নাতনী। এদের কান্না, এদের দুঃখ আমি তো আর দেখতে পারি না। আমার কিছু চাই না। আমার তহসীলদারকে আমার বুকে ফিরিয়ে এনে দাও। সে সব ঠিক করে নেবে। সব ক'টাই তো গিয়েছে। শুধু বাকী আমার তহসীলদার। সে ফিরে আসুক। আমি আর কিছু চাই না।

আবার শীর্ণ আঙুলের কর গোণে রুক্মিণী। আবার চুড়িহীন নিজের খালি হাতটার উপর শীর্ণ আঙুল বুলায়। হয়তো মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা যখন বড়ো দুঃখে পাগলের মতো চিৎকার করে মানসিংকে বলেছিল, "নাও, সাহস না থাকে মেয়েমানুষের মতো চুড়ি পরে ঘরে বসে কাঁদো।

আর বেশিক্ষণ বসতে সাহস হয়নি। যদি আবার রুক্মিণী আমায় সেই প্রশ্ন করে বসে। যখন আমায় বলবে "ইন বাচ্চোঁকো ক্যায়া কসুর?" তখন কি জবাব দেব আমি? আগেও দিতে পারিনি, সেদিনও দিতে পারিনি আর আজো আমার কাছে রুক্মিণীর প্রশ্নের জবাব নেই। আর নেই বলেই তো রুক্মিণীর কাছে যেতে আমার সাহস নেই। হয়তো আবার একদিন যেতে হবে উদিতপুরায় তখন হয়তো আমার কাছে উত্তর থাকলেও, সে উত্তর শোনার জন্যে রুক্মিণী হয়তো থাকবে না।

"আচ্ছা মাজী রাম রাম", বলে সেদিন উদিতপুরা ছেড়ে চুপচাপ চলে এসেছিলাম। ঠিক সেই রকমভাবেই রুক্মিণী আবার দরজায় হাত দুটো রেখে দাঁড়িয়েছিল। গাঁয়ের লাল ধুলো উড়িয়ে আবার আমার জীপে করে চলে এসেছি। তারপর উদিতপুরা ছেড়ে গিয়েছি ভিণ্ড আর ভিণ্ড থেকে গিয়েছি আরো আগে। থেমেছি সেই জায়গায় যেখানে গব্বর সিং মারা পড়েছিল পুলিশের হাতে। মনে নেই সব কথা, যা সঙ্গের পুলিশ অফিসার সেদিন বলেছিল। অনেক নাক কাটবে প্রতিজ্ঞা করেছিল গব্বর সিং। গাঁয়ের লোকেরা ডাকতো গবরা। কেটেও ছিল অনেক নাক কিন্তু যেদিন পড়ল সেই অসমসাহসিক পুলিশ এনকাউণ্টারের সামনে তার নিজের নাকই উড়ে গেল ব্রেনগানের গুলীতে? রাস্তার কাছেই হয়েছিল সেই তুমুল যুদ্ধ। বাস, লরী, গাড়ি সব দাঁড়িয়ে পড়েছিল আর লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল গব্বর সিং-এর বাঁচবার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টা আর শুনেছিল তার সেই ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার "দুর্গা মাইয়া আপকী নিকল যানে দে। ফির কভী নহী আউঙ্গা"। যখন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মোদীর ব্রেনগানের গুলী লেগেছে ধপাস করে পড়েছে গবরা আর বলেছে, "হায় মোদী, মার ডালা।"

সব কথা আমি শুনতে পাইনি। সব মনেও নেই। সঙ্গের পুলিশ অফিসার বলছিল কিন্তু আমি ভাবছিলাম রুক্মিণীর কথা। যাবার সময় বলেছিল "রাম রাম বেটা ফির আনা"। আর বলেছিল তার তহসীলদারের কথা লিখতে "মেরে তহসীলদার ওয়াপস আ যায়ে।" তহসীলদারের সব কথা আমি লিখতে পারিনি কিন্তু, আমি লিখেছি অভিশপ্ত চম্বলের রক্তাপ্লুত কাহিনী।

আবার আসতে বলেছে আমায় রুক্মিণী। হয়তো যাব, হয়তো যাব না। সেদিন যাব যেদিন হয়তো রুক্মিণী আর থাকবে না, আর যদি যাই আর রুক্মিণী থাকে, যদি সে আমায় আবার সেই প্রশ্ন করে তাহলে কি উত্তর দেব? সে যদি তার তহসীলদারকে ফেরত চায় কোথা থেকে তাকে আমি তার তহসীলদারকে ফেরত এনে দেব?

অতীতের চর্মবতী আজ হয়েছে অভিশপ্ত চম্বল। সে বয়ে চলবে যুগযুগান্ত ধরে তার অতি-নিজস্ব গতিতে ভাঙনের গান গেয়ে। অভিশপ্ত 'বেহড়ে' থেকে যুগযুগান্ত ধরে হয়তো শোনা যাবে দীর্ঘশ্বাস। চম্বল থেকে ভেসে-আসা হাওয়া আছড়ে পড়বে হয়তো দিগন্তব্যাপী 'বেহড়ে'র বুকে আর তার থেকে হয়তো যুগ-যুগান্ত ধরে প্রতিধ্বনিত হবে "উস্‌কে বাদ্‌—উস্‌কে বাদ্‌ উস্‌কে বাদ্‌।"

শেষ সংগ্রাম

আজ থেকে অনেক, অনেক বছর পরে যখন অভিশপ্ত চম্বলের ইতিহাস লেখা হবে তার পাতায় পাতায় একটা নাম জ্বলজ্বল করবে—প্ল্যাটুন কমাণ্ডার রামআখতয়ার সিং। নিজের জীবন বাজি রেখে সে অভিশপ্ত চম্বলের সবচেয়ে বড় অভিশাপকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। মুছে ফেলেওছিল বীরত্বের চরম নিদর্শন দেখিয়ে, বেহড়ের লালমাটিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে জীবনের সঙ্গে হোলি খেলে।

ঠিক পাশাপাশি পড়ে ছিল দুটো রক্তাপ্লুত মৃতদেহ, দু'জন দু'জনকে জাপটে ধরে আছে। একটা চম্বলের বিভীষিকা নৃশংসতম খুনী ঠাকুর লাখন সিং, অন্যটা ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ান ক্র্যাক্ কম্পানির প্ল্যাটুন কমাণ্ডার রামআখতয়ার সিং। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬০ চম্বলের রক্তমাখা ইতিহাস আরেকবার মোড় নিল। পাঁচ বছর আগে এই ক্র্যাক্ কম্পানিরই গোবিন্দ বাহাদুর থাপা নিজের জীবন আহুতি দিয়ে দুর্ধর্ষ মানসিং-এর জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল ভিণ্ড জেলার কাকরান-কা-পুরার বেহড়ের বুকে। পাঁচ বছর পরে রামআখতয়ারের হাতে শেষ হল লাখন সিং-এর দস্যুজীবন। আশ্চর্য সংযোগ, লাখনের দস্যুজীবন শেষ হল এমন জায়গায় যেখান থেকে খুব বেশী দূরে নয় লোদা-কী-পল্লী, যেখানে হয়েছিল তার দস্যুজীবনের সূত্রপাত।

কিন্তু এত অদ্ভুত সংযোগের সমাবেশ আমি জীবনে কখনও শুনিনি বা জানিনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাগ্য সেদিন ছিনিমিনি খেলেছিল ঠাকুর সাহেব আর পুলিশের সঙ্গে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই হয়তো সব ওলটপালট হয়ে যেতো, কিন্তু ঠাকুর সাহেবের এত সতর্কতা সত্ত্বেও ছোট্ট একটা ভুলের জন্য সেদিন ভিণ্ড জেলার দেওরা গাঁয়ের কাছেই বেসলাই নদীর তীরে তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

আজ থেকে অনেক, অনেক বছর পরে হয়তো আমিও ভুলে যাব অভিশপ্ত চম্বলের কাহিনী। হয়তো ভুলে যাব অনেক

ছোটো ছোটো, টুকরো টুকরো ঘটনা। হয়তো ভুলে যাব উদিতপুরার রুক্মিণীকে, সে-ও হয়তো ভুলে যাবে আমাকে। আরো অনেককে হয়তো আমি ভুলে যাব বা অনেকে আমাকে ভুলে যাবে—আসগরী, তান্নো, পুতলী, লুক্কা, মালখন সিং, সোনচিড়ইয়া, ভীকম সিং, রঘুবীর সিং। হয়তো কমাণ্ডাণ্ট কুইন আর মিঃ রুস্তমজীও আমাকে ভুলে যাবে। সব স্মৃতি হয়তো আবছা আবছা ঝাপসা হয়ে যাবে, কিন্তু কখনও ভুলতে পারব না—সেই মাঝরাতে শোনা "রাম রাম বাবুজী" আর ভাঙা বাড়ির কথা শুনে নৃশংস দস্যু ঠাকুর লাখন সিং-এর চোখের জল। আর হয়তো ভুলতে পারব না ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬০ সালের সেই সন্ধ্যের কথা—সেই অদ্ভুত সংযোগের সমাবেশ।

মধ্যপ্রদেশের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরসিংরাও দীক্ষিতজীর সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যেবেলা বসেছিলাম ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে। আলোচনার বিষয়, মধ্যপ্রদেশের চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন ডাকাতি সমস্যা। একে একে সব শেষ হয়েছে। গর্বের সঙ্গে দীক্ষিতজী বলে চলেছিলেন সব কথা। শুধু এক চিন্তা—এখনও ঠাকুর লাখন সিং বাকী। যাবার সময় বললেন, "কব তক্ বচেগা লাখন। আই উইল গেট হিম ওয়ান ডে অ্যাণ্ড হ্যাট টু সুন।" জোরে দীক্ষিতজীর হাত ধরে বলেছিলেম, "উইশ ইউ অল লাক্ দীক্ষিতজী।"

ঠিক মনে আছে এখনও। সেই রাত্রেই সাড়ে এগারোটায় টেলিফোন এসেছিল পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে। আবার সেই "রান ডাউন টু দি হেড কোয়ার্টার্স?" ডাকাত না মরলে মধ্যপ্রদেশের রাজধানীতে মাঝরাতে খবরের কাগজের লোকদের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ডাক পড়ে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দৌড়ে পৌঁছেছিলাম হেড কোয়ার্টারে। তখনও কেউ আসেনি। রুস্তমজী সাহেবের কামরাতে একটা নিস্তব্ধ থমথমে ভাব। অনেক হোমরা-চোমরা পুলিশের কর্তারা বসে। ঝড়ের মতো ঢুকতেই মৃদু হেসে রুস্তমজী সাহেব টেবিলের উপরের কাঁচটা উঠিয়ে বের করলেন তাঁর 'মন্টিক্রিস্টো লিস্ট'। লাল পেন্সিলটা ওঠাতেই বলে উঠলাম, "ওয়েট এ মোমেণ্ট, লেট মি সি দি নেম।"

মিতভাষী রুস্তমজী সাহেবকে কখনও অত জোরে হাসতে শুনিনি। সারা কামরাটা তাঁর অট্টহাসিতে যেন কেঁপে উঠল। লিস্টটা আমার দিকে ঘুরিয়ে লাল পেন্সিলটা নির্মমভাবে চালিয়ে দিলেন নামটার ওপর।

"লাখন সিং।"

পাশে কয়েকটা কথা লিখলেন। "শট্ ডেড্—৩০।১২।৬০—৩ পি. এম. নিয়ার দেওয়া ভিলেজ, ভিণ্ড ডিস্ট্রিক্ট। ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ান ক্র্যাক্ কম্পানি।" লিস্ট আবার চলে গেল কাঁচের নীচে। চমকে উঠেছিলাম হঠাৎ। তারপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙল হঠাৎ নরসিংরাও দীক্ষিতজী আর বাকী খবরের কাগজের লোকদের আগমনে। ধীরে ধীর দীক্ষিতজী শোনাতে লাগলেন লোমহর্ষক, ভীষণ সেই আধ ঘণ্টার এনকাউণ্টারের কথা। তারপর পালা রুস্তমজী সাহেবের। ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি লাখনকে বর্ণনা করতে গিয়ে—"দি কিলার, দি ব্লাডি কিলার, লাখন দি টেরিবল, দি হোমিসাইড্ল্ ম্যানিয়াক।" কথা বলতে বলতে হঠাৎ রুস্তমজী সাহেবের গলা ধরে এল—চোখটা সজল হয়ে উঠল। প্লাটুন কমাণ্ডার রামআখতয়ার সিং। "ইট ইজ এ টেরিবল্ লস। হি ওয়াজ এ গ্যালাণ্ট অফিসার।" জয়ের মধ্যে বেদনার আভাস। ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন ভারী হয়ে এল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। দীক্ষিতজী এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে হেসে বলে উঠলেন, "তরুণ, হোয়াট এ কো-ইনসিডেন্স! আজ যব তুমসে শাম কো বাত কর রহা থা, মুঝে কুছ ভী নহী মালুম থা। তুমনে উইশ ইউ অল লাক কহা থা। অ্যাণ্ড হিয়ার ইজ লাক। হামসে রোজ মিলা করো। রোজ এক ডাকু খতম হোগা। ইউ আর এ লাকী ভিজিটর।" আশ্চর্য সংযোগ।

দীক্ষিতজীকে বলেছিলাম—আর কি দরকার। সব তো শেষ হয়ে গেল। সত্যিই কি সব শেষ হয়ে গেল? অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ কি মুছে গেল? কে জানে? আমিও জানি না, দীক্ষিতজীও জানেন না।

লাখনকে হয়তো কোনোদিনই পাওয়া যেত না, যদি সেদিন রেডিও অপারেটর নরেন্দ্র সিং, সাব-ইন্সপেক্টর বেদরাম, পুলিশ

সুপার পাহুজী, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট মাধো সিং আর মোদী, প্লাটুন কমাণ্ডার রামআখতয়ার সিং আর নাম-না-জানা সেই ব্রেন-গানার অপূর্ব দক্ষতা আর বুদ্ধির সঙ্গে কাজ না করত। সময় ছিল না। লাখনের মতো ধূর্ত লোককে পাওয়া সহজ নয়, সবাই জানত। সবাইকার বুক দুরুদুরু করছিল। লাখনকে কি পাওয়া যাবে? আর এনকাউণ্টার হলেই যে লাখনকে পাওয়া যাবে, তার কি স্থিরতা আছে? এই তো ক'দিন আগেই উত্তর-প্রদেশের পুলিশের গুলীর সামনে দিয়ে লাখন চলে এসেছিল। তারও কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশেই একটা গাঁ কে গাঁ লুট করে, অনেকজনকে নৃশংসভাবে খুন করে চলে এসেছিল লাখন। লুটের বোঝা এত বেশী হয়েছিল যে, দলের লোকেরা তার ভার বইতে না পেরে শুধু সোনা ছাড়া সব ফেলে চলে এসেছিল।

শুধু এতগুলো সংযোগের সমাবেশ হয়েছিল বলেই বোধ হয় অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছিল।

সংযোগ নয়তো কি? রেডিও অপারেটর নরেন্দ্র সিং সেদিন নিয়মের বিরুদ্ধেই হয়তো কাজ করেছিল। রেডিও অপারেটর তো নিজে কোনো 'মেসেজ' পাঠাতে পারে না। তাকে যা 'মেসেজ' দেওয়া হয়, সে শুধু তাই পাঠাতে পারে। তবুও সেদিন উৎসাহের আতিশয্যে নরেন্দ্র সিং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পাঠিয়েছিল খবরটা। হঠাৎ দুম করে এসেছিল 'মুখবীর' (ইনফরমার)। সাহেব জলদি খবর পাঠাও, ঠাকুর লাখন সিং ভিণ্ডের দেওয়া গাঁয়ের কাছেই রয়েছে আর সন্ধ্যের অন্ধকারেই সে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। বিশ্বাস করলেও সে নিজে থেকে শুধু একজন 'মুখবীরের' হুকুমে কি করে পাঠাবে খবর? লোকটা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল, সাহেব এ-সুযোগ জীবনে আর পাবে না। ভয়ে ভয়ে নরেন্দ্র সিং পাঠালে "কোড" মেসেজ। মুহূর্তের মধ্যে পাহুজা সাহেব ডেকে পাঠালেন সাব-ইন্সপেক্টর বেদরামকে। তারই বিশ্বাসী ইনফরমারের খবর। বিদ্যুতের মতো একটার পর একটা "মেসেজ" দৌড়তে লাগল। পাহুজা, কর্তার সিং, মোদী, মাধো সিং, কুইন, রামআখতয়ার আর বাছা বাছা লোক—ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ান ক্র্যাক্ কম্পানি, সেকেণ্ড ব্যাটে-লিয়ান ইন্দোর, ফোর্থ ব্যাটেলিয়ান আর ফিফ্‌থ ব্যাটেলিয়ান-এর

সূর্য তখন ঠিক মাথার উপর। ধীরে ধীরে চারপাশ থেকে চলল পুলিশের দল। দুপুর আড়াইটার সময় গোয়ালিয়রের ক্র্যাক্ কম্পানি ৪০ মাইল দূর দেওরা গাঁয়ের সীমানার কাছে পৌঁছল। মধ্যে বেসলাই নদী আর তার ওপারেই দেওরা গাঁ। আরেকটু দূরে একটা বাগান। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ধীরে ধীরে খুব সাবধানে এগোতে লাগল পুলিশের দল। তারপর আবার চুপচাপ আর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। সময় চলে যাচ্ছে। অন্ধকার এইবার নামবে বেসলাই নদীর বুকে আর সেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে যদি লাখন গা ঢাকা দেয়? রামআখতয়ার অধীর হয়ে উঠল। নিজের প্ল্যাটুন নিয়ে আর একটু এগিয়ে গেল। ঐ তো অন্ধকারে নদীর তীরে ছায়ামূর্তির মতো কারা যেন নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে! ওরা কারা? ওরা কি বাকী ব্যাটেলিয়নের লোকেরা? না, লাখন সিং? প্রায় ত্রিশটা ছায়ামূর্তি। রামআখতয়ায়ের কপালে ভীষণ শীতের মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। আর না।

"ফায়ার।" রামআখতয়ার চেঁচিয়ে উঠল। ক্র্যাক্ কম্পানির রাইফেল আর ব্রেনগানের আওয়াজ অন্ধকারের বুক চিরে শোনা গেল। নদীর ও-পাশ থেকেও এল এক ঝাঁক গুলী। রামআখতয়ার এগিয়ে গেল। নদীতে জল কম। আরো এগিয়ে, আরো এগিয়ে। আবার তার রাইফেল গর্জে উঠল। কিন্তু এ কে চেঁচাচ্ছে?

"আরে কেয়া করতে হো। হাম পুলিশকে আদমী। গোলী মাত চালাও।" ছি-ছি-ছি, এ কি করেছে রামআখতয়ার! নিজের লোকের ওপরেই গুলী চালিয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারিং বন্ধ করতে হুকুম দিল সে। খানিকক্ষণ চুপ। ছায়ামূর্তিগুলো ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। আগে। আরো আগে—রাইফেলের রেঞ্জের আগেও হয়তো চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু সাবধানী লাখন একটু ভুল করে ফেলল। সেই একটা ভুলের মাসুল সে নিজের জীবন দিয়ে দিল। নিজেকে পুলিশের লোক বলে চেঁচিয়ে সে রামআখতয়ারকে ভীষণ সমস্যার মধ্যে ফেলেছে। এই সুযোগ আর জীবনে আসবে না। সে নদীর তীরে বুকে ভর দিয়ে চলতে লাগল আর তাকে "কভার" করে রইল চারজন লোক। কিন্তু এ কি করল তার দলের একজন? হঠাৎ

সে শুনতে পেল তার দলের কে একজন পুলিশের দিকে "ফায়ার" করল। এমন মারাত্মক ভুল কি কেউ করে? লাখন বুঝল আর কিছুই করবার নেই। জীবনের শেষ যুদ্ধের জন্যে সে তৈরি হল।

রামআখতয়ারও শুধু একবারই ভুল করেছিল। পুলিশের লোক ভেবে সে গুলী চালানো বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এ কি? পুলিশেরই লোক যদি ওরা হবে তা হলে আবার ফায়ার করবে কেন তার দিকে? এক লহমায় সে বুঝে গেল লাখনের অপূর্ব চাল আর সেই সঙ্গে লাখনেরই দলের লোকের মারাত্মক ভুল।

আর সময় নেই। "চার্জ", চীৎকার করে এগিয়ে চললো রামআখতয়ার। অন্ধকারে তখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রামআখতয়ার দেখল একটা লোক—দীর্ঘ, চওড়া ছাতি, পুলিশের ইউনিফর্ম পরা—সোজা হয়ে দাঁড়াল। রামআখতয়ার শুনতে পেল একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ, আর হঠাৎ বুকের কাছটা কেমন যেন করে উঠল। শার্টটা ভিজে গেল। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। টলতে টলতে এগিয়ে গেল রামআখতয়ার। তার প্ল্যাটুনের লোকেরা নাকি অন্ধকারে দেখতে পেয়েছিল দুটো ছায়া-মূর্তির ভীষণ সে লড়াই। মত্ত সিংহের মতো চীৎকার করে উঠে দুজনে দু'জনকে জাপটে ধরে। হঠাৎ আর একটা গুলীর আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। দীর্ঘ লোকটা টলতে টলতে আবার চীৎকার করে উঠেছে। দুটো রাইফেল আবার গর্জে উঠেছে আর তারপর দুটো ভারী দেহ পড়েছে বেসলাই নদীর কিনারায়।

দু'জনে জাপটাজাপটি করে পড়ে আছে। রাইফেল দুটো ছিটকে চলে গিয়েছে আর একটু দূরে। নদীর কাছের বালিটা একটু লাল হয়েছে। দু'জনের পরনেই পুলিশের পোষাক—একজন প্ল্যাটুন কমাণ্ডার রামআখতয়ার সিং, আর একজন চম্বলের বিভীষিকা নাগরার ঠাকুর লাখন সিং।

লাখন সিং-এর দস্যুজীবন শেষ হল বেসলাই নদীর তীরে। উত্তরপ্রদেশের জালোন জেলার আকবরপুরা গাঁয়ে তার রুগ্না স্ত্রীর কপালের "সোহাগ সিন্দুর"-মুছে গেল চিরতরে।

পাণ্ডরী গাঁয়ে সোনচিড়ইয়া পরের দিন খবর পেয়ে নাকি দাওয়ায় আছড়ে পড়েছিল। বোধ হয় সেই লোকটা হেসেছিল যে

আমায় সোনচিড়ইয়ার দাপটের কথা বলেছিল। পাণ্ডরী গাঁয়ে আর বাবুল গাছের দরকার হবে না। লাখন সিংই যখন নেই তখন আর কোনো হরবিলাসও জন্মাবে না আর ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে "ধোকাও" করবে না। আর যখন লাখন সিংও নেই, হরবিলাসও আর যখন হবে না আর কেউ "ধোকাও" করবে না তখন পাণ্ডরী গাঁয়ে আর বাবুল গাছেরও দরকার হবে না।

কিন্তু শুধু সোনচিড়ইয়াই কাঁদেনি। আরও অনেকে কেঁদেছে। ভাদাপুর গাঁয়ে বাড়ির মাটির দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বুক ফাটানো কান্না কেঁদেছে লাখনের বৃদ্ধা মা। আর কেঁদেছে লাখনের ভাই মালখান সিং। তার "এক মা-কা তুধ পিয়া" ভাই আর নেই। আর ফিরঙ্গী সিং? সেও কি কেঁদেছে? বেসলাই নদীর তীরে সেদিনের যুদ্ধে সেও তো ছিল লাখনের সঙ্গে। তারও পায়ে গুলী লেগেছিল। ফিরঙ্গী কেঁদেছিল কিনা জানি না কিন্তু লাখনের মৃত্যুর পরে দলের নেতা সেই হয়েছিল আর পাগলের মতো "খুন কা বদলা খুন" প্রমাণ করতে একের পর এক হত্যা করে বেড়িয়েছে। প্রতিশোধ সে নিয়েছে কিছুদিন আগে যখন তার গুলীতে মধ্যপ্রদেশের পুলিশের-আর একজন অফিসার কম্যাণ্ডাণ্ট কর্তার সিং জীবন দিয়েছে। বেসলাই নদীর তীরে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে কর্তার সিংও ছিল একটা প্ল্যাটুনে। আর রূপা মহারাজের সঙ্গে এনকাউণ্টারেও তো কর্তার সিং ছিল।

অনেকে কিন্তু হেসেছে। মাঝরাতে রুস্তমজী সাহেব "মন্টিক্রিস্টো লিস্ট" থেকে লাখনের নামটা কাটতে কাটতে অট্টহাসি হেসেছিল। কম্যাণ্ডাণ্ট কুইনের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। সেদিন ফোর্থ ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে সেও তো ছিল। লাখনের সঙ্গে তার লাস্ট ব্যাট্‌ল হবার আগেই রামআখতয়ার সিং আর লাখনের লাস্ট ব্যাট্‌ল হয়ে গিয়েছিল। কুইনের সঙ্গে দেখা আমার হয়নি কিন্তু আমি বলতে পারি, সেও নিশ্চয় অট্টহাসি হেসেছিল আর হয়তো বলেছিল, "ব্লাডি কিলার, উই হ্যাভ গট্‌ হিম, ম্যান।"

আরো অনেকে হেসেছিল। বৃদ্ধ রঘুবীর সিং হাজার হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে ভিণ্ড শহরে লাখন সিং-এর লাশ দেখেছিল। এগিয়ে গিয়ে লাশের উপর থুথু ফেলে "শালা

কুত্তা, শালা হারামি” বলার তার সুযোগ আর হয়নি। রঘুবীর সিং-এর হাসির সঙ্গে হয়তো কান্নাও জড়ানো ছিল। এতদিনে নাগরা গাঁয়ের রাজপুত ইতিহাসের পাতায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। আবার রঘুবীর ফিরে যাবে তার নাগরা গাঁয়ে। “হাভেলী”তে হয়তো আর যাবে না তবু নাগরায় ফিরতে তো পারবে। তার সঙ্গে সেদিন ভিণ্ডে তার জামাই ভীকম সিংও ছিল। সে হয়তো লাখনের লাশের দিকে চেয়েছে আর নিজের আস্তিনের নীচের গুলীর দাগগুলোর ওপর হাত বুলিয়েছে।

সে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে হয়তো সেও হাসত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কল্লাকে ক্ষমা করলেও লাখনকে পুতলীবাঈ কখনও ক্ষমা করেনি। বেঁচে থাকলে পুতলীও হাসত।

‘অভিশপ্ত চম্বল’-এর কাহিনী লেখবার সময় আর তার পরেও অনেক প্রশ্নের জবাব আমায় দিতে হয়েছে। আজও হচ্ছে। তাই কিছুদিন আগে যখন কলকাতা থেকে এক লাইনের একটা চিঠি পাই, আমি আশ্চর্য হইনি। “ঠাকুর লাখন সিংও তো শেষ। এবার বোধ হয় ‘অভিশপ্ত চম্বল’-এর অভিশাপও শেষ হল।” শুধু এই ক'টা কথাই লেখা ছিল চিঠিটাতে। “তাই হল বোধ হয়”—উত্তর দিতে পারলে আমি খুশী হতাম। কিন্তু চম্বলের অভিশাপ শেষ হয়নি। কবে হবে কে জানে? লাখন সিং, পানা, বাহাত্তুরা—যাদের আমি “লাস্ট বিগ থি” বলতাম—তাদের মধ্যে বাকি শুধু বাহাত্তুরা। আর বাকি দেবীলাল শিকারী (অমৃতলালের দলের এখন নেতা) আর আরো কিছু লোক। কিছুদিনের মধ্যে এরাও হয়তো শেষ হবে। কিন্তু তা হলেই কি ‘অভিশাপ’ শেষ হবে? না বোধ হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দীর এই অভিশাপ এত শীঘ্র কি শেষ হয়? হাজার হাজার বেহড় এখনও দাঁড়িয়ে আছে আর তাতেই জন্মাবে হয়তো নিত্য নতুন লাখন সিং আর মানসিং। “লিজেণ্ড” হয়তো তারা তৈরি করবে না কিন্তু যতদিন “খুন কা বদলা খুন”-এর নেশা চম্বলের উপত্যকার উপর ভর করে থাকবে ততদিন এরাও দস্যুবৃত্তি ছাড়বে না।

মাসের পর মাস পদযাত্রা করে প্রেমের বর্তিকা হাতে নিয়ে কঠিন বেহড়ের মধ্যে হৃদয় পরিবর্তন করতে নেমেছিলেন বিনোবা

ভাবে। "বাবা"র মিশন যে কতখানি সাফল্য লাভ করেছে তা নিয়ে নতুন তর্ক তুলে আজ কোনো লাভ হবে না। কারুর হৃদয় পরিবর্তন হয়নি, হবেও না। যারা তাঁর কাছে নাটকীয়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল মাঝ রাতে কানহেরা গ্রামে—তাদের কতটুকু হৃদয় পরিবর্তন হয়েছে আমি তা জানি না কিন্তু এইটুকু জানি যে তারা কোর্টে গিয়ে কেউ নিজের দোষ স্বীকার করেনি। "বাবা" তো তাদের দোষ স্বীকার করতে বলেছিলেন। তা তারা কেউ করেনি। তারাও নিজের অধিকার বুঝে আইন-কানুনের সাহায্য নিয়ে নিজেদের রক্ষা করেছে আদালতে। সাজা হলে আপিল করছে। সভ্যজগতের মানুষ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা করে তারাও তাই করছে। মধ্যে থেকে তাদের 'হিরো' তৈরি করে আইন-কানুনকে হেয় করা হল কিছুদিনের জন্যে। প্রতিবাদ করেছে অনেকেই এই অভিযোগের বিরুদ্ধে। "হিরো" তাদের তৈরি করা হয়নি অনেকেই বলেছে আমায়, আজও বলছে। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি সেইসব দৃশ্য।